মাযহাব
প্রসঙ্গে
ডা. জাকির নায়েক
একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা
ইজহারুল ইসলাম

মাযহাব প্রসঙ্গে

ডাঃ জাকির নায়েক

একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা

মাযহাব প্রসঙ্গে

ডাঃ জাকির নায়েক

একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা

ইজহারুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নে

মুফতী সাইফুল্লাহ শিবলী

মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

জামিয়া আরাবীয়া হামিউস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

ইমাম ও খতীব, সোবহানবাগ অফিসার্স কোয়াটার্স জামে মসজিদ, সোবহানবাগ, ঢাকা।

উ|ৎ|স|র্গ

আমার জন্য যারা অনেক কিছু করেছেন, যাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি, তাদের জন্য এ ক্ষুদ্র নজরানা।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، خاتم الأنبياء والرسل ، لا نبي بعده ولا رسول ، بعثه الله إلى الناس كافة ، ينذرهم من الشرك ووسائله وأسبابه ، ويحذرهم من البدعة والفرقة، والمشاقة والتنازع ويدعوهم إلى التوحيد وتحقيقه، واتباع السنة ، والسمع والطاعة ، ولزوم الجماعة فلا خير إلا دل الأمة عليه ، ولا شر إلا حذرها منه، ثم توفاه الله إليه، وأبقى دينه محفوظاً ، وافترض طاعته على الجن والإنس ، وضمن الله أنه مهما تفرقت أمته ، لا تزال طائفة منها ـ هم الجماعة ـ على الحق ظاهرين ، لا يضرهم من خالفهم ، إلى يوم القيامة ، – صلى الله عليه وسلم – ، وعلى آله وأصحابه ، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালার একমাত্র মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম। ইসলামের আবেদন অপরিসীম; এর বিশালতা ও গভীরতার সাথে কোন কিছুর তুলনা কল্পনাতীত। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ইসলাম যেমন ছিল তরুণ, সজীব ও সতেজ, তেমনি আজকের ইসলামও তার সেই তারুণ্য আর সজীবতায় দীপ্তমান। দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর যাবৎ ইসলাম তার সুর ও ছন্দ বজায় রেখেছে, অক্ষুণ্ন রেখেছে নিজস্ব ভাবধারা ও গতিময়তা। ইসলাম চির সজীব। কেননা সকল প্রতিকূলতা থেকে ইসলামকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, অসীম সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা। আর তিনিই তো এর রক্ষক।

কিন্তু কালের পট পরিবর্তনে ইসলামের সেই চৌদ্দশ' বছরের দেদীপ্যমান দীপ্তি আজ তেজহীন, নিষ্প্রভ। মুসলমান আজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া সেই বিপর্যয়ে মুসলমান আজ দিশেহারা। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের এই বিপর্যয় পূর্বের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণের পাশাপাশি স্নায়ুবিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চলছে। পদ্ধতিগতভাবে এই আক্রমণ এতটাই পরিকল্পিত ও সুতীক্ষ্ম যে, স্বয়ং মুসলমানরাই অজ্ঞতাবশতঃ সে আক্রমণের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামকে বিপর্যস্ত করা তথা ইসলামের মূল আক্বীদা বিশ্বাস ও তাহযীব-তামাদ্দুনকে বিকৃত করার প্রয়াস সুদূর প্রসারী। এক্ষেত্রে অমুসলিমরা যেমন

প্রত্যক্ষভাবে ইসলামের মূল আক্বীদা- বিশ্বাস বিকৃত করার অপচেষ্টা করে থাকে, তেমনিভাবে মুসলমানদের একটা শ্রেণী তাদের সেই অপচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদরা এ বিষয়ে ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতি সাধনে লিপ্ত। এদের কেউ নামধারী মুসলমান, আবার কেউ অমুসলিম। এসমস্ত বুদ্ধিজীবীদের অপপ্রচারে মুসলমানদের অনেকেই বিভ্রান্ত হয় এবং তাদের একই ভাবধারায় পরিচালিত হয়।

মুসলমানদের এই ক্রান্তিলগ্নে মাযহাবের উপর আলোচনা একটি গৌণ বিষয়। মুসলমানদের মাঝে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হক্ব বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো কোনভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদেরই একটা শ্রেণী এই অপচেষ্টায় তৎপর। এরা আহলে হাদীস বা সালাফী নামে পরিচিত।

এরা সর্বসাধারণের মাঝে চার মাযহাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অমূলক উক্তি ও প্রপাগাণ্ডা ছড়িয়ে থাকে। এবং কিছু কিছু শাখাগত মাসআলা নিয়ে অযৌক্তিক বিতর্ক সৃষ্টি করে ফেতনার জন্ম দেয় এবং সাধারণ মানুষের মনে বিভিন্ন ধরণের সন্দেহের বীজ বপন করে। এদের যুক্তি হল- "এক কুরআন, এক রাসূল (সঃ) তবে চার মাযহাব মানব কেন"; কিন্তু তাদের এ শ্লোগান মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের মাঝেও আক্বিদা থেকে শুরু করে শাখাগত অসংখ্য বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল-"স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবৃত্তিপূজার কারণে তাদের এক দলই আরেক দলকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি বলে থাকে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ তেরশ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে চার মাযহাবের উপর আমল করে আসছে। চার মাযহাবের উপর আমল করা সত্ত্বেও তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য এবং ঐক্য ও সংহতি বজায় রয়েছে। অন্যকে বাতিল বলা তো দূরে থাক, অন্য মাযহাবের কারও প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব রাখার বিষয়টিকেও নিন্দনীয় মনে করা হয়। এবং প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে যারপর নাই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর ডাঃ জাকির নায়েক বর্তমান সময়ের একজন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে তার অতুলনীয় খেদমত মুসলমানদের একটি বড় অর্জন। একটা সময় ছিল, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর ডাঃ জাকির নায়েকের লেকচারগুলো মুগ্ধ হয়ে শুনেছি, তাঁর পক্ষ হয়ে অনেকের সাথে বিতর্কও করেছি। বিভিন্ন ধর্মের উপর ডাঃ জাকির নায়েকের সেই আলোচনাগুলো ছিল অসাধারণ। এবং এ বিষয়ে তিনি

ইসলামের যে খেদমত করেছেন, বর্তমান সময়ে সে খেদমতের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রত্যেকেই অবগত।

দুঃখজনক হল, বর্তমানে ডাঃ জাকির নায়েক তাঁর দাওয়াতের ক্ষেত্র ও পরিম-ল অতিক্রম করেছেন। তিনি একজন দায়ী, কিন্তু তিনি মুফতী, মুহাদ্দিস কিংবা মুফাসসির নন। যখন থেকেই তিনি তার জ্ঞানের সীমা বা পরিধি অতিক্রম করেছেন, তখন থেকেই তার থেকে অনেক অনাকাঙ্খিত ও ভুল বিষয় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। মাসআলা-মাসাইল বা ফতোয়া প্রদানের যোগ্য না হয়ে তাঁর জন্য এ পথে অগ্রসর হওয়াটা কখনও যৌক্তিক হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি যেহেতু মাসআলা দেয়ার যোগ্য নন, এজন্য তিনি যে সমস্ত মাসআলা দিয়ে থাকেন, এর অধিকাংশ মাসআলা মূলতঃ সালাফী বা আহলে হাদীসদের থেকে নেয়া। বাস্তব সত্য হল, এক্ষেত্রে তিনি সালাফী বা আহলে হাদীসদের প্রতিনিনিধিত্ব করে থাকেন।

ডাঃ জাকির নায়েকের মত একজন দায়ীর পক্ষে সালাফী বা আহলে হাদীসদের পথে পা বাড়ানোর যৌক্তিকতা আমাদের নিকট অস্পষ্ট।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়–

هميں تو اپنوں نے لوٹا
غيروں ميں كهاں دم تها
ميرى كشتى وهاں ڈوبى
جهاں پانى كم تها

“ভাঙা তরীতে পাড়ি দিয়েছি
অথৈ সাগর মোরা;
যেখানেই পানি কম ছিল হায়!
তরী ডুবে হল সারা”

ডাঃ জাকির নায়েক ফিকহের বিষয়ে অভিজ্ঞ না হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করায় তিনি সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হয়েছেন। তাঁর এ সমস্ত ভুল মাসআলা সম্পর্কে অনেকেই হয়ত অবগত। ফিকহের বিষয়ে ভুল মাসআলা দেয়ার পাশাপাশি তিনি মাযহাব প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বে এবং বিশেষভাবে “ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম

উম্মাহ” শিরোনামের লেকচারে বিভিন্ন ধরণের অমূলক উক্তি করেছেন। এ লেকচারে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাযহাবকে ইসলাম বহির্ভূত একটি বিষয় হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ডাঃ জাকির নায়েক চার মাযহাব সম্পর্কে যে সমস্ত অমূলক উক্তি করেছেন এখানে সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইয়ের কলেবর দীর্ঘ হওয়ায় তিনি মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ভুল করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা বর্জন করা হয়েছে।

ডাঃ জাকির নায়েককে আক্রমণ করা কিংবা তার একচেটিয়া সমালোচনা করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং এটি মাযহাব প্রসঙ্গে একটি গবেষণামূলক আলোচনা বলা যেতে পারে। ডাঃ জাকির নায়েককে ছোট করা কিংবা তার অন্যান্য খেদমতকে তুচ্ছ করাও আমাদের লক্ষ্য নয়। এজন্য কারও পক্ষে এ ধারণা করা সমীচিন হবে না যে, ডাঃ জাকির নায়েককে আমরা খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

সর্বশেষ কথা হল, বর্তমান সময়ে যারা ইসলামের হিতাকাঙ্খী রয়েছেন, তাদের উচিৎ গৌণ বিষয় পরিহার করে মুসলমানদের অধঃপতনের মৌলিক কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করা। অধিকাংশ মানুষ যখন নামায পড়ে না, তখন কে আমীন আস্তে বলল, আর কে জোরে আমীন বলল সে বিষয়ে তুলকালাম সৃষ্টি করা মেধার অপচয় বৈ কিছুই নয়। ছোট-খাটো যে সমস্ত বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে, বিষয়গুলোর মান এমন যে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তো দূরে থাক, তা নিয়ে অনর্থক আলোচনা করাটাই যৌক্তিক নয়।

মুসলমানদের এই দুর্দিনে দু'একজন যারা ইসলাম পালনে আগ্রহী তাদেরকেও আবার এসমস্ত গৌণ বিষয়ে বিভক্ত করার চেষ্টা করা যে কতটা হীন, তা সহজেই অনুমেয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক মোট কথা সকলক্ষেত্রেই আজ মুসলিম উম্মাহ পর্যুদস্ত। সুতরাং সময়ের দাবী অনুযায়ী এসমস্ত কোন বিষয়ে তাদের উপকার করা, তাদের মাঝে নতুন নতুন মাসআলা-মাসাইল দিয়ে তাদেরকে

বিভক্ত করার চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত। অতএব, আমাদের জন্য কর্তব্য হল, গৌণ বিষয়কে পরিহার করে মৌলিক বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে ধন্য করেছেন শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই মুফতী সাইফুল্লাহ শিবলী সাহেব। এ বিষয়ে লেখার ব্যাপারে সর্ব প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেন বড় ভাই মাওলানা কামরুল ইসলাম।

বইটিকে সাবলিল ও প্রামাণিক করার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করেছি। কবুল ও মঞ্জুর করার মালিক দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালা। তাঁর দরবারেই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন।

বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে অনেকেই আমাকে সহযোগিতা করেছেন। সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের ক্ষেত্রে শুধু এতটুকুই বলব, "জাযাকুমুল্লাহু খায়রান আহসানাল জাযা"।

যে কোন বিষয়ে সুধী পাঠকের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ কামনা করছি। সাথে সাথে কোন ভুল চোখে পড়লে তা আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য কবুল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত
ইজহারুল ইসলাম
২৩.০৩.১২ ইং

কাদের অনুসারী?

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী (সঃ) কে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে দ্বীন শিখিয়েছেন। সাহাবীগণ সরাসরি রাসূল (সঃ) এর নিকট দ্বীন শিখেছেন। সাহাবীগণ (রাঃ) তাবেয়ীদেরকে এবং তাবেয়ীগণ তাদের ছাত্র তাবে-তাবেয়ীনগণকে দ্বীন শিখিয়েছেন। এভাবে ইসলামী শিক্ষার ধারা অদ্যাবধি চলে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে একটি দুঃখজনক বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, একশ্রেণীর মানুষ দ্বীনি ইল্ম শিক্ষার এই ধারার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে স্বশিক্ষিত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এবং তাদের নিজস্ব বুঝ অনুযায়ী দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত অবলীলায় পেশ করে যাচ্ছেন।

আমরা প্রত্যেকেই অবগত যে, ডাঃ জাকির নায়েক পেশাগত একজন ডাক্তার। দ্বীনের বিষয়ে তিনি মৌলিক জ্ঞানের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-শোনা করেননি। তিনি তাঁর বক্তৃতা কিংবা বাস্তব জীবনে কাদের মতাদর্শ অনুসরণ করেন এবং কাদের উপর নির্ভর করেন, সে বিষয়টির উপর তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে। তিনি কাকে অনুসরণ করে থাকেন, ডাক্তার জাকির নায়েকের কথা গ্রহণ করার পূর্বে সে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

ডাঃ জাকির নায়েক তাঁর Unity in the Muslim Ummah[1] শিরোনামের লেকচারে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

1. "Many of my talks are based on his research, Mashallah!
মাশাআল্লাহ! আমার অনেক লেকচার শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি।
2. I am nothing compare to him, I am not even a drop in the ocean compare to Nasiruddin Albani.

"আমি তাঁর তুলনায় কিছুই নই। নাসীরুদ্দিন আলবানী সাগরতুল্য হলে আমি তার তুলনায় এক ফোঁটা পানির সমতুল্যও নই।"[২]

---

[১] http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

[২] উপরোক্ত আলোচনাটি ইউটিউবে নিম্নের শিরোনামে পাওয়া যাবে-
Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH – YouTube

3. See for example I am lay, what I say in talk I do my research, but more knowledge in my head or my brain, which I haven't checked up, but yet I classify. For example, if I hear a statement from Shiekh Nasiruddin Albani, Mashallah, who has died recently, according to me he is one of great Muhaddis of the recent times. What he says, I follow on the face of it, because I checked up, the scholar Mashallah following Quran and Sahih Hadith.

"উদাহরণস্বরূপ! আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি আমার লেকচারে যা বলি, সেগুলো নিয়ে আমি গবেষণা করে থাকি। কিন্তু আমার মাথায় বা ব্রেনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে, যেগুলো আমি অনুসন্ধান করতে পারি না। তবে আমি এর জন্য স্কোলারদের শ্রেণীবিভাগ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, যদি শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর পক্ষ থেকে কোন বর্ণনা পাই, আমার মতে তিনি বর্তমান সময়ের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি যা বলেন, আমি সে অনুসারে চলি। কেননা আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি, মাশাআল্লাহ! তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করেন।[৩]

4. So if someone gives the Fatwa, local person from here and Nasiruddin Albani, I believe Nasiruddin Albani, if I don't have time. But what I say in the lecture I check up, because I am responsible for that. But for my own knowledge, if I have to make a opinion, I can't check up every Hadith, difficult! Difficult for a lay man

"এখানকার কোন সাধারণ ব্যক্তি যদি কোন ফতোয়া প্রদান করে এবং শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী যদি কোন ফতোয়া প্রদান করেন, তবে আমি শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীকে বিশ্বাস করব, যদি আমার নিকট যথেষ্ঠ সময় না থাকে।

---

http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0

[৩] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

কিন্তু আমার লেকচারে আমি যা বলি, সেগুলো আমি যাচাই করে থাকি। কেননা এর জন্য আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু আমার নিজের জ্ঞানের জন্য যদি কোন বিষয়ে আমার কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তবে আমি সব হাদিস যাচাই করে দেখতে পারি না। এটি অনেক কঠিন! একজন সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কঠিন![৪]

ইসলামী বিষয়ে ডাঃ জাকির নায়েক তার লেকচারের জন্য শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর উপর নির্ভর করেন। এবং তাঁকে অনুসরণ করে থাকেন।

শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) কে সালাফীরা বর্তমান সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মনে করে থাকে। যেমনটি ডাঃ জাকির নায়েকও মনে করেন। সালাফী মাযহাবকে যারা বেগবান করেছে, বর্তমান সময়ে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীকে তাদের পুরোধা বলা যায়।

ডাঃ জাকির নায়েক যেহেতু শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীসহ অপরাপর সালাফী বা আহলে হাদীসদের উপর নির্ভর করেন এবং তাদের শিক্ষা প্রচার করে থাকেন, এজন্য ডাঃ জাকির নায়েককে সালাফী মাযহাবের প্রচারক বা তাদের ব্যাখ্যাকার বলা যায়।

He is regarded as an exponent of the Salafi ideology
ডাঃ জাকির নায়েককে সালাফী মাযহাবের ব্যাখ্যাকার মনে করা হয়"[৫]

অবশ্য ডাঃ জাকির নায়েক "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে সালাফী ও আহলে হাদীসদের সমালোচনা করেছেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সালাফী মাযহাবে বিশ্বাসী নন। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীসহ অন্যান্য সালাফীদের অনুসরণ এবং তাদের মতাদর্শ প্রচার করাটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এছাড়াও একজন সালাফীর লেখা একটি বই পড়ুন এবং ডাঃ জাকির নায়েকের লেকচার শুনুন! এ দু'য়ের মাঝে মৌলিক দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। মাযহাবীদের ব্যাপারে তারা যে সমস্ত অভিযোগ করে থাকে, ডাঃ জাকির নায়েক

---

[৪] প্রাগুক্ত

[৫] Roel Meijer's Global Salafism: Islam's new religious movement, Columbia University Press, 2009
Warikoo, Kulbhushan; Religion and security in South and Central Asia, Taylor & Francis, 2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Zakir_Naik#cite_note-4

তার লেকচারে হুবহু সেগুলো উলেখ করেছেন, বরং অনেকক্ষেত্রে তিনি তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন ।

সালাফীদের কারণে মুসলিম উম্মাহের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল- " ফিতনাতুত তাকফীর" তথা অন্যকে কাফের বলার প্রবণতা । ইসলামের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের প্রতি ন্যুনতম কোন সম্মান তো তারা প্রদর্শন করেই না, বরং তাদেরকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে । এই ফেতনা এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, পূর্ববর্তী কোন বুযুর্গের প্রতি কোন সম্মান তাদের নিকট যেন কোন বিবেচনার বিষয়ই নয় । অথচ তারা নিজেদেরকে "সালাফী" (পূর্ববর্তীদের অনুসারী) হিসেবে প্রকাশ করে থাকে ।

বর্তমান সময়ে সালাফী আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি বেগবান করেছেন, শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) । তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিখ্যাত কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহকেই তার সমালোচনা থেকে বাদ দেননি । তিনি শুধু সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, অনেক ক্ষেত্রে অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছেন । যা একজন আলেমের কাছ থেকে আশা করা যায় না । এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উলেখ করা হল-

হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনাঃ

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা করে লিখেছেন,

هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من الانجيل أو الفقه الحنفي و نحوه

"এ থেকে স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দিবেন এবং কিতাব ও সুন্নাহের মাধ্যমে বিচার করবেন । তিনি ইঞ্জিল, হানাফী ফিকহ কিংবা এজাতীয় অন্য কিছু দ্বারা বিচার করবেন না"[৬]

---

[৬] تعليقه علي كتاب الحافظ المنذري (مختصر صحيح مسلم) (الطبعة الثالثة ، سنة 1977 ، المكتب الاسلامي) ص (548)

[আল্লামা মুনযীরি (রহঃ) কৃত "মুখতাসারু সহিহীল মুসলিম" এর উপর শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর টিকা সংযোজন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, আল-মাকতাবুল ইসলামি, পৃষ্ঠা-৫৪৮]
এখানে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী খুব সহজে হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেছেন; অথচ তিনি এতটুকু চিন্তা করেননি যে, তাঁর নিজের পিতা একজন সুদৃঢ় হানাফী আলেম। আমরা সকলেই জানি, কেউ যদি ইঞ্জিল অনুযায়ী বিবাহ-শাদী করে, তবে ইসলামে তার বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর পিতা এমন একটি মতবাদের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, যা বিকৃত ইঞ্জিলের সমগোত্রীয়। এখন তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেন, তবে আমাদের কারও আপত্তি করার পূর্বে তাঁর নিজেরই সতর্ক হওয়া উচিৎ। কেননা একথা বলার দ্বারা তার নিজের পিতা-মাতারই বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না।

এছাড়া তিনি তার জীবনে দীর্ঘ একটি সময় নিজেও হানাফী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে,

الحنفي (قديماً) ، ثم الإمام المجتهد بعد

[সাবাতু মুয়াল্লাফাতিল আলবানী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আশ্-শামরানী, পৃষ্ঠা-২, ১৬]

"প্রথম জীবনে হানাফী, পরবর্তী জীবনে নিজেই মুজতাহিদ ইমাম"

তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে ইঞ্জিলের সমতুল্য মনে করে থাকেন, তবে তিনি প্রথম জীবনের যে সময়টাতে হানাফী ছিলেন সেসময়ে তিনি কি মুসলমান ছিলেন?

উস্তাদের অবস্থা যদি হয় এই, তবে তার অনুসারীদের কী অবস্থা হবে? ডাঃ জাকির নায়েক এমন এক ব্যক্তিকে অনুসরণীয় বানিয়েছেন, যিনি সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে এবং হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করতে সামান্যতম দ্বিধা করেন না!

শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহাঃ) এর মত ডাঃ জাকির নায়েকও একই পথে অগ্রসর হয়েছেন। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে ডাঃ জাকির নায়েকের নিচের বক্তব্যটি মিলিয়ে দেখুন। লক্ষ্য করুণ!

Imam Abu Hanifa never came to start a new Hanafi Madhab. Imam Malek never came to start a new Maleki Madhab. Imam Shafi never came to start a new Shafi Madhab. Imam Ahmad Ibn Hambol never came to start a new hamboli Madhab. All of them followed the Madhab of the Rasul. Like how the Christian misunderstood **Jesus** (pbuh) never came to start christianity, he came to islam.

"ইমাম আবু হানীফা নতুন কোন হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম মালেক নতুন কোন মালেকী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম শাফেয়ী নতুন কোন শাফেয়ী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। এদের মাযহাব ছিল, রাসূল (সঃ) এর মাযহাব। বিষয়টি খ্রিস্টানদের মত অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যেমন ভুল বুঝে থাকে যে, হযরত ঈসা (আঃ) খ্রিস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন; মূলতঃ তিনি এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য।"[৭]

বর্তমান বিশ্বে ৯২.৫ ভাগ মুসলমান চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করে থাকে এবং অবশিষ্ট ৭.৫ ভাগ লোক শিয়া মতাবলম্বী।[৮] দীর্ঘ তের শ' বছর যাবৎ মুসমিম উম্মাহ মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে, তবে কি তিনি সব মুসলমানকে খ্রিস্টানদের মত পথভ্রষ্ট মনে করেন?

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হল, ডাঃ জাকির নায়েক যাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী, তারা মাযহাব মানাকে কুফুরী-শিরকী মনে করে থাকে। তাদের অনুসারী হয়ে ডাঃ জাকির নায়েকের পক্ষে এ ধরণের বক্তব্য উপস্থাপন করাটা অস্বাভাবিক নয়। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) যেমন হানাফী মাযহাবকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে তুলনা করেছেন, তার অনুসারী হয়ে ডাঃ জাকির নায়েকও হুবহু তাই করেছেন!

---

[৭] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, পার্ট-৩, ২ মিনিট, ১৩ সেকে-, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

[৮] How Many Shia Are in the World?"। প্রকাশক: IslamicWeb.com। http://islamicweb.com/?folder=beliefs/cults&file=shia_population। সংগৃহীত হয়েছে: 2006-10-18।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ [৯](রহঃ) এর প্রতি অভিশাপঃ

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ সম্পর্কে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) লিখেছেন,

أشل الله يدك وقطع لسانك -يدعو على العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة-.

ويقول عنه: إنه غدة كغدة البعير

ثم يقول مستهزئا ضاحكا: أتعرفون غدة

"আলাহ্ তায়ালা তোমার হাত অবশ করে দিক এবং তোমার জিহ্ক্ষাকে কর্তন করুক[১০] । [কাশফুন নিকাব, পৃষ্ঠা-৫২]
তিনি আরও বলেন[১১], সে হল উটের পেগ্র রোগের মত একটা মহামারী (গুদ্দাতুল বায়ীর) । অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে উপহাস করে বললেন,[১২] তোমরা কি জানো, উটের পেগ্র কী?[১৩]

---

[৯] শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ্ (১৩৩৬/১৯১৭-১৪১৭/১৯৯৭) যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্যতম । মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এবং কিং সাউদ ইইনিভার্সিটিতে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন । তিনি ১৯৭৬ সালে সুদানের Um Durman Islamic University এবং ১৯৭৮ সালে ইয়েমেনের সানআ' ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন । শায়েখের জীবদ্দশায় তাঁর ৬৫ খানা কিতাব প্রকাশিত হয় ।

[১০] শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) মূলতঃ ইবনে হাযাম যাহেরীর অনুসরণ করে থাকেন । ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) যে সমস্ত ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অধিকাংশ পদ্ধতি শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর মাঝে পাওয়া যায় । যেমন, হাদীস সহীহ বা যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা । এমন সব বিকৃত মাসআলা প্রদান, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । বিশেষভাবে, উলামায়ে কেরামের প্রতি অশালীন শব্দ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত । আমার ধারণা মতে এ বিষয়টিও তিনি ইবনে হাযাম (রহঃ) এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন । ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) সম্পর্কে তো প্রবাদতুল্য বক্তব্য হল- "ইবনে হাযামের জবান আর ইউসুফ বিন হাজ্জাজের তলোয়ার সহদোর" كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-199]
ইমাম যাহাবী (রহঃ) ইবনে হাযাম (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন-

ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب وجدع ، فكان جزاؤه من جنس فعله وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء

ইমামদের প্রতি সে অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছে, বরং তাদের সম্পর্কে কটুক্তি করেছে, তাদেরকে গালি দিয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে অশীল্ল উক্তি করেছে । সুতরাং তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে তার লাগামহীন ভাষার কারণে তিনি মুসীবতের সম্মুখীন হয়েছেন"
[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড- 18, পৃষ্ঠা-১৮৪]

[১১] صحيح مسلم - (১২ / ৪৯৩ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
جامع الأحاديث - (২৫ / ২৭২ (وعن قتادة قال قال عمر : أبغض عباد الله إلى الله طعان لعان (ابن المبارك)
[كنز العمال ৯০০৬ [أخرجه ابن المبارك (২৩৭/১ ، رقم ৬৮০

[১২] http://www.youtube.com/watch?v=yRpKoWWUECU&feature=player_embedded

[১৩] كشف النقاب عما في كتاب أبي غدة من الأباطيل والإفتراءات 52

ড. ইউসুফ আল-কারযাবী[১৪] সম্পর্কে শায়েখের উক্তিঃ

তিনি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে বলেছেন,

اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا

"তুমি ইউসুফ কারযাবী থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখো এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো"

তিনি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে আরও বলেছেন,

إن يوسف القرضاوي يفتي الناس بفتاوى مخالفة للشريعة و لهُ فلسفة خطيرة

"ইউসুফ আল-কারযাবী শরীয়ত বিরোধী ফতোয়া প্রদান করে, তার কাছে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব দর্শন"[১৫]

শাইখুল ইসলাম আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)

হাদীসুল গদীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন,

إنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ، قد ضعف الشطر الأول من الحديث ، وأما الشطر الآخر ، فزعم أنه

كذب! وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر

فيها.والله المستعان

"আমি শায়খ ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি, তিনি হাদীসের প্রথম অংশকে দুর্বল বলেছেন এবং হাদীসের শেষ অংশকে তিনি মিথ্যা মনে করেছেন। **আমার ধারণামতে "হাদীসকে যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে এটি ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর**

---

[১৪] ড.কারযাবী বর্তমান সময়ের একজন বিখ্যাত স্কোলার ।আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত তাঁর সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম আশ শরীয়াতু ওয়াল হায়াতু ("Shariah and Life") এ ৬০ মিলিয়ন দর্শক থাকে। তিনি ১২০ টিরও বেশি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি আটটি আন্তর্জাতিক পুরষ্কার অর্জন করেছেন। এ পুরষ্কারের মাঝে রয়েছে, কিং ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ (১৯৯৪), ইসলামিক ডেভলপমেন্ট ব্যাংক প্রাইজ (১৯৯১), দুবাই ইন্ট্যারন্যাশনাল হোলি কুরআন এওয়ার্ড (২০০০)।

[১৫] *http://www.youtube.com/watch?v=yRpKoWWUECU&feature=player_embedded*

বাড়াবাড়ি, যা তাঁকে হাদীসটি যয়ীফ বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে; অথচ তিনি হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন পরম্পরা খতিয়ে দেখেননি। এবং এ ব্যাপারে গভীর দৃষ্টিপাত করেননি।”[১৬]
[সিলসিলাতুস সহীহা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৩-৩৪৪, হাদীস নং ১৭৫০]

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহের সমালোচনা করেছেন। সালাফীরা আলাম্মা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আলাম্মা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এবং আব্দুল ওহাব নজদী (রহঃ) কে তাদের মাইলফলক মনে করে থাকে। কিন্তু শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী সমস্ত আলেমের ক্ষেত্রে সব ধরণের নিয়ম-কানুনের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছেন। এবং যেখানে যেভাবে ইচ্ছা তার সমালোচনা করেছেন।

আলাম্মা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) “কালিমুত তাইয়্যিব” নামক বিখ্যাত একটি কিতাব রচনা করেছেন। শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) সে কিতাবের হাদীসগুলো বিশেষণ করে একটি কিতাব লিখেছেন, সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব। এ কিতাবে নাসীরুদ্দিন আলবানী লিখেছেন-

أنصح لكل من وقف علي هذا الكتاب (الكلم الطيب لإبن تيمية) و غيره: أن لا يبادر إلي العمل بما فيه من الأحاديث، إلا بعد التأكيد من ثبوتها، و قد سهلنا له السبيل إلي ذلك بما علقنا عليه ، فما كان ثابتا منها عمل به ...وإلا تركه، (صحيح الكلم الطيب-ص-4)

“যারা আলাম্মা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর এ কিতাবটি সম্পর্কে অবগত রয়েছে, তাদেরকে নসীহত করব, এ কিতাবে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে, সেগুলোর প্রতি তারা যেন আমল করতে অগ্রসর না হয়, যতক্ষণ না হাদীসগুলো শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়। আমি এর উপর যে টিকা সংযোজন করেছি, এর মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং যে সমস্ত হাদীস প্রমাণিত হবে, সেগুলোর উপর আমল করা হবে, নতুবা সেটি পরিত্যাগ করা হবে”
[সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব, পৃষ্ঠা-৪]
শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর এ কথা উলেখ করে আলাম্মা হাবীবুর রহমান আজমী (রহঃ) লিখেছেন,

---

[১৬] السلسلة الصحيحة (4/343-344) رقم (1750)

و ليس يعني الألباني بذلك إلا أنه يجب علي الناس أن يتخذوه إماما و يقلدوه تقليدا أعمي، ولا يعتمدوا علي إبن تيمية و لا علي غيره من الثقات الأثبات من المحدثين، في ثبوت الأحاديث حتي يسألوا الألباني و يرجعوا إلي تحقيقاته!

“অর্থাৎ নাসীরুদ্দিন আলবানীর একথা বলার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন আবশ্যকভাবে তাঁকে ইমাম বানায় এবং তাঁর অন্ধ অনুকরণ করে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আলবানীকে জিজ্ঞেস না করবে এবং তার বিশেষণকে গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আলাম্মা ইবনে তাইমিয়াসহ অন্য কোন বিশ্বস্ত ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহাদ্দিসের হাদীসের উপরও নির্ভর করবে না।”[১৭]

মূলতঃ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিসের হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এবং এ সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি হাদীসশাস্ত্রের কোন মূলনীতিরও তোয়াক্কা করেননি। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ যে সমস্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন, সেগুলোকে তিনি যয়ীফ বলেছেন, আবার তারা যেটাকে যয়ীফ বলেছেন, তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সেগুলোকে সহীহ বলেছেন।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী একটি হাদীসকে এক কিতাবে সহীহ বলেছেন, অন্য কোথাও সেটিকে আবার যয়ীফ বলেছেন। এ ধরণের হাদীসের সংখ্যা একটি দু’টি নয়। অসংখ্য হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি এ ধরণের স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন; অথচ ডাঃ জাকির নায়েক শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) কে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মনে করে থাকেন। তিনি এমন ব্যক্তির হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন, যিনি হাদীস শাস্ত্রের কোন মুহাদ্দিসকে তার সমালোচনা থেকে মুক্তি দেননি। এবং হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর সুপ্রমাণিত কোন সনদ নেই।

জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) সম্পর্কে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী লিখেছেন,

فيا عجباً للسيوطي كيف لم يخجل من تسويد كتابهِ الجامع الصغير بهذا الحديث

[১৭] আল-আলবানী, শুযুযুহু ও আখতাউহু, পৃষ্ঠা-৪০

"কী আশ্চর্য! জালালুদ্দিন সূয়ূতী তাঁর জামে সগীরে কিভাবে এ হাদীস উলেখ করতে একটু লজ্জাবোধ করলেন না![18]

তিনি জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ) সম্পর্কে আরও লিখেছেন-

وجعجع حولهُ السيوطي

অর্থাৎ জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ) হাঁক-ডাক ছেড়ে থাকেন।
[সিল-সিলাতুজ জয়িফা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৯]

ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী এবং আলামা মুনযিরি (রহঃ) সম্পর্কে শায়েখের উক্তিঃ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর দৃষ্টিতে একটা হাদিস সহীহ নয়, অথচ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে সহীহ বলায় তিনি হাদীসের বিখ্যাত তিন মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী, ইমাম মুনযিরি (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي ! وأقره المنذري في " الترغيب " (3 / 166) ! وكل ذلك من إهمال التحقيق ، والاستسلام للتقليد ، وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا ا لاسناد

"হাকেম বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একাত্নতা ঘোষণা করেছেন। ইমাম মুনযিরি (রহঃ) "তারগীব ও তারহীব" নামক কিতাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এটি হয়েছে, তত্ত্ব-বিশেষণের প্রতি উদাসীনতা, তাকলীদের প্রতি আত্নসমর্পণ
(অন্ধানুকরণ), নতুবা একজন বিশেষণধর্মী আলেম কিভাবে একে সহীহ বলতে পারেন"[১৯]

হাফেয তাজুদ্দিন সুবকী[২০] (রহঃ) সম্পর্কে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী মন্তব্য করেছেন-

ولكنه دافع عنه بوازع من التعصب المذهبي ، لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان ما فيه من التعصب. .

---

[১৮] সিলসিলাতুজ জয়িফা, খণ্ড-3,পৃষ্ঠা-৪৭৯

[১৯] সিলসিলাতুজ জয়িফা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৬

[২০] আবু নস্‌র তাজুদ্দিন আব্দুল ওহাব বিন আলী বিন আব্দুল কাফী (৭১৭হিঃ-৭৭১হিঃ)। তাজুদ্দিন সুবকি (রহঃ) শাইখুল ইসলাম ও কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) তকিউদ্দীন সুবকি (রহঃ) এর ছেলে। তিনি বিখ্যাত কিছু কিতাব রচনা করেছেন-আল-কাওয়াইদুল মুশতামিলা আলাল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের (القواعد المشتملة على الأشباه والنظائر.), জামউল জাওয়ামে' (جمع الجوامع)

মাযহাব অনুসরণের গোঁড়ামি তাঁকে প্ররোচিত করেছে। তাঁর কথা উলেখ করে এবং তাঁর গোঁড়ামির কথা আলোচনা করে তেমন উলেখযোগ্য কোন উপকারিতা নেই। [সিল-সিলাতুজ যয়িফা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫]

শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

الشيخ ناصر الدين الالباني شديد الولوع بتخطئة الحذاق من كبار علماء الاسلام ولا يحابى في ذلك أحدا كائنا من كان ، فتراه يوهم البخاري ومسلما ، ومن دونهما ، ويغلط ابن عبد البر وابن حزم والذهبي وابن حجر والصنعانى ، ويكثر من ذلك حتى يظن الجهلة والسذج من العلماء ان الالباني نبغ في هذا العصرنبوغا يندر مثله

"শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের ভুল ধরার ব্যাপারে চরম বেপরোয়া। এ পথে তিনি কাউকেই মুক্তি দেননি। আপনি দেখবেন! সে ইমাম বোখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিমসহ অপরাপর ইমামদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে আব্দুল বার (রহঃ), ইবনে হাযাম (রহঃ), ইমাম যাহাবী (রহঃ) ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমাম সানআনী (রহঃ) সহ আরও অনেককে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ অনেক অজ্ঞ এবং সাধারণ আলেম তাঁকে বর্তমান যুগের বিরল ব্যক্তিত্ব মনে করে থাকেন।"[২১]

বর্তমান বিশ্বের যে সমস্ত আলেম শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর এসমস্ত ভ্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এ সম্পর্কে কিতাব লিখেছেন তাদের কয়েকজনের নাম উলেখ করা হল-

১. শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহঃ)। তাঁর রচিত কিতাবের নাম-

الألباني شذوذه وأخطاؤه

২. উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুলাহ আল-গুমারী (রহঃ)। তাঁর কিতাবের নাম হল-

"القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع"

৩. শায়েখ আব্দুল আযীয গুমারী-

"بيان نكث الناكث المقعدي بتضعيف الحارث"

৪. শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-খাজরাযী

[২১] আল-আলবানী, শুযুযুহু ও আখতাউহু, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯

"الألباني تطرفاته"

৫. উস্তাদ বদরুদ্দিন হাসান দিয়াব দামেশকী-

"أنوار المصابيح على ظلمات الألباني في صلاة التراويح"

৬. শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুলাহ আল-হারারী,

التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث

৭. শায়েখ আব্দুলাহ বিন বায (রহঃ)

"أينَ يضع المصلي يده في الصلاة بعد الرفع من الركوع"

৮. শায়েখ ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আনসারী (রহঃ)

"تصحيحُ حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والردّ على الألباني في تضعيفه"

৯. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ)

"كلماتٌ في كشف أباطيل وافتراءات"

১০. শায়েখ হাসান বিন আলী আস-সাক্কাফ

قاموس شتائم الألباني وألفاظه المنكرة في حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم

১১. শায়েখ হাসান বিন আলী আস-সাক্কাফ,

"البشارةُ والإتحاف فيما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاختلاف"

আমরা এখানে সামান্য কয়েকটি কিতাবের নাম উলেখ করেছি। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর ভ্রান্ত বিষয়গুলির সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ অধিকাংশ আলেম স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। "সাবাতু মুয়ালাফাতিল আলবানী" এর গ্রন্থকার এ ধরণের ৫৭ টি কিতাবের নাম উলেখ করেছেন। এ সমস্ত গ্রন্থে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর ভ্রান্তি গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

বিখ্যাত সালাফী আলেমদের মধ্যে যারা শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর এ সমস্ত ভ্রান্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিচে উলেখ করা হল-

১. শায়েখ আব্দুলাহ বিন বায (রহঃ)।
২. শায়েখ হামুদ বিন আব্দুলাহ (রহঃ)।
৩. ড. বকর বিন আব্দুলাহ আবু যায়েদ।

৪. শায়েখ আব্দুলাহ্ বিন মুহাম্মাদ আদ-দাবীশ (রহঃ)
৫. সফর বিন আব্দুর রহমান ।
৬. মুহাদ্দিস আব্দুলাহ্ বিন আব্দুর রহমান সা'আদ ।
৭. শায়েখ আব্দুলাহ্ বিন মা'নে আল-উতাইবি ।
৮. শায়েখ ফাহাদ বিন আব্দুলাহ্ আস-সুনাইদ ।
৯. আবু আব্দুলাহ্ মুস্তফা আল-আদাবী ।

জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ এর দাওয়া বিভাগের প্রধান ড.আব্দুল আযীয আল-আসকার শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে লিখেছেন,

الألباني واتباعه ليسوا سلفية

"আলবানী এবং তার অনুসারীরা মূলতঃ সালাফী নয়"[২২]

অর্থাৎ এরা সালাফী (পূর্ববর্তীদের অনুসারী) হওয়ার দাবী করে কিন্তু বাস্তবে এরা সালাফী নয় ।

সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েক যাদেরকে অনুসরণ করছেন, যাদের মতাদর্শ সমাজে প্রচার করছেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যেমন সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট সংশয় রয়েছে, তেমনি কেউ যদি তাদের মতাদর্শ প্রচার করে, তবে তার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও প্রশ্ন থাকাটা অস্বাভাবিক নয় ।

অতএব, সর্বশেষ কথা হল, তাবেয়ী ইবনে সিরিন (রহঃ) বলেছেন,

إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم

"নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং লক্ষ্য রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো"[২৩]

---

[২২] জারিদাতু উকায, মাজালুর রায়, http://www.soufia.org/alalbany_askar.html
[২৩] شرح مسلم للنووي১/৮৪]

চার মাযহাবের অনুসরণঃ প্রচলিত একটি ভুল ধারণা

What is Taqleed _ Taqleed kia hai নামক এক সাক্ষাৎকারে[২৪] ডাঃ জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয়,

اس وقت پرا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذھنیت کے ساتھ رواں دواں ھیں آپ یہ فرمائے کہ اس مقلدانہ ذھنیت دین کو فایدہ پہنچایا ھے یا نقصان

অর্থাৎ বর্তমান পুরো বিশ্বের অধিকাংশ লোক তাকলীদের তথা মাযহাব অনুসণের মনোভাব পোষণ করছে, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? মাযহাব অনুসরণের এ মনোভাব কি মুসলিম উম্মাহের উপকার করেছে না কি তা তাদের ক্ষতির কারণ হয়েছে?

ডাঃ জাকির নায়েক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

نقصان پنچایا ھے میرے حساب سے زیادہ نقصان پہنچایا ھے

অর্থাৎ মাযহাব অনুসরণ তাদেরকে ক্ষতি করেছে। আমার মতে অনেক ক্ষতি করেছে।

ডাঃ জাকির নায়েক আরও বলেছেন,

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki.

"অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন মুসলমানের জন্য এ চার মাযহাব অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, এগুলোর কোন একটিকে অনুসরণ করতে হবে।"[২৫]

ডাঃ জাকির নায়েক এখানে চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণের বিষয়কে "প্রচলিত ভুল ধারণা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা ডাঃ জাকির নায়েকের এ কথার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করব।

---

[২৪] http://www.youtube.com/watch?v=leuNHQR7POI

[২৫] http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199

প্রিয় পাঠক! ডাঃ জাকির নায়েক যাকে প্রচলিত ভুল ধারণা বলছেন, সেসম্পর্কে দীর্ঘ বার-তেরশ' বছর যাবৎ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসিরগণের অভিমত উলেখ করা হল-

- "মানাকেবে আহমাদ" নামক কিতাবে আলামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) উলেখ করেছেন,"মাইমুনী (রহঃ) বলেছেন, ইমাম আহমাদ আমাকে বলেছেন,

يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيه إمام

"হে আবুল হাসান! যে মাসআলায় তোমার কোন ইমাম নেই, সে মাসআলা থেকে তুমি বেঁচে থাক"
[মানাকেবে আহমাদ, আলামা ইবনুল জাওযী রহ. পৃষ্ঠা-১৭৮]

- "আখবারু আবি হানিফা" নামক কিতাবে আলামা সুমাইরী (রহঃ) ইমাম যুফার (রহঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুফার (রহঃ) বলেছেন,

إني لست أناظر أحدا حتي يقول قد أخطأت، ولكني أناظره حتي يجن ، قيل: كيف يجن؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد

"অর্থাৎ কেউ ভুল স্বীকার করলেও তার সাথে আমি ইলমী আলোচনা করতে থাকি, যতক্ষণ না সে পাগল হয়ে যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কিভাবে পাগল হয়? তিনি উত্তর দিলেন- "এমন মতামত পেশ করে, যা কেউ কখনও বলেনি।"
[আখবারু আবি হানিফা, আলামা সুমাইরি (রহঃ), পৃষ্ঠা-১১০]

- আলামা যারকাশী (রহঃ) "বাহরে মুহীত" নামক কিতাবে লিখেছেন,

والحق أن العصر خلاعن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد عن مذاهب الأربعة وقد وقع الإتفاق بين المسلمين علي أن الحق منحصر في هذه الأربعة، و حينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الإجتهاد إلا فيها

"স্বীকৃত বিষয় হল, বর্তমান যুগে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ (মুজতাহিদে মুতলাক) নেই। তবে সংশিষ্ট মাযহাবে মুজতাহিদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হক্ব এই চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এ চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয়। এবং এই চার মাযহাবের উপরই কেবল ইজতেহাদ করা যাবে।"
[আলবাহরুল মুহীত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৪০]

- আলামা নাফরাবী (রহঃ) লিখেছেন,

وقد إنعقد إجماع مسلمين اليوم علي وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ، ومالك و الشافعي وأحمدبن حنبل رضي الله عنهم و عدم جواز الخروج عن مذاهبهم

অর্থাৎ “বর্তমান মুসলমানদের এ ব্যাপারে ইজমা’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, চার মাযহাব অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এগুলোর কোন একটি অনুসরণ করা জরুরি। মুসলিম উম্মাহের মাঝে এ ব্যাপারেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ চার মাযহাব থেকে বের হয়ে অন্য কোন মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয নেই”

- “মারাকিস সুউদ” নামক কিতাবের গ্রন্থকার লিখেছেন-

و المجمع اليوم عليه الأربعة   وقفو غيرها الجميع منعه

“বর্তমানে চার মাযহাবের উপর ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য যে কোন মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে সকলেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।”

- আলামা ইবনে মুফলিহ্ (রহঃ) লিখেছেন,

في الإفصاح : إن الإجماع إنعقد علي تقليد كل من المذاهب الأربعة و أن الحق لا يخرج عنهم

“অর্থাৎ এ ব্যাপারে ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, চার মাযহাবের কোন একটিকে অনুসরণ করতে হবে এবং চার মাযহাবের মাঝেই সত্য নিহিত রয়েছে”
[আল-ফুরু, আলামা ইবনে মুফলিহ্ রহ. খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৭৪]

- আলামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব (রহঃ) “আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর” নামক কিতাবে লিখেছেন,

ذكر بعض المتأخرين و هو ابن الصلاح منع تقليد غير أئمة الأربعة: أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد رحمهم الله

“পরবর্তী উলামাগণ যেমন আলামা ইবনুস সালাহ উলেখ করেছেন যে, চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ) ব্যতীত অন্য কারও মাযহাব অনুসরণ করা বৈধ নয়”

[আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, আল্লামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব রহ. খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭২]

- বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন (রহঃ) তাঁর মুকাদ্দামায় লিখেছেন,

ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة و درس المقلدون لمن سواهم و سد الناس باب الخلاف و طرقه لما كثر تشعب الإصطلاحات في العلوم و لما عاق عن الوصول إلي رتبة الإجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلي غير أهله و من لا يوثق برأيه و لا بدينه فصرحوا بالعجز و الإعواز و ردوا الناس إلي تقليد هؤلاء كل من إختص به من المقلدين و حظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم...ومدعي الإجتهاد لهذا العصر مردود علي عقبه مهجور تقليجده و قد صارأهل ألإسلام اليوم علي هؤلاء الأربعة

"অর্থাৎ বর্তমানে সমস্ত শহরে শুধু এ চার মাযহাবেরই অনুসরণ করা হয় এবং এর অনুসারীগণ অন্যদেরকে এ চার মাযহাবের মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর মানুষ এ ব্যাপারে মতানৈক্যের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর কারণ হল, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের শাখা প্রশাখায় নিত্য-নতুন পরিভাষা সৃষ্টি। আর যখন মানুষ "ইজতেহাদ" এর স্তরে উন্নীত হওয়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং ইজতেহাদের বিষয়ে অযোগ্য ও দ্বীনের ব্যাপারে আস্থাহীন লোকদের হস্তক্ষেপের ভয় করল, তখন তারা নিরূপায় হয়ে মানুষকে এ চার মাযহাবের কোন একটিকে অনুসরণের নির্দেশ দিল। এবং চার মাযহাবের ক্ষেত্রে রদবদল বা তালফীক করা থেকে মানুষকে সতর্ক করল। কেননা এটি দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা করারই নামান্তর। সুতরাং এ যুগে কেবল এ চার মাযহাবের মাসআলা-মাসাইলই চর্চা করা হয়। **এ যুগে কারও "মুজতাহিদ" হওয়ার দাবী সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হবে, সুতরাং এধরণের দাবীদারের অনুসরণও নিষিদ্ধ। বর্তমান সময়ের মুসলমানগণ এ চার মাযহাবের উপরই একমত হয়েছেন।"**

[মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৩]

- আল্লামা যারকাশী (রহঃ) "বাহরুল মুহীত"এ লিখেছেন-

الدليل يقتضي إلتزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة

অর্থাৎ দলিলের দাবী হল, চার ইমামের পরে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে চলা জরুরি।

[আলবাহরুল মুহিত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৭৪]

- আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন-

"إن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة"

অর্থাৎ কেউ যদি মনে করে যে, আমি চার মাযহাবের কোনটিকেই অনুসরণ করব না বরং তার বিরোধীতা করব, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে। কেননা শরীয়তের অধিকাংশ মাসআলার বিশুদ্ধ ও হক্ব বিষয় এ চার মাযহাবে রয়েছে।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা" এ লিখেছেন-

لا يكاد يوجد الحق فيما إتفق أئمة الإجتهاد الأربعة علي خلافه

"চার ইমাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সে বিষয়ের বিপরীতে কোন সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না"

[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', আলামা যাহাবী (রহঃ), খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৭]

আলামা মুনাবী (রহঃ) "ফায়যুল কাদীর" নামক কিতাবে লিখেছেন,

فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء و الإفتاء لأن المذاهب الأربعة إنتشرت و تحررت

অর্থাৎ বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবের অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর সব কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

[ফায়যুল কাদীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১০]

মাযহাবের ব্যাপারে আব্দুল ওহাব নজদী (রহঃ) এর অভিমতঃ

"ونحن أيضا في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلَّد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير، الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرُّهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. ولا نستحقُّ مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها،

“শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে আমরা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর মাযহাবের অনুসারী। আমরা চার মাযহাবের অনুসারী কারও প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব রাখি না। তবে চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাব এর ব্যতিক্রম। কেননা সেসমস্ত মাযহাব সুশৃংখলভাবে সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যেমন, রাফেযী, যায়দী, ইমামিয়া ইত্যাদি। এবং আমরা তাদের ভ্রান্ত মাযহাব সমূহের স্বীকৃতিও প্রদান করি না। বরং আমরা তাদেরকে চার ইমামের কোন একজনকে অনুসরণ করতে বাধ্য করি।

আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইজতেহাদের যোগ্য নই। এবং আমাদের কেউ এর যোগ্য হওয়ার দাবীও করে না।”
[আদ্-দুরারুস সুন্নিয়াহ্ মিনাল আজয়িবাতিন নজদিয়্যা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৭]

আলোচনা দীর্ঘ হওয়ায় আরও অনেক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এখানে উলেখ করা হয়নি। তবে যুগশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত আলেমের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে, একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ।

প্রিয় পাঠক! যুগশ্রেষ্ঠ এসমস্ত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য যদি ভুল ধারণা হয়, তবে ডাঃ জাকির নায়েকের বক্তব্য যে, কোন স্তরের, তা সহজেই অনুমেয়। যুগশ্রেষ্ঠ, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরগণের বক্তব্যের সাথে বর্তমান সময়ের ডাঃ জাকির নায়েক কিংবা অন্য কোন সালাফী বা আহলে হাদীসের বক্তব্য তুলনা করুন। ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর তুলনায় কিছুই নন। আর আমরা বলব, এখানে যাদের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের একজনের তুলনায় নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ)ও কিছুই নন।

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ মুহাদ্দিসগণ যাকে ওয়াজিব বলছেন, ডাঃ জাকির নায়েক তাকে বলছেন, ভুল ধারণা। উলামায়ে কেরাম যাকে সফলতার কারণ বলছেন, ডাঃ জাকির নায়েক তাকে বলছেন, এটি মুসলিম উম্মাহের ক্ষতির কারণ।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব পাঠকের। কাদের কথা গ্রহণ করা উচিৎ আর কাদের পরিত্যাগ করা উচিৎ। কেননা তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন সিরীন (রহঃ) এর সেই কালজয়ী উক্তি-

إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم

"নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং লক্ষ্য রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো"[২৬]

[মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, আলামা নববী (রহঃ) কর্তৃক রচিত। খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৪]

[২৬] شرح مسلم للنووي১/৮৪]

কুরআন ও হাদীসে কোথাও চার মাযহাব অনুসরণের কথা নেই

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki. There is no proof whatsoever in the Qur'an or any authentic Hadith that a Muslim should only follow one of these four Imams.

"মুসলিম উম্মাহের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, মুসলমানদের চার মাযহাবের কোন একটি অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, অথবা হাম্বলী এর অনুসরণ করতে হবে। অথচ কুরআন ও 'সহীহ' হাদীসের কোথাও নেই যে, মুসলমানদের চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করা উচিৎ"[২৭]

এখানে ডাঃ জাকির নায়েক যে কথাটি বলেছেন, এটি স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ লা-মাযহাবী বা সালাফীরা বলে থাকেন। অনেক সাধারণ মুসলমানও এর দ্বারা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। আসলেই তো কুরআনও হাদীসে কোথাও চার ইমামের অনুসরণের কথা নেই; তবে আমরা কেন তাদেরকে অনুসরণ করতে যাব?

বিজ্ঞ পাঠক! শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী সম্পর্কে ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-

"Many of my talks are based on his research Mashallah!

"আমার অনেক লেকচার শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি।"[২৮]

এখন কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, "কুরআন ও হাদীসে কোথাও তো একথা নেই, ইসলামের তের শ' বছর পরে নাসীরুদ্দিন আলবানী নামে এক লোক আসবে, তার গবেষণার উপর ভিত্তি করে তুমি তোমার লেকচার তৈরি করবে"

---

[২৭]http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199

[২৮] Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH – YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0

ডাঃ জাকির নায়েক আরও বলেছেন,

1. what he says, I follow on the face of it

“তিনি যা বলেন, আমি সে অনুসারে চলি”
“কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথাও নেই যে, নাসীরুদ্দিন আলবানী যা বলবেন, সে অনুসারে চলো”[২৯]

ডাঃ জাকির নায়েকের যারা ভক্ত রয়েছেন, যারা তার মাসআলা গ্রহণ করে থাকেন, তাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই যে, জাকির নায়েক নামে এক লোক আসবে আর তোমরা তার অনুসরণ করবে ।

আমরা জানি, কুরআন ও হাদীসে সকল বিষয়ে মূলতঃ একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয় । অতঃপর এ মূলনীতির আলোকে সংশিষ্ট বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় । যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খলিফা, বিচারক বা আমীরের অনুসরণের বিষয়টি । সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফা, আমীর বা শাসকের অনুসরণ যে ফরয এ সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না । এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে । এখন ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যদি প্রশ্ন করে যে, আমাদের আমীর বা শাসকের নাম তো কুরআন ও হাদীসে কোথাও নেই, তাহলে আমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ পালন করা জরুরি না, তবে এ ব্যক্তি যে সুস্পষ্ট ভুলের মাঝে রয়েছে, তা সহজেই অনুমেয় ।

একইভাবে, কুরআনে ও সহীহ হাদীসে মূলনীতি দেয়া আছে যে, মাসআলা-মাসাইল ও ইজতেহাদের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ উলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞাসা করবে এবং মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের জন্য কর্তব্য হল, তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী ইজতেহাদ করবে ।
স্পষ্টতঃ ফিকহের বিষয়ে কুরআন ও রাসূল (সঃ) এর হাদীসে শুধু মূলনীতি দেয়া আছে, সুনির্দিষ্টভাবে কারও নাম উলেখ করা হয়নি । এখন এ মূলনীতির আলোকে

---

[২৯] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

উলামায়ে কেরাম নির্ধারণ করেছেন, মাসআলা-মাসাইল গ্রহণের ক্ষেত্রে কাদের কথা গ্রহণযোগ্য এবং কাদের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয় ।

ডাঃ জাকির নায়েক তাঁর প্রায় লেকচারে বলে থাকেন, কুরআনের পরে সহীহ বোখারীর অবস্থান । বিশুদ্ধতার বিচারে সহীহ বোখারী অবস্থান হল-“আছাহ্হুল কুতুব বা’দা কিতাবিল্লাহ” (কুরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল, সহীহ বোখারী) । এটি একটি স্বীকৃত বিষয় । এখন ডাঃ জাকির নায়েককে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এ কথাটি কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই যে, কিতাবুল্লাহর পরে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল সহীহ বোখারী । তবে কি কেউ সহীহ বোখারী সম্পর্কে একথা বলতে পারবে যে, এটি একটি প্রচলিত ভুল ধারণা, এটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোথাও নেই?

এর সহজ উত্তর হল, এটি উলামায়ে কেরামের “ইজমা” দ্বারা প্রমাণিত । একইভাবে, রাসূল (সঃ) এর প্রতিটি হাদীস সহীহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের উপর । কেননা, রাসূল (সঃ) এর কোন হাদীসে বলা থাকে না যে, এটি সহীহ, এটি যয়ীফ, এটি জাল হাদীস । এ কাজটি মূলতঃ করেন হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরামগণ ।

উলামায়ে কেরামের উপর নির্ভর করে আমরা কোন হাদীসকে সহীহ, যয়ীফ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি । কিন্তু আমাদের অবস্থা হল, উলামায়ে কেরামই যখন ফিকহী বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করছেন- “এদের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য, এদের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়” তখন আমরা তাদের সে বক্তব্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই ।
লক্ষণীয় যে, ডাঃ জাকির নায়েকের উলেখিত বক্তব্যে সবচেয়ে বড় ভুল হল, তিনি বলেছেন, চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণের কথা “কুরআন” ও “সহীহ হাদীসে” নেই ।

আমাদের প্রশ্ন হল, ইসলামের বিধি-বিধানের উৎস কি শুধু “কুরআন” ও সহীহ হাদীস?

যদি তিনি বলেন, হ্যাঁ । তবে আমরা বলব- তিনি নিজেই নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছেন । কেননা ডাঃ জাকির নায়েক নিজে "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন-

In the Shariah, in the Islamic ruling, the highest authority, there are four catagories; the highest authority is the Quran. If you do not find in the Quran, you go to the next source, that is the Hadith, the Sahih Hadith, the Sayings of the Prophet. The commandment of the Prophet carries more weight than the action of the Prophet. If the commandment and action contradict the commandment carries weight. The third source: the Sahaba's Ijma. The three generations, Sahaba, Tabi'een, and Tabi' Tabi'een. The Ijma' of these people of the Sahaba, carries more weight than the individual opinion of the Sahaba. Then Tabi'een and Tabi'-Tabi'een. And the last source is the Qiyas. If you don't find it in any top three sources, in the Quran, in the Hadith, in the lifestyle of the Sahaba, Tabi'een and Tabi'-Tabi'een, then you can use Qias, analogy, deduction.

"ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান প্রমাণিত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উৎস হল চারটি । এর মাঝে সর্বোচ্চ প্রমাণ হল, কুরআন । যদি তুমি কুরআনে না পাও তবে দ্বিতীয় উৎসের দিকে যাও । হাদীস । সহীহ হাদীস । অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সঃ) এর বাণী । রাসূল (সঃ) এর আদেশ, রাসূল (সঃ) এর আমল থেকে শক্তিশালী । যদি রাসূল (সঃ) এর বাণী এবং আমল স্ববিরোধী হয়, তবে রাসূল (সঃ) এর বাণী প্রাধান্য পাবে । তৃতীয়টি হল, সাহাবীদের ইজমা । সাহাবীদের ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য) তাদের পৃথক পৃথক মতামতের চেয়ে শক্তিশালী । অতঃপর তাবেয়ী, অতঃপর তাবে তাবেয়ীন । অর্থাৎ তিন যুগ তথা সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীন । সর্বশেষ উৎস হল, ক্বিয়াস । যদি তুমি কোন বিধান পূর্বোক্ত তিনটি বিষয় তথা, কুরআন, সুন্নাহ,সাহাবীদের আমল, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের আমলের মাঝে না পাও তবে, তুমি ক্বিয়াস ব্যবহার করতে পারো ।" [৩০]

ডাঃ জাকির নায়েকের এ বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি কখনও এ কথা বলতে পারবেন না যে, ইসলামের বিধি-বিধান শুধু "কুরআন" ও "সহীহ" দ্বারা প্রমাণিত হয় । সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েকের পক্ষে কখনও এটি বলা সম্ভব নয় যে, কুরআন ও সহীহ

---

[৩০] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

হাদীসে নেই, এজন্য এটি একটি ভুল ধারণা। কেননা কোন একটি বিষয় কুরআন ও সহীহ হাদীসে না থাকলেই যে সেটি 'ভুল ধারণা' হবে একথা বলা মূলতঃ শরীয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর। আলাহ্ আমাদেরকে যে শরীয়ত দিয়েছেন, এটি শুধু "কুরআন ও "সহীহ" হাদীসে সীমাবদ্ধ নয়। "সহীহ" হাদীস ব্যতীত হাসান লিজাতিহি, হাসান লিগাইরিহি, যয়ীফ হাদীসও যেমন রাসূল (সঃ) এর হাদীস, তেমনি ইজমা, ক্বিয়াসও শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ। অতএব, ডাঃ জাকির নায়েক এখানে নিজেই নিজের বিরোধীতা করে একটি বিষয়কে "ভুল ধারণা" বলেছেন।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উপস্থাপন করেছি, যেখানে যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সকলেই উলেখ করেছেন যে, চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ইজমা সংগঠিত হয়েছে। আর ইজমা শরীয়তের চার দলীলের একটি, যা ডাঃ জাকির নায়েক নিজেও স্বীকার করেছেন।

এরপরও ডাঃ জাকির নায়েক যদি বলেন, আমি উলামায়ে কেরামের এ ইজমা মানি না। আমাকে শুধু "কুরআন ও সহীহ" হাদীস থেকে প্রমাণ দেখাতে হবে। তবে আমরা বলব, কারও জন্য দ্বি-মুখী নীতি অবলম্বন করা কখনও বৈধ ও বাস্তব সম্মত হতে পারে না। কেননা একদিকে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ইজমা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ, অন্যদিকে তিনি বলছেন, কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই এজন্য এটি একটি ভুল ধারণা।

এটি সর্বজনবিদিত যে, রাসূল (সঃ) এর ইন্তেকালের পর প্রায় এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ সাহাবী বর্তমান ছিলেন। রাসূলের ইন্তেকালের পর সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হয়েছে। মূল প্রশ্নটি হল, এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে কয়জন সাহাবী ফতোয়া প্রদান করতেন এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান পেশ করতেন?

আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন,

والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين و زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر.

রাসূলের (সঃ) সাহাবীদের মধ্যে যাদের ফতোয়া সংরক্ষণ করা হয়েছে তাদের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় একশ' ত্রিশজন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফতোয়া প্রদান করতেন সাতজন–

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)
২. আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ)
৩. আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)
৪. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)
৫. যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ)
৬. আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)
৭. আব্দুলাহ ইবনে উমর (রাঃ)

একশ' ত্রিশজন সাহাবীর মধ্যে যাদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব বেশি নয় আবার খুব কমও নয়, অর্থাৎ যাদের ফতোয়ার সংখ্যা মাধ্যমিক স্তরের, তাদের সংখ্যা হল, তেরজন।

এ বিশজন ব্যতীত একশ' ত্রিশজন সাহাবীর অবশিষ্ট সকলেই যে ফতোয়া প্রদান করেছেন, তার সংখ্যা খুবই কম।[৩১]

এখানে বিবেচনার বিষয় হল, কোথায় সোয়া লক্ষ আর কোথায় একশ-দু'শ সাহাবী! অবশিষ্ট সাহাবীরা তাহলে কী করেছেন? স্পষ্টতঃ অন্যান্য সাহাবীরা ফতোয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সাহাবী অভিজ্ঞ ছিলেন, তাদের অনুসরণ করেছেন।

- আলামা ইবনে সিরীন (রহঃ) দোয়া করতেন,

"اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر اقتدي به ابن عباس"

---

[৩১] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাবিব্বল আলামিন, আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১২

"হে আল্লাহ! আপনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে যতদিন জীবিত রাখেন ততদিন আমাকেও জীবিত রাখুন! যেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের অনুসরণ করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)"[৩২]

এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের অনুসরণ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন, রইসুল মুফাসসিরীন (মুফাসসিরগণের সরদার)। রাসূল (সঃ) তাঁর জন্য দুআ করেছেন, "আল্লাহুম্মা আলিম হুল কিতাব" (হে আল্লাহ তাঁকে কুরআনের ইলম দান করুন)। এতবড় বিদ্বান ব্যক্তি, অথচ তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর অনুসরণ করেছেন। ডাঃ জাকির নায়েক এক্ষেত্রে কী বলবেন? ডাঃ জাকির নায়েক কি এক্ষেত্রে বলবেন যে, যেহেতু এবিষয়টি কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই এজন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের অনুসরণ করাটাও বৈধ নয়?

- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ইলম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাবেয়ী হযরত মাইমুন ইবনে মিহরান বলেছেন!

"ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس"

"আমি হযরত ইবনে উমরের চেয়ে অধিক ফকীহ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখেনি।"
[ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এত বড় ফযিলত ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবী করেছেন?

হযরত ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন,

"وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا".

---

৩২ প্রাগুক্ত

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুলাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) এবং রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে পরবর্তীতে যারা মদীনায় বসবাস করতেন, তাদের অনেকেই হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) এর 'মাযহাব' অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। তারা হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) এর নিকট থেকে সেসব বিষয় গ্রহণ করতেন, যেগুলোর ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর সংরক্ষিত কোন হাদীস পেতেন না"
[ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন, আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১]

এখানে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ফিকহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে অনুসরণ করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) এর মাযহাব অনুসরণ করতেন। সুতরাং রাসূল (সঃ) এর সাহাবীদের মাঝে যারা অভিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তারাই ফতোয়া প্রদান করতেন। এবং অন্যরা তাদের অনুসরণ করতেন।

একই ভাবে মুসলিম উম্মাহ ফিকহ্ শাস্ত্রে চার ইমামের অনুসরণের ব্যাপারে একমত হয়েছে। কেননা ফিকহ্ শাস্ত্রে চার ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের বিষয়ে সকলে একমত।

আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) এর উক্তিঃ

চার মাযহাবের উপর ডাঃ জাকির নায়েক যে অভিযোগ করেছেন, এধরণের অভিযোগ প্রসঙ্গে আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) লিখেছেন-

فإن قال أحمق متكلف: كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين و يمنع من الإجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين؟

অর্থাৎ যদি কোন নির্বোধ প্রশ্ন করে যে, কেন মানুষকে সুনির্দিষ্ট কিছু আলেমের বক্তব্যের উপর সীমাবদ্ধ করা হবে এবং আমাদেরকে "ইজতেহাদ" থেকে বাঁধা প্রদান করা হবে অথবা আমাদেরকে চার ইমাম ব্যতীত অন্য ইমামদের অনুসরণ করতে দেয়া হবে না কেন?

قيل له: كما جمع الصحابة رضي الله عنهم الناس من القراءة بغيره من القرآن؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، و أن الناس إذا تركوا يقرؤون بحروف شتي و قعوا في أعظم المهالك
فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام، لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين: لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين؛ فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين، وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين .فلا تقضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين – رضي الله عنهم – أجمعين.

অর্থাৎ তাকে উত্তর দেয়া হবে যে, যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মানুষকে কুরআন শরীফের সাত ক্বিরাত থেকে এক ক্বিরাত পাঠের উপর বাধ্য করেছিলেন, কারণ যখন তারা দেখলেন যে, এরই মাঝে মুসলমানদের পূর্ণ সফলতা নিহিত আছে এবং মুসলমানদেরকে যদি বিভিন্ন ক্বিরাতে কুরআন পাঠের অনুমতি দেয়া হয়, তবে তারা মহা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হবে, তেমনিভাবে শরীয়তের মাসআলা-মাসাইল ও হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যদি সুনির্দিষ্ট কিছু উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের উপর মানুষকে একত্র না করা হয়, তবে সেটি দ্বীনের ধ্বংস বয়ে আনবে । নিরেট নির্বোধ-মূর্খরাও নিজেদেরকে বড় বড় মুজতাহিদ ইমামের আসনে সমাসীন করবে । এবং নিজের মনগড়া বক্তব্যকে পূর্ববর্তীদের কিছু পরিত্যাজ্য বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দ্বীনের বিকৃতির পথে অগ্রসর হবে । যেমন কোন কোন যাহেরী আলেম করেছেন । অথচ সে সমস্ত মাসআলায় পূর্ববর্তীদের অনুসরণ না করার ব্যাপারে উম্মত একমত হয়েছে ।[৩৩] সুতরাং মুসলিম উম্মাহের কল্যাণ আলাহ্‌র ফয়সালাকৃত এ চার মাযহাবের অনুসরণের মাঝেই নিহিত আছে”
[আর-রাদ্দু আলা মান ইত্তাবা গাইরাল মাযাহিবিল আরবায়া, পৃষ্ঠা-১০]

চার মাযহাবের কোন একটিকে অনুসরণ করতে বাধ্য করার মূল কারণ হল, ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা । কেননা যদি প্রত্যেককেই নিজের মতানুযায়ী মাসআলা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়, তবে প্রত্যেকেই নিজের সুবিধা

---

৩৩ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আলাম্মা ইবনে হাযাম যাহেরী, দাউদে যাহেরী । ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) গান-বাদ্যকে বৈধ বলতেন । এধরণের অসংখ্য মাসআলা তারা দিয়েছেন যেগুলো কোনভাবেই আমলযোগ্য নয় ।

অনুযায়ী মাসআলা তৈরি করবে। আর এভাবে ইসলামের মূল অস্তিত্বকেই ধ্বংস করে ফেলবে।

যেমন ধরুন! ডাঃ জাকির নায়েকের প্রয়োজন হয়েছে, তিনি টি.ভি চ্যানেলের জন্য যাকাত নেয়াকে বৈধ করেছেন। এবং তিনি এমন অনেক মাসআলা দিয়েছেন, যা কোনভাবেই আমলযোগ্য নয়। আরেকজন ব্যাবসায়ী তার প্রয়োজন অনুযায়ী সুদকে হালাল করার চেষ্টা করবে। কোন মিউজিশিয়ান চেষ্টা করবে, তার প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে গান-বাদ্যকে হালাল করা যায়। নেশাখোর চেষ্টা করবে, কিভাবে কুরআন ও হাদীসকে তার অনুগামী বানিয়ে নেশা জাতীয় দ্রব্য হালাল করা যায়। এভাবে ইসলাম আর ইসলাম থাকবে না। ইসলাম তখন স্বেচ্ছাচারীদের খেলনায় পরিণত হবে। ইচ্ছা হলে তা নিয়ে খেলবে, আবার মন চাইলে ছুঁড়ে ফেলবে।

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী সাহেব (দাঃ বাঃ) লিখেছেন,

"যদি দলিল প্রমাণকে চিন্তা ও গবেষণার অনুগামী বানিয়ে কর্মপন্থা নিরূপণ করা হয়, তাহলে কুরআনে কারীম দ্বারাই খ্রিষ্টধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হবে। তেমনিভাবে ইহুদী, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ কোনটিই আর অপ্রমাণিত থাকবে না। অবশেষে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, পারভেজ সাহেব তার গন্থ 'ইবলিস ও আদম' এর মধ্যে ডারউইনের মতবাদকেও কুরআনের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এ পদ্ধতি অনুসরণ করেই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দামেস্ক দ্বারা কাদিয়ান উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর যে হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) 'বাবে লুদ' নামক স্থানে দাজ্জালকে হত্যা করবে- সেখান থেকে দলীল নিয়ে মির্জা কাদিয়ানী ঈসা (আঃ) হওয়ার দাবী করে বলেছেন, এখানে 'লুদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, 'লুদিয়ানা' আর এর দরজা হচ্ছে কাদিয়ান।"[৩৪]

সুতরাং প্রবৃত্তিপূজারী, স্বেচ্ছাচারী, সুবিধা ভোগীদের বিকৃতির হাত থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্যই উলামায়ে কেরাম চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

---

[৩৪] আসরে হাযের মে ইসলাম কেইসে নাফেয হো, আলাম্মা মুফতী তাকী উসমানী, (অনুবাদ, আধুনিক যুগে ইসলাম, পৃষ্ঠা-১৪২

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর ঘটনাঃ

আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) "মুসাওয়াদা" নামক কিতাবে এবং আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) "ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন" নামক কিতাবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই-

"একদা একব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করল, কেউ যদি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে সে কি ফকীহ হতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন, যদি দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, না। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, যদি সে তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে?

তিনি বললেন, না। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, কেউ যদি চার লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফকীহ হতে পারবে? অতঃপর তিনি হাত নাড়ালেন। অর্থাৎ এখন হয়ত সে ফকীহ হতে পারবে।

অতঃপর আলামা ইবনে তাইমিয়া এবং আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) ইবনে শাকেলা (রহঃ) এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন,
তিনি বলেন,
"একদা আমি জামে মানসুরে ফতোয়া দেয়ার জন্য বসেছিলাম এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, "তুমি নিজেই তো এ পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করোনি, অথচ তুমি ফতোয়া দিচ্ছো?

আমি তাকে বললাম, আলাহ পাক তোমাকে মাফ করুন! যদিও আমি নিজে এ পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করিনি, কিন্তু যে এ পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করেছে, তার কথা অনুযায়ী ফতোয়া দিচ্ছি। তিনি এ পরিমাণ বা তারচেয়ে বেশি হাদীস মুখস্থ করেছেন।"

অর্থাৎ তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর কথা অনুযায়ী ফতোয়া দিচ্ছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মুসনাদে আহমাদ রচনা করেছেন।[৩৫]

---

[৩৫] আল-মুসাওয়াদা, পৃষ্ঠা-৫১৬, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫

এ ঘটনা থেকে কোন বিবেকবান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ফিকহ শাস্ত্রে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসরণ ব্যতীত বর্তমান যুগে কারও জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা এমন একটি সময়ে এসে উপনীত হয়েছি, যে সম্পর্কে মালেক বিন নবী (রহঃ) উক্তি প্রণিধানযোগ্য- তিনি বলেন,

والحقيقة أنَّنا قبل خمسين عاماً كنَّا نعرف مرضاً واحداً يمكن علاجه ، هو الجهل والأميَّة ، ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصياً هو(التعالم). وإن شئت فقل: الحرفيَّة في التعلُّم ؛ والصعوبة كلَّ الصعوبة في مداواته

"আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্বে একটি রোগ সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যার প্রতিকার করাও সম্ভব ছিল; সেটি হল, অজ্ঞতা ও মূর্খতা। কিন্তু বর্তমানে আমরা এক নতুন দুরারোগ্য ব্যধির মুখোমুখি হয়েছি, সেটি হল, স্বশিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা, যাকে পেশাদার শিক্ষাও বলা যেতে পারে। এধরণের ব্যধির প্রতিবিধান অসম্ভব। (শুরুতুন নাহজা, পৃষ্ঠা-৯১)

ডাক্তার জাকির নায়েক একজন প্রফেশনাল ডাক্তার। তিনি নিজেও জানেন, কারও মায়ের যদি হার্টে কোন সমস্যা থাকে, তবে সে কার নিকট যাবে। এ প্রসঙ্গে ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-

For example: your mother has the heart problem, what will you do, who will go to? You won't go to Tom, Dick and Harry. You will go to a heart specialist, you do research. MBBS? No-no-no. MD? MD in what? MD in brain? No-no-no. In heart? Yes. Before going to a doctor you do research. You check up what is his degree. MBBS? No-no-no. MD? Ha, Yes! MD in what? Gynaecology? No-no-no. Kidney? No-no-no. Brain? No-no-no. Cardiology? Ha, yes! DM, super speciality . . .

"যদি তোমার মায়ের হার্টে কোন সমস্যা থাকে, তবে তুমি কী করবে? কার নিকট যাবে? তুমি টম, ডিক ও হ্যারি যে কারও নিকট যেতে পার না। তোমাকে একজন হার্ট স্পেশালিস্ট এর নিকট যেতে হবে। তোমাকে গবেষণা করতে হবে। তোমাকে চেক করে দেখতে হবে, তার ডিগ্রি কী। এম.বি.বি.এস? না-না-না। এম.ডি?

ইয়েস! কীসে এম.ডি? গাইনাকলোজি? না-না-না। এম.ডি ইন ব্রেইন? না-না-না। কার্ডিওলজি? হ্যাঁ, ইয়েস! ডি.এম. সুপার স্পেশালিস্ট . . .[৩৬]

ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স তথা ফিকহ্ শাস্ত্রে সুপার স্পেশালিস্ট কারা?
মুসলিম উম্মাহের সকলেই একমত যে, ফিকহ শাস্ত্রে চার ইমাম হলেন, সুপার স্পেশালিস্ট।

কেউ যদি কোন্ ডাক্তার সুপার স্পেশালিস্ট এবং কোন ডাক্তার গ্রামীণ- হাতুড়ে, সেটা পার্থক্য করতে না পারে, তবে তার জন্য উচিৎ হল, যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের শরণাপন্ন হওয়া। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে চুপ থাকা। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারকে সুপার-স্পেশালিস্ট এবং সুপার স্পেশালিস্টকে হাতুড়ে মনে করাটা মহা অন্যায়।

এ সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজালী (রহঃ) বলেছেন-

لو سكت من لا يعرف قلَّ الاختلاف ، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمَّة والاطِّلاع عليه فماله وللتكلُّم

فيما لا يدريه ، والدخول فيما لا يعنيه ، وحق مثل هذا أن يلزم السكوت

“অজ্ঞ লোকেরা যদি চুপ থাকত, তবে মতানৈক্য কমে যেত। মুসলিম উম্মাহের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য বুঝতে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে যার হাত খাটো, যার দৃষ্টি সংকীর্ণ, সে ব্যক্তি এবং যে না জেনে কথা বলে, আর যে অনর্থক বিষয়ে মাথা ঘামায়, এদের মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? (অর্থাৎ এদের কারও জন্য এধরণের কাজে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়, বরং) এদের জন্য আবশ্যক হল, এরা যেন চুপ থাকে”[৩৭]
[আল-হাওয়ী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৬]

---

[৩৬] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/
[৩৭] 116/2الحاوي للفتاوى].[

শুধু চার মাযহাব মানব কেন?

Wvt RvwKi bv‡qK e‡j‡Qb-

The Islamic world has produced several learned Islamic scholars (Imams), but out of these, four became more famous and their teachings spread in different parts of the world.

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki. There is no proof whatsoever in the Qur'an or any authentic Hadith that a Muslim should only follow one of these four Imams.

বিশ্ব অনেক বিজ্ঞ ইসলামিক স্কোলার বা ইমামদের জন্ম দিয়েছে এবং তাঁদের মাঝে চারজন বিখ্যাত হয়েছেন এবং তাঁদের শিক্ষা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন মুসলমানের জন্য এ চার মাযহাব অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, এগুলোর কোন একটিকে অনুসরণ করতে হবে।

অথচ কুরআন ও 'সহীহ' হাদীসের কোথাও নেই যে, চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করা উচিৎ"[৩৮]

এটি সর্বজনবিদিত যে, সাহাবী, তাবেয়ী, এবং তাবে তাবেয়ী এর যুগে মুসলিম বিশ্বে অনেক বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিসীন ছিলেন। যাদের এক এক জনই পৃথক পৃথক মাযহাবের ইমাম হওয়ার যোগ্য ছিলেন। মূলতঃ ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, এ তিন যুগে ইসলামের বিজয় ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে চরম উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অতুলনীয় উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ইসলামী আইন শাস্ত্র তথা ফিকহ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সার কথা হল, মুসলিম বিশ্বে যেমন চার ইমাম প্রসিদ্ধ, তেমনিভাবে অনেক ইমাম তাদের যুগে কিংবা তাদের পরবর্তী যুগে বর্তমান ছিলেন। তাহলে মুসলিম উম্মাহ কেন এ চার ইমামের

---

[৩৮]http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199

কথাগুলোই গ্রহণ করল এবং অন্যান্য ইমামদের কথা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল? অর্থাৎ আমরা শুধু চার ইমামকেই মানব কেন?”

আলামা কারাফী (রহঃ) বলেন,

إن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأن مذاهبهم إنتشرت، و إنبسطت حتي ظهر فيها تقييد مطلقها و تخصيص عامها و شروط فروعها، فإذا أطلقوا حكما في موضع وجد مكملا في موضع آخر، و أما غيرهم فتنقل عنه الفتاوي مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا، لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده علي غير ثقة بخلاف هؤلاء الأربعة.

“কেবল চার মাযহাবের কোন একটির মাঝেই তাকলীদ সীমাবদ্ধ থাকবে। চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কারও অনুসরণ বৈধ নয়। কেননা, চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলো এত ব্যাপক হয়েছে যে, এর সাধারণ বিষয় সমূহকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, আম (ব্যাপক) বিষয় সমূহকে খাস (সুনির্দিষ্ট) করা হয়েছে। এবং এর শাখাগত মাসআলা-মাসাইলকেও সুনির্ধারিত করা হয়েছে। কোন স্থানে যদি কোন একটি মাসআলা সাধারণ থাকে, তবে অন্য স্থানে বিষয়টির পরিপূরক বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে কেবল তাদের ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা থেকে যায়, হয়ত ফতোয়াটির কোন পরিপূরক, নির্দিষ্টকারক অথবা কোন নির্ধারক রয়েছে, যদি তার অন্যান্য বক্তব্যসমূহকে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হত, তবে তা স্পষ্ট হত। অতএব, এ ধরণের তাকলীদ বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থেকে যায়; কিন্তু চার মাযহাব এর ব্যতিক্রম।
[মাওয়াহিবুল জালিল,১/৩০]

আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) লিখেছেন-

قد نبهنا علي علة المنع من ذلك-أي من تقليد غير الأئمة الأربعة-و هو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر و لم تنضبط فرب ما نسب إليهم ما لم يقوله أو فهم عنهم ما لم يريدوه و ليس لمذاهبهم من يذب عنها و ينبه علي ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة

“চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব অনুসরণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তার কারণ হল, চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অনেক সময় তাদের দিকে এমন

বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়, যা তারা বলেনি, তাদের পক্ষ থেকে এমন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়, যা তারা উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি। আর তাদের মাযহাব সমূহ সংরক্ষণ এবং তাতে কোন ভুল-ত্রুটি হলে, তা সংশোধন করার কেউ অবশিষ্ট নেই; কিন্তু চার মাযহাব এর ব্যতিক্রম।
[আর রাদ্দু আলা মান ইত্তাবা গাইরাল মাযাহিবিল আরবা', পৃষ্ঠা-৩৪]

- আলামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন-

إنه يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدونا محفوظا الشروط و المعتبرات؛ فقول الأمام السبكي: إن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول علي ما لم يحفظ، ولم تعرف شروطه، و سائر معتبراته من المذاهب التي إنقطع حملتها و فقدت كتبها كمذهب الثوري و الأوزاعي و إبن أبي ليلي، و غيرهم

"চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব অনুসরণের জন্য শর্ত হল, তাদের মাযহাব সমূহ লিপিবদ্ধ থাকা এবং মাযহাবের শর্তসমূহ ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা সংরক্ষিত থাকা। আলামা সুবকি (রহঃ) যে বলেছেন, "চার মাযহাবের বিরোধীতার অর্থ হল, ইজমার বিরোধীতা করা" এ বক্তব্য সেসমস্ত মাযহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো সংরক্ষিত নয়, যার শর্তসমূহ এবং অন্যান্য নীতিমালা অজানা। এ সমস্ত মাযহাবের কোন অনুসারী বর্তমানে অবশিষ্ট নেই এবং তাদের মাযহাবের উপর লিখিত কোন কিতাবও পাওয়া যায় না। যেমন সুফিয়ান সাউরী (রহঃ), ইমাম আওযায়ী (রহঃ) ও ইবনে আবী লাইলা (রহঃ) সহ অন্যদের মাযহাব।
[বুলুগুস সুল, পৃষ্ঠা-১৮]

সুন্নি তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হল, পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম জামাত। আর চার মাযহাব হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত। আলামা বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) লিখেছেন-

مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم من أهل السنة و الجماعة

"চার মাযহাব এবং অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব আহলে সুন্নত ওয়ালজামাতের অন্ত র্ভূক্ত।"
[উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৩]

- শায়খ আব্দুল গণী নাবুলুসী (রহঃ) লিখেছেন,

و أما تقليد مذهب من مذاهب الآن غير المذاهب الأربعة، فلا يجوز لا لنقصان في مذاهبهم ، ورجحان المذاهب الأربعة عليهم، لأن فيهم الخلفاء المفضلين علي جميع الأئمة، بل لعدم تدوين مذاهبهم و عدم معرفتنا الآن بشروطها و قيودها و عدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر، حتي لو وصل إلينا شيء من ذلك كذلك جاز لنا تقليده، لكنه لم يصل كذلك

“চার মাযহাব ব্যতীত বর্তমানে অন্য কোন মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয়; অন্য কোন মাযহাবে ত্রুটি থাকা কিংবা চার মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে নয়। কেননা অন্যদের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণ রয়েছেন, যারা সমস্ত ইমামের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বরং অন্য কোন মাযহাব আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার মূল কারণ হল, তাদের মাযহাব আমাদের নিকট সুবিন্যস্ত অবস্থায় পৌঁছেনি। তারা কোন্ কোন্ মূলনীতি (উসূল) এবং কোন্ কোন্ শর্তের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করেছেন, তা আমাদের অজানা। এবং তা আমাদের নিকট “তাওয়াতুরের” পদ্ধতিতে পৌঁছেনি। আমাদের নিকট যদি এভাবে তাদের কোন মাসআলা পৌঁছয়, তাহলে অবশ্যই তাদের অনুসরণ আমাদের জন্য বৈধ। কিন্তু মূলনীতিসহ আমাদের নিকট তাদের মাসআলা পৌঁছেনি।
[খোলাসাতুত তাহকীক ফি বায়ানি হুকমিত তাকলীদ ওয়াত তালফীক, পৃষ্ঠা, ৬৮-৬৯]

আব্দুল গণী নাবুলুসী (রহঃ) এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, চার মাযহাব অনুসরণের অন্যতম কারণ হল, চার মাযহাবের মূলনীতি সমূহ ও শাখাগত মাসআলা-মাসাইলগুলো সুবিন্যস্ত অবস্থায় বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। কিন্তু অন্য কোন মাযহাবের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এছাড়াও চার মাযহাব অনুসরণের আরও কয়েকটি উলেখযোগ্য কারণ হল-

১. প্রত্যেক মাযহাবের জন্য মূলনীতি থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ ফিকহের কোন মাসআলার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হল, মাসআলাটি কোন্ উসূলের আলোকে রচিত। কোন মত বা মাযহাবের সঠিকতার মাপকাঠি ঐ মাযহাবের মূলনীতি বা উসুলে ফিকহ। যে মাযহাবের উসুলে ফিকহ যত শক্তিশালী সে মাযহাবের অনুসরণ ততটা গ্রহণযোগ্য।

২. চার মাযহাবে একজন মুমিনের জন্ম থেকে কবরের দাফন-কাফন সহ পরবর্তী যত মাসআলা আছে, সংশিষ্ট সকল মাসআলার সমাধান রয়েছে। প্রত্যেকটি মাসআলা আলাদা অধ্যায়ে, সুনির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে সুশৃংখলভাবে সাজানো রয়েছে। একজন মুমিনের জীবন পরিচালনায় ইবাদত, মুয়ালামাত, মুয়াশারাত ও আখলাকিয়াত এক কথায় সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা এ চার মাযহাবের প্রত্যেকটিতে রয়েছে। অন্য কোন মাযহাবে যা পাওয়া সম্ভব নয়।

৩. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যক্তি কেন্দ্রিক, অপরদিকে তা সমাজ ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। ব্যক্তি জীবনে কারও পক্ষে আস্তে কিংবা জোরে আমীন বলা সম্ভব হলেও রাষ্ট্র কিংবা সমাজ ব্যবস্থা কখনও দোদুল্যমান বিধানের উপর টিকে থাকে না। যেমন, বিচারক যদি কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তা যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে হয়ে থাকে, তবে অন্য কোন আলেম গিয়ে তার ভুল ধরে বিচার ব্যবস্থা নড়বড়ে করার সুযোগ পাবেন না এবং একই মাসআলায় ত্রিমুখী সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না। বিচারের ফয়সালা বা রায় একটিই হয়ে থাকে। এজন্য ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ন্যুনতম ধারণা আছে, তারা অবশ্যই জানেন যে, পৃথিবীতে এক এক অঞ্চলের বিচার ব্যবস্থা চার মাযহাবের কোন একটির আলোকে পরিচালিত হত। এখানে যদি যেমন খুশি তেমন চলার সুযোগ দেয়া হত, তবে খুব সহজেই ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়ত। কেননা দোদুল্যমান বিষয়ের উপর কখনও রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকে থাকে না।

৪. চার মাযহাবে মূলতঃ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের উক্তি, সাহাবীদের আমল, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের উক্তি ও আমলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে বিষয়ে একমত (ইজমা) হয়েছেন, চার মাযহাব সেটিকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। একইভাবে সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের মাঝে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হলে চার মাযহাবেও দেখা যায় সেক্ষেত্রে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মূলতঃ যে সমস্ত বিষয়ে চার মাযহাবে মতানৈক্য হয়েছে, তার অধিকাংশ মতভেদ সাহাবায়ে কেরাম

(রাঃ) এর মাঝে ছিল। এখন যে সমস্ত আহলে হাদীস বা সালাফীগণ মাযহাবীদেরকে গালি দিয়ে থাকেন, তাদের এতটুকু বোঝা উচিৎ যে, এই গালিটা মূলতঃ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে দেয়া হল না, এটি স্বয়ং রাসূল (সঃ) কে অথবা কোন সাহাবী (রাঃ) কিংবা কোন তাবেয়ীকে দেয়া হল। কেননা চার ইমামের কোন ইমামই প্রমাণ ছাড়া কোন মাসআলা প্রণয়ন করতেন না। সেই প্রমাণটি যদি রাসূল (সঃ) এর কোন হাদীস হয়ে থাকে, তাহলে ইমামকে গালি দেয়ার অর্থ হল, স্বয়ং রাসূল (সঃ) কে গালি দেয়া। আর যদি প্রমাণটি কোন সাহাবী কিংবা কোন তাবেয়ীর বক্তব্য হয়, তাহলে ইমামকে গালি দেয়ার অর্থ হল, সাহাবী কিংবা তাবেয়ীকে গালি দেয়া।

৫. চার মাযহাব অনুসরণের আরেকটি উলেখযোগ্য কারণ হল, “আমলে মুতাওয়ারিছা” তথা রাসূল (সঃ) এর যুগ, তার পরবর্তী যুগ ও তার পরবর্তী যুগ থেকে যে বিধানটি মানুষের মাঝে সমাদৃত হয়ে এসেছে, যার উপর মানুষ আমল করে আসছে, চার ইমাম কুরআন ও সুন্নাহের পাশাপাশি এ আমলে মুতাওয়ারিছার প্রতি দৃষ্টি রেখেই মাসআলা প্রণয়ন করেছেন। ইসলামে আমলে মুতাওয়ারিছার গুরুত্ব অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেছেন-

خذوا من الرأي ما كان يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم

“অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মতের অনুরূপ মত তোমরা গ্রহণ করো, কেননা তারা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন”[৩৯]

আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেছেন,

أما الأئمة و فقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث إذا كان معمولا به عند الصحابة و من بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق علي تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه علي علم أنه لا يعمل به

“ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোন একটি হাদীস সহীহ হলে তার উপর তখনই আমল করেন, যখন কোন সাহাবী, তাবেয়ী, অথবা তাদের নির্দিষ্ট

---

[৩৯] (ফাযলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ, পৃষ্ঠা-৯)

কোন একটি দল তার উপর আমল করে। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে হাদীসের উপর আমল না করার উপর একমত হয়েছেন, তার উপর আমল করা জায়েয নেই, কেননা তার উপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তারা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন।"[৪০]

আলামা ইবনু আব্দিল বার (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি" তে ইমাম মালেক (রহঃ) এর একটি ঘটনা উলেখ করেছেন-
"ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, খলিফা আবু জা'ফর মানসুর যখন হজ্ব সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, আমি সেগুলোর উত্তর প্রদান করলাম। খলিফা আবু জা'ফর মানসুর বললেন-

فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَزَمْتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبِكَ هَذِهِ الَّتِي وَضَعْتَهَا – يَعْنِي الْمُوَطَّأَ – فَيُنْسَخُ نُسَخًا ثُمَّ أَبْعَثُ إِلَى كُلِّ مِصْرٍ مِن أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنهَا نُسْخَةً وَآمُرُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا لَا يَتَعَدَّوْنَ إِلَى غَيْرِهِ , وَيَدَعُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِن هَذَا الْعِلْمِ الْمُحْدَثِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْلَ الْعِلْمِ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ،

"আমি সংকল্প করেছি, আপনার লিখিত এই কিতাব অর্থাৎ মুয়াত্তার অনেকগুলো অনুলিপি তৈরি করার নির্দেশ দিব, তারপর মুসলমানদের প্রতিটি শহরে একটি করে অনুলিপি পাঠিয়ে দেব। আমি তাদেরকে আদেশ করব যে, তারা যেন এ কিতাবে যা সংকলন করা হয়েছে, শুধু তার উপরই আমল করে এবং অন্য কোন কিছু গ্রহণ না করে। এবং এ কিতাবের ইলম ব্যতীত অন্য কোন ইলম গ্রহণ না করে। কেননা আমি দেখেছি, ইলমের মূল হল, মদীনাবাসীর বর্ণনা ও তাদের ইলম।"

খলিফা আবু জা'ফর মানসুরের এ কথা শুনে ইমাম মালেক তাঁকে বললেন,

فَقُلْتُ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيلُ وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – وَغَيْرَهُمْ ، وَإِنَّ رَدَّهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدٌ ، فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ كُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ لِأَنْفُسِهِمْ ، فَقَالَ : لَعَمْرِي لَوْ طَاوَعْتَنِي عَلَى ذَلِكَ لَأَمَرْتُ بِهِ"

---

[৪০] প্রাগুক্ত

"আমিরুল মুমিনীন! আপনি এটি করবেন না! কেননা মানুষের নিকট পূর্বেই অনেক মতামত পৌঁছেছে, তারা অসংখ্য হাদীস শ্রবণ করেছে, এবং অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছে। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট যে ইলম পৌঁছেছে, তারা তা গ্রহণ করেছে এবং তার উপর আমল করে এসেছে। এবং সাহাবা (রাঃ) ও অন্যান্যদের মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলিকে তারা তাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে বিরত রাখা কঠিন। অতএব, মানুষকে আপনি তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন এবং প্রত্যেক শহরের অধিবাসীরা যা গ্রহণ করেছে তার উপর তাদেরকে থাকতে দিন।"

খলিফা বললেন, "আমার জীবনের শপথ! তুমি যদি আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে তবে আমি অবশ্যই তার নির্দেশ দিতাম" (অর্থাৎ "মুয়াত্তা" নামক কিতাবের উপর আমল করতে বাধ্য করতাম)[৪১]

"আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহী" নামক গ্রন্থে রয়েছে-একদা ঈসা ইবনে হারুন (রহঃ) আব্বাসীয় খলিফা মামুনের নিকট একটি কিতাব নিয়ে এলো, যাতে বেশ কিছু হাদীস লিখা ছিল। তিনি এসে বললেন,

هذه الأحاديث سمعتها معك من المشايخ الذين كان الرشيد يختارهم لك، و قد صارت غاشية مجلسك الذين يخالفون هذه الأحاديث–يريد أصحاب أبي حنيفة–فإن كان ما هؤلاء علي الحق: فقد كان الرشيد فيما يختار لك علي الخطأ، وإن كان الرشيد علي الصواب: فينبغي لك أن تنفي عنك أصحاب الخطأ.

"অর্থাৎ এই হাদীসগুলো আমি আপনার সাথে সেসমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট থেকে শুনেছি, যাদেরকে হারুনুর রশিদ আপনার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। অথচ আপনার সভাসদবর্গ এ সমস্ত হাদীসের বিরোধীতা করে। (এর দ্বারা তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন) এখন এরা যদি সঠিক হয়, তবে খলিফা হারুনুর রশিদ আপনার জন্য যে সমস্ত মুহাদ্দিস নির্বাচিত করেছিলেন, তারা ভুল সাব্যস্ত হবে। আর যদি খলিফা হারুনুর রশিদ কর্তৃক নির্বাচিত মুহাদ্দিসগণ সত্যের উপর থাকে, তবে এদেরকে আপনার দরবার থেকে বের করে দেয়া উচিৎ"

অতঃপর বাদশাহ মামুন কিতাবটি তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করে বললেন,

لعل للقوم حجة و أنا سائلهم عن ذلك.

"হয়ত তাদের নিকট কোন শক্তিশালী দলিল রয়েছে, এ সম্পর্কে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব"

---

[৪১] (1) – جامع بيان العلم : (622) وابن سعد (6606) وغيرهما وهي صحيحة

অতঃপর তিনি ঈসা ইবনে হারুন (রহঃ) প্রদত্ত কিতাবটি একের পর এক তিন ব্যক্তিকে দিলেন। কেউ তাকে সন্তুষ্টজনক উত্তর দিতে পারল না।

সংবাদটি ঈসা ইবনে আবান (রহঃ) এর কাছে পৌঁছল। তিনি ইতোপূর্বে খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে আসতেন না। এ ঘটনা শুনে তিনি "আল-হুজ্জাতুস সগির" নামে একটি কিতাব রচনা করেন, যাতে তিনি হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস কিভাবে বর্ণিত হয় এবং কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং কোন হাদীস পরিত্যাজ্য, পারস্পরিক বিরোধী হাদীসের মুখোমুখি হলে আমাদের করণীয় কী এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তিনি উলেখ করেন, অতঃপর প্রত্যেক হাদীসের জন্য একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ তৈরি করেন এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাব, তার দলিল, এতদসম্পর্কিত হাদীস ও কিয়াস উলেখ করেন।

কিতাবটি খলিফা মামুনের হাতে পৌঁছলে তিনি কিতাবটি পাঠ করে বললেন,

هذا جواب القوم اللازم لهم.

"এটা তাদের পক্ষ থেকে সমুচিৎ জওয়াব।"

অতঃপর তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন–

حسدوا الفتي إذا لم ينالوا سعيه فالناس أعداء لها و خصوم

كضرائر الحسناء قلن لزوجها حسدا و بغيا: إنه لذميم

"লোকেরা সেই যুবকের মর্যাদা ও উচ্চাসন লাভ করতে না পেরে তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে যেমন নারীরা হিংসা ও বিদ্বেষ বশত তাদের সুন্দরী সতীনের মন্দচারিতা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে থাকে।"

এ চার মাযহাব সেই তিন যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেই তিন যুগ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেছেন,

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

সর্বোত্তম মানুষ হল, আমার যুগের মানুষ। অতঃপর পরবর্তীগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ [৪২]

---

[৪২] (সহীহ বোখারী, হাদীস নং 2509 ، 6065 ، 3451,6282 , সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৩)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডাক্তার জাকির নায়েক তাঁর "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন,

There is a Hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, Hadith number 2652, the prophet said: the best of the people are those of my time, means the companions, the Sahabas. After that the next generation. After that the next generation. The prophet said: the best people are those of my generation, the Sahabas. After that the next generation, the Tabieen, after that the next generation, Tabe-tabeen. Finish.

If you have to take anything, you have to take from the generation of the prophet, the companion, then the next generation Tabieen, and Tabe- tabieen. That's it. Three generation. These we call as the Salafe-Saleheen.

"সহীহ বোখারী ২৬৫২ নং হাদীসে আলাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ হল, আমার যুগের মানুষ অর্থাৎ রাসূল (সঃ) এর সাহাবীগণ । অতঃপর পরবর্তীগণ । অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ ।

রাসূল (সঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ হল, আমার যুগের মানুষ । অতঃপর তাদের পরবর্তী অর্থাৎ তাবেয়ীনগণ । অতঃপর তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেয়ীগণ । ব্যাস! যদি তোমার কিছু গ্রহণ করতে হয়, তবে তোমাকে রাসূলের (সঃ) এর সাহাবীদের থেকে কিংবা তাদের পরবর্তী তাবেয়ীনদের থেকে কিংবা তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেয়ীনদের থেকে গ্রহণ করতে হবে । এ তিন যুগের মানুষকে আমরা সালফে-সালেহীন (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বুযুর্গ) বলে থাকি"[৪৩]

ডাক্তার জাকির নায়েক বলেছেন, যদি তোমাকে কিছু গ্রহণ করতে হয়, তবে এ তিন যুগ থেকে গ্রহণ করতে হবে । আর এটা কারও অজানা নয় যে, চার মাযহাবই এ তিন যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বর্তমানে আমাদের সামনে যে সমস্ত মাযহাব বা মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন সালাফী মাযহাব কিংবা যাহেরী মাযহাব এদের কোনটিই চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাবের সমপর্যায়ের হওয়া তো দূরে থাক,

---

[৪৩] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

তাদের সাথে কোন দিক থেকে তুলনীয় হওয়ারও যোগ্য নয়। সুতরাং যে তিন যুগ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) এর নির্দেশনা রয়েছে, যাদের কথা গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে, বর্তমানের অযোগ্য কারও অনুসরণের চেয়ে তাদের কোন একজনকে অনুসরণ করাটাই যুক্তিযুক্ত।

তাকলীদের ভুল ব্যাখ্যা

ডাঃ জাকির নায়েক তাকলীদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন-

تقلید وہ کہتے ہے کہ آنکھ بند کر ما ننا

“চোখ বন্ধ করে অনুসরণকে তাকলীদ বলে।”[৪৪]

اگر وہ انسان جس کے بات مانتے هیں، اس کے خلاف ثبوت پیش کرتے هیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں، پھر بھی آپ اس کے بات مانتے هیں اسے کھتے ہے تقلید

“আপনি যাকে অনুসরণ করছেন তার বিরুদ্ধে যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ পেশ করা হয়, তারপরও যদি আপনি তাকে অনুসরণ করেন, তবে একে বলা হবে তাকলীদ।”[৪৫]

ডাঃ জাকির নায়েক তাঁর এ বক্তব্য বিশেষণ করতে গিয়ে বলেছেন-

مطلب ایک آدمی قرآن و حدیث میں اسکولر هیں اس نے فتوی دیا آپنے اس کے بات مان لی؛ ٹھیک ہے آپ تو عام آدمی ہے. قرآن میں ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " اس سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. آپ نے پوچھا اور اسکے بات مان لیا اسے تقلید نہی کھتے ہے لیکن د وسرا کھتا ہے : جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوی قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، پھربھی آپ... نہی- نہی وہ بڑا عالم ہے مے اس کے بات مانونگا. حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کے روشنی میں، پھر بھی آپ اس عالم کی بات مان لے اسے کھتے هیں تقلید

“উদ্দেশ্য হল, এক ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের উপর দক্ষ। তিনি কোন ফতোয়া প্রদান করার পর আপনি তার কথা গ্রহণ করলেন। ঠিক আছে! কেননা আপনি সাধারণ মানুষ। কুরআনে আছে, “যার নিকট ইলম আছে, তার নিকট জিজ্ঞাসা করো। আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তার কথা মেনে নিলেন, একে তাকলীদ বলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, যে আলেমের নিকট আপনি গিয়েছেন, তার ফতোয়া কুরআন ও সহীদের বিপরীত তবুও আপনি বললেন- না-না, তিনি বড় আলেম, আমি তাকে অনুসরণ করব, তবে এক্ষেত্রে কুরআন ও

---

[৪৪] http://www.youtube.com/watch?v=leuNHQR7POI

[৪৫] What is Taqleed _ Taqleed kia hai _ By Dr.Zakir Naik in Urdu – YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=leuNHQR7POI

হাদীসের আলোকে কারও বিপরীতে প্রমাণ পাওয়ার পর এবং তার ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে অনুসরণ করার নাম হল- তাকলীদ ।

ডাঃ জবাকির নায়েক "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন-

What's the meaning of Taqlid? Taqlid means… Following the opinion of the scholar dose not make you in the format of Taqlid, dose not make you Muqallid. If after showing proof that the scholar you are following is wrong and then you follow him. Yes, that makes you a Muqallid.

"তাকলীদের অর্থ কী? তাকলীদের অর্থ হল… কোন স্কোলারের বক্তব্য গ্রহণ করা আপনাকে মুকাল্লিদ বানাবে না । আপনি যাকে অনুসরণ করছেন তাকে ভুল প্রমাণিত করার পরও যদি আপনি তার অনুসরণ করেন তাহলে এটিই আপনাকে মুকাল্লিদ বানাবে"[৪৬]

ডাঃ জাকির নায়েক এখানে তাকলীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন পৃথিবীর কেউ তাকলীদের এধরণের সংজ্ঞা দেয়নি । কেননা কারও ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তার সে বিষয়টি অনুসরণ করা জায়েয নয় । চার ইমাম বা অন্য কোন মুজতাহিদ যদি ভুল করেন এবং সেটি যদি সুস্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হয়, তবে তার সে ভুল বিষয়টির উপর আমল করা অন্যদের জন্য জায়েয় নয় । এ ব্যাপারে সকলেই একমত । ইসলামে শরীয়তে ভুলের অনুসরণকে বৈধ বলা হবে এটি কল্পনা করাও অসম্ভব ।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ভুল "প্রমাণিত" হওয়া আবশ্যক । এখন যে কেউ তার মতের বিরুদ্ধে কোন মাসআলা পেল আর সাথে সাথে সে বলে দিল যে, এটি ভুল, কারও এধরণের কথা গ্রহণযোগ্য নয় । এ বিষয়টি বর্তমানে অধিকাংশ লা-মাযহাবীদের মাঝে দেখা যায়, তারা কোন একটি

[৪৬] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, (unity, part-3, 4.49), http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

মাসআলা তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলেই বলে দেয় যে, এটি ভুল। অমুক ইমাম এটি ভুল করেছেন। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ ভুলটি সংশিষ্ট আলেমের নয়, তার নিজের বুঝের ভুল। নিজের অজ্ঞতাকে সে আলেমের উপর চাপিয়ের দিচ্ছে।

বর্তমানে এ রোগটি এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, একে দুরারোগ্য ব্যধি বললে ভুল হবে না। শরীয়তের বিষয়ে সামান্য জ্ঞান রাখে না এমন ব্যক্তিরা দু'একটি বই পড়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় যে, ইসলামে অমুক অমুক ভুল আছে, বড় বড় ইমামগণ অমুক অমুক ভুল করেছেন। এগুলো সংশোধন করা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে এধরণের মূর্খ গবেষকদের অভাব নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কাজী জাহান মিয়া তার "আল কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ, সমকাল পর্ব-১ এ ইয়াজুজ মা'জুজ দ্বারা বর্তমান সময়ে গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকাকে উদ্দেশ্য নিতে গিয়ে ইয়াজুজ মা'জুজ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের সকল বর্ণনা অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"প্রচলিত ধারণায় ইয়াজুজ-মাজুজের পৃথিবীতে আগমন (মডেল)। **কোরআনের ব্যাখ্যাকরী ও হাদীস বেত্তাগণ একটি অতি প্রাকৃতিক উদ্ভট জীবের কল্পনা করেছেন যারা মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার প্রত্যয়ে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে। ধারণাটি মিথ্যা**। কোরআনের ভুল ব্যখ্যা কোরআনের ওপর কোন দায় সৃষ্টি করে না। দায়টি ব্যাখ্যাকারীদের-ই মাত্র।"[৪৭]

কুরআন ও হাদীসের সমস্ত প্রমাণকে মিথ্যা বলে নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত, ভ্রান্ত, মনগড়া একটা বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টা করাটাও কুরআন ও সুন্নাহের উপর কোন দায় সৃষ্টি করবে না, দায়টি কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকার কারীর উপরই বর্তায়। এভাবে নিজের অজ্ঞতা আর মূর্খতাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার যে দুরারোগ্য ব্যধি আামাদের সমাজের ছড়িয়ে পড়ছে, আলাহ পাক আমাদের সকলকে তা থেকে হিফাজত করুন।

বিজ্ঞ পাঠক! আমাদের আলোচনার বিষয় হল তাকলীদ। ডাঃ জাকির নায়েক এখানে তাকলীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এধরণের সংজ্ঞা পৃথিবীর কেউ

---

[৪৭] আল কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ, সমকাল পর্ব, পৃষ্ঠা-৬৬, মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।

দেয়নি। বরং এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সুস্পষ্টভাবে কারও ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর ভুল বিষয়ে অন্যের অনুসরণ করা জায়েয নয়।

তাকলীদের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অতএব এ থেকে স্পষ্ট হবে যে, ডাঃ জাকির নায়েক যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সেটি সুস্পষ্ট ভুল। আর এ ভুল মূলতঃ শরীয়তের বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান না থাকার কারণে যে সৃষ্টি হয়েছে, তা স্পষ্ট।

তাক্বলীদ আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ হল, কোন বস্তুকে গলায় পেঁচিয়ে রাখা। আর যে বস্তুকে গলায় পেঁচান হয়, তাকে "ক্বিলাদা" বলে।
ত্বাকলীদের পারিভাষিক অর্থঃ
তাক্বলীদের পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম একই ধরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে একটা সংজ্ঞার সাথে অন্য সংজ্ঞার কিছু তারতম্য রয়েছে। এখানে আমরা তাকলীদের তিনটি সংজ্ঞা বিশেষণ করব।

তাকলিদের প্রথম সংজ্ঞা

আলাম্মা আমাদী[৪৮] (রহঃ) তাক্বলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة[49]

অর্থাৎ আবশ্যক কোন দলিল ব্যতীত অন্যের কথার উপর আমল করা।
[[আল-ইহকাম, খ.৪, পৃষ্ঠা-২২১]
এখানে "আল-আমালু বিকওলিল গায়ের" (অন্যের কথা অনুযায়ী আমল) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তার কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

---

[৪৮]সাইফুদ্দিন আলী বিন আবী আলি বিন মুহাম্মাদ বিন সালেম তাগলাবী আল-আমাদী। প্রথম জীবনে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেন। তার উপাধি ছিল, সাইফুদ্দিন। মৃতঃ ৪ সফর, ৬৩১ হিজরী, ৮০ বছর বয়সে মারা যান। আলাম্মা আমাদী (রহঃ) এর জীবনী দেখতে দেখুন, ওফায়াতুল আ'য়ান, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-২৯৩-২৯৪ এবং ৪৩২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১২/৬-৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, হাফেজ যাহাবী (রহঃ), তাঁর বিখ্যাত কিতাব, আল-ইহ্কাম ফি উসুলিল আহকাম الإحكام في أُصول الأحكام , মুনতাহাস সাউল ফি ইলমিল উসুল منتهى السؤول في علم الأُصول, গায়াতুল মারাম ফি ইলমিল কালাম غاية المرام في علم الكلام

[৪৯] انظر الإحكام للآمدي جـ 4 ص 221

"কাওল" (কথা) দ্বারা অন্যের কথা ও কাজ দু'টিই অন্তর্ভূক্ত হবে। এটি আলামা তাফতাযানী (রহঃ) এর অভিমত।

এখানে "হুজ্জাত" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন দলিল যা গ্রহণ ও যার উপর আমল করা আবশ্যক। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা। অতএব এই শর্তের দ্বারা যে সমস্ত ক্ষেত্রে হুজ্জাত পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে তার অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না। যেমন-

১. আলাহর কথা অনুযায়ী আমল করা। কেননা এখানে আলাহর কথা অনুযায়ী আমল করার হুজ্জাত হল, সে সমস্ত দলিল যা আলাহর প্রতি, তাঁর রাসূল সমূহের প্রতি এবং তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশনা প্রদান করে। সুতরাং আলাহর কোন নির্দেশের উপর আমল করা তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়।
২. রাসূলের কথা অনুযায়ী আমল করা। এটিও তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এখানে "হুজ্জাত" হল, আলাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের কথা গ্রহণের কথা নির্দেশ দিয়েছেন।
৩. "মুসলিম উম্মাহের ইজমার উপর আমল করা।" এটি তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এদের ঐকমত্যের উপর আমলের নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহে রয়েছে।
৪. কাযীর জন্য সাক্ষীর কথা অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। এটি তাকলীদ নয়। কেননা সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সাক্ষীর কথা গ্রহণের নির্দেশ কুরআান ও সুন্নাহে রয়েছে। এবং এর উপর ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৫. মুফতীর ফতোয়ার উপর "সাধারণ মানুষের" আমল। এটিও তাকলীদের অন্ত র্ভূক্ত নয়। কেননা এবিষয়ে শরীয়তের "হুজ্জত" রয়েছে। আর তা হল, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের "ইজমা" সংগঠিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ প্রয়োজন হলে মাসআলার জন্য ফতোয়া প্রদানকারীর শরণাপন্ন হবে। এবং মুফতীর ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা তার উপর আবশ্যক হবে। এখানে

হুজ্জত হল, মুসলিম উম্মাাহের ইজমা । এছাড়াও কুরআন ও সুন্নাহে এ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে ।

৬. হাদীস বর্ণনা কারীর (রাবী) নিকট থেকে "আমল যোগ্য" কোন হাদীস গ্রহণ করে তার উপর আমল করলে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না । কেননা এখানে "হুজ্জত" হল, আলাহর রাসূল আদেশ করেছেন, "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও ।" এবং উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দাও ।
৭. কোন সাহাবীর এমন বক্তব্য যার সাথে অন্যান্য সাহাবীগণ বিরোধিতা করেননি, তার উপর আমল করাও তাকলীদ নয় । কেননা এ ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জত রয়েছে ।

একই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, আলামা ইবনে আব্দুশ শুকুর "মুসালামুস সুবুত" নামক কিতাবে । আলামা ইয্দুদ্দিন শরহে মুখতাসারে ইবনে হাজেবে এধরণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ।[৫০]
আলামা ইবনে হাজেব (রহঃ)[৫১] তাক্বলীদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন-

" العمل بقول غيرك من غير حجة "[52]

"অর্থাৎ আবশ্যক দলিল বিহীন অন্যের কথা অনুযায়ী আমল করা"
[শরহে মুসালামুস সুবুত, খ.২, পৃষ্ঠা-৪০০]

---

[৫০] انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت جـ 2 ص 400 .

[৫১] আবু আমর উসমান বিন উমর বিন আবু বকর বিন ইউনুস (৫৭০হিঃ-৬৪৬হিঃ) । তিনি ইবনে হাজেব নামে বিখ্যাত । মালেকী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন । বিখ্যাত আবরী ব্যাকরণবিদ (النحوي) ছিলেন । তিনি বিভিন্ন শাখায় বিখ্যাত অনেক কিতাব রচনা করেছেন-কিতাবুল জামে' বাইনাল উম্মাহাতি ফিল ফিক্হ (كتاب الجامع بين الأمهات في الفقه), কাফিয়াতু যাবিল আরব ফি মা'রেফাতি কালামিল আ'রাব (كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب) এটি কাফিয়া নামে বিখ্যাত । মুনতাহাস সুলি ওয়াল আমালি ফি ইলমাইল উসুলি ওয়াল জাদালি(منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل) । এজন্য দেখুন!
البداية والنهاية (১৭/৩০০- ৩০২)　　سير أعلام النبلاء (২৩/২৬৪-২৬৬)

[৫২] انظر شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب جـ 2 ص 305

১. ইমাম গাজালী (রহঃ) "মুসতাসফা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

" قبول قول بلا حجة[53] "

"হুজ্জত বিহীন কোন কথা গ্রহণ করা হল তাকলীদ"
[আল-মুসতাসফা, খ.২, পৃষ্ঠা-১২৩]

২. আলামা ইবনে কুদামা[৫৪] লিখেছেন,

" قبول قول الغير من غير حجة [55]"

"হুজ্জত ছাড়া অন্যের কথা গ্রহণ করা হল, তাকলীদ"
[রওযাতুন নাজের, পৃষ্ঠা-২০৫]

মৌলিক দিক থেকে এ সংজ্ঞাগুলো এবং পূর্বোক্ত আলামা সাইফুদ্দিন আ'মাদী (রহঃ) এর সংজ্ঞার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ।
এ সংজ্ঞা গুলো থেকে তাক্বলীদ সম্পর্কে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

১. শরীয়তের বিষয়ে "আমী" (যে মুজতাহিদ নয়), তারই সমশ্রেণীর আরেকজন "আমীর" কথা অনুযায়ী আমল করা ।
২. একজন মুজতাহিদ আলেম আরেকজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা; আমলকারী মুজতাহিদ এক্ষেত্রে ইজতেহাদ করুক বা না করুক ।
৩. মুজতাহিদ নয় এমন কোন ব্যক্তির কথা অনুযায়ী কোন মুজতাহিদ আমল করা ।

---

[৫৩] انظر المستصفى جـ 2 ص 123

[৫৪] মুয়াফফিক উদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন কুদামা(৫৪১হিঃ-৬২০হিঃ) । তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তাঁর সম্পর্কে আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, مادخل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ موفق (ইমাম আওযায়ীর পরে মুয়াফফিক (রহঃ) চেয়ে বড় ফকীহ শামে প্রবেশ করে নি) । তাঁর বিখ্যাত কিতাব হল, "আল-মুগনী"(المغني), (روضة الناظر وجنة المناظر.). এছাড়াও তাঁর লিখিত কিতাবের সংখ্যা ৩৬ ।

[৫৫] انظر روضة الناظر ص ২০৫

তাক্বলীদের দ্বিতীয় সংজ্ঞাঃ

আলামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহঃ)[৫৬] "জামউল জাওয়ামে' " নামক কিতাবে তাক্বলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

"أخذ القول من غير معرفة دليله"[57]

"অর্থাৎ দলিল সম্পর্কে অবগত না হয়ে অন্যের কথা গ্রহণ করা"
এখানে "অন্যের কথা গ্রহণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অন্যের কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তার উপর আমল করা ।"
[জামউল জাওয়ামে' খ.২, পৃষ্ঠা-৪৩২]

"দলিল সম্পর্কে অবগত না হয়ে" একথার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করতে গিয়ে জালাল আল-মাহালী "জামউল– জাওয়ামে" এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন.

"দলিল সম্পর্কে অবগত হওয়ার অর্থ হল, কিভাবে দলিল থেকে মাসআলা বের করা হয়, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া । এটি মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নয় । কেননা প্রথমতঃ দলিলটি দলিল হওয়ার জন্য তার প্রতিবন্ধক (عارض) বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি । আর দলিলের সব ধরণের ক্রুটি ও প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি আনুসঙ্গিক সমস্ত দলিল সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে সম্পর্কে গবেষণার উপর নির্ভর করে । আর এ ধরণের গবেষণা করা মুজতাহিদের কাজ । কেননা শরীয়তের বিষয়ে "আমী" (মূর্খ) ব্যক্তি সে স্তর পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না ।"

১. আলামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহঃ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন সাধারণ ব্যক্তি যদি কোন মুজতাহিদ আলেমের কথা গ্রহণ করে, তবে সেটা তাক্বলীদের অন্ত র্ভূক্ত হবে । কিন্তু আলামা আ'মাদী (রহঃ) যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য কোন মুজতাহিদের অনুসরণের বিষয়টি

---

[৫৬] আবু নসর তাজুদ্দিন আব্দুল ওহাব বিন আলী বিন আব্দুল কাফী (৭১৭হিঃ-৭৭১হিঃ) । তাজুদ্দিন সুবকি (রহঃ) শাইখুল ইসলাম ও কাযীউল কুযাত তকিউদ্দীন সুবকি (রহঃ) এর ছেলে । তিনি বিখ্যাত কিছু কিতাব রচনা করেছেন- আল-কাওয়াইদুল মুশতামিল আলাল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের (القواعد المشتملة على الأشباه والنظائر.), জামউল জাওয়ামে' (جمع الجوامع)

[৫৭] انظر جمع الجوامع وشرحه جـ 2 ص 432 .

তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না, বরং সাধারণ ব্যক্তি যদি কোন মুজতাহিদ পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছতে না পারে, তখন সে মাসআলার ক্ষেত্রে "মুফতীর" কাছ থেকে ফতোয়া নিবে। আর এ ধরণের ফতোয়া নেয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জাত আছে রয়েছে। সুতরাং আলামা আ'মাদীর নিকট এটি তাকলীদ নয়। কিন্তু আলামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহঃ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য কোন মুজতাহিদের অনুসরণ তাক্বলীদের অন্তর্ভূক্ত। কারণ সাধারণ মানুষ দলিল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে অক্ষম।

আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত উসুলের কিতাব "মুসাও ওয়াদা"[৫৮] তে লিখেছেন,

"القول بغير دليل"

"দলিল ছাড়া কোন কথা গ্রহণ করা"

২. শায়খ যাকারিয়া আনসারী "গায়াতুল উসূল" নামক কিতাবে লিখেছেন,

" أخذ قول الغير من غير معرفة دليله "[59]

৩. আবু বকর আশ-শাশী (রহঃ) লিখেছেন,

"قبول القائل، وأنت لا تدري من أين قاله"[60]

" তাকলীদ হল, অন্যের কথা গ্রহণ করা, অথচ সে কোথা থেকে বলেছে, তা তুমি জান না"

এ সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে আক্ষরিক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক দিক থেকে এগুলোর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

এসমস্ত সংজ্ঞা থেকে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত হবে-

---

[৫৮] উসূলে ফেকাহ সম্পর্কে এটি একটি বিখ্যাত কিতাব। এটি মূলত: "আ'লু তাইমিয়া" বা আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর পরিবারের তিনজন রচনা করেছে। আব্দুস সালাম (ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর দাদা), আব্দুল হালিম (ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর পিতা। আহমাদ বিন আব্দুল হালিম (শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া)। কিতাবটির পূর্ণ হলো-المسودة في أصول الفقه (আল-মুসাও ওয়াদা ফি উসুলিল ফিকহি)

[৫৯] انظر غاية الوصول ص 150

[৬০] انظر شرح الورقات للجلال المحلي ص 31

১. শরীয়তের বিষয়ে মুজতাহিদ নয় (আমী), এমন ব্যক্তির কথা আরেকজন "আমী" গ্রহণ করা ।
২. কোন মুজতাহীদ সংশিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতেহাদ না করে, অন্য একজন মুজতাহিদের ইজতেহাদের উপর আমল করা ।
৩. মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তি (আমী) কোন মুজতাহিদ আলেমের তাকলীদ করা ।
৪. কোন মুজতাহীদ কোন "আমীর" কথার উপর আমল করা ।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন মুজতাহিদ যদি অন্য মুজতাহিদের মতের সাথে তার দলিল সম্পর্কে অবগত তার কথা অনুসরণ করে, তবে সেটা তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না ।
আমরা তাকলীদের দ্বিতীয় যে সংজ্ঞা দিয়েছি, এ সংজ্ঞা থেকে এবিষয়টি স্পষ্ট হয় না যে, কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার কোন বিষয় গ্রহণ করা তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত কি না? প্রথম সংজ্ঞায় এ বিষয়গুলি এবং আরও কিছু বিষয়ের অনুসরণ তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না । আমরা তাকলীদের তৃতীয় আরেকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব, যেখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে ।

তাকলীদের তৃতীয় সংজ্ঞা

তাকলীদের তৃতীয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন, আলামা ইবনে হুমাম (রহঃ) তাঁর "তাহরীর" নামক গ্রন্থে । তিনি লিখেছেন,

" العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها "[61]

"অর্থাৎ তাকলীদ হল, দলিল বিহীন এমন ব্যক্তির কথার উপর আমল করা যার কথা 'শরীয়ত-স্বীকৃত কোন দলিলের অন্তর্ভূক্ত নয়"

এখানে "শরীয়ত স্বীকৃত 'হুজ্জত' বা দলিলের অন্তর্ভূক্ত নয়" এ কথার দ্বারা কুরআনের উপর আমল করা, রাসূলের সুন্নাহের উপর আমল করা এবং 'ইজমার' উপর আমল করার বিষয়টি তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত নয় । কারণ এগুলোর উপর

---

[৬১] انظر التحرير ص 547

আমলের ব্যাপারে শরীয়ত স্বীকৃত নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে, কাযী যখন সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেবে। এক্ষেত্রে সাক্ষীর কথা অনুযায়ী কাযীর ফয়সালা দেয়াটা তাকলীদ নয়। কেননা তার সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা রয়েছে। হাদীস বর্ণনা কারী রাবীর নিকট থেকে "আমলযোগ্য" হাদীস গ্রহণ করলে তার উপর আমল করাও তাকলীদ নয়। তেমনিভাবে কোন সাহাবীর মতামতের সাথে যদি অন্যান্য সাহাবীরা একমত হন এবং কেউ তার বিরোধীতা না করে, তবে তার কথা অনুসরণের করাটাও তাকলীদ নয়। কেননা এসমস্ত ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশনা রয়েছে।

কোন সাধারণ মানুষের জন্য মুফতীর ফতোয়ার উপর আমল করাটা তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত হবে কি না? কিছু কিছু আলেম মনে করেন, সাধারণ মানুষের জন্য মুফতীকে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে শরীয়তের 'হুজ্জত' রয়েছে, সুতরাং এটি তাকলীদ নয়। তবে ব্যাপকভাবে উলামায়ে কেরাম একে তাকলীদের অন্তর্ভূক্ত মনে করে থাকেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মুফতীর ফতোয়ার উপর নির্ভর করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে।

একই ধরণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, আলাম্মা শাওকানী[৬২] (রহঃ) তাঁর "ইরশাদুল ফুহুল" এ-

" رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة "[63]

"দলিল বিহীন এমন ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা, যার কথা গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের কোন হুজ্জত নেই।" সুতরাং ইতিপূর্বে কোন আলেম ডাঃ জাকির নায়েক যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, এধরণের সংজ্ঞা দেননি। এটি ডাঃ জাকির নায়েকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট একটি ভুল। আর এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখা উচিৎ যে, কারও ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর সে বিষয়ে তার অনুসরণ শরীয়তে বৈধ নয় এবং একে তাকলীদও বলা হয় না।

তাকলীদের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি মনে রাখা আবশ্যক-

---

[৬৩] . انظر إرشاد الفحول ص ২৬৫

১. দ্বীনের মৌলিক আক্বিদার ক্ষেত্রে অন্যের তাকলীদ করা বৈধ নয়।
২. অকাট্য, সুস্পষ্ট এবং মুতাওয়াতির বিষয়ের ক্ষেত্রেও অন্যের তাকলীদের কোন সুযোগ নেই।
৩. অকাট্য দলিল যদি এমন সুস্পষ্ট হয়, যার বিপরীত কোন দলিল নেই তবে সেক্ষেত্রেও তাকলীদের কোন সুযোগ নেই।
৪. যার তাকলীদ করা হয়, তাঁকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করা কিংবা তার সুস্পষ্ট ভুল বিষয়কে শুধু গোঁড়ামী বশতঃ আঁকড়ে থাকা শরীয়ত সম্মত নয়। ভুল যার থেকেই প্রমাণিত হোক, ভুল বিষয়ে তাকলীদ শরীয়তে বৈধ নয়।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহের অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য কিংবা একাধিক অর্থপূর্ণ বিষয়ে কাঙ্খিত অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রেই কেবল তাকলীদ স্বীকৃত। এক্ষেত্রে যারা মুজতাহিদ রয়েছেন, কেবল তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য এবং সর্বসাধারণ যারা মুজতাহিদ নয় তাদের কথা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় বরং সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক হল, এসমস্ত ক্ষেত্রে মুজতাহিদের তাকলীদ করবে।

যারা মুজতাহিদ নয়
তাদের জন্য তাকলীদ করা ওয়াজিব

দ্বীনের শাখাগত বিষয় (فروع الدين) ও ইজতেহাদী মাসআলা-মাসাইলের (مسائل الاجتهاد) ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ (যারা মুজতাহিদ নয়) এর জন্য আলেমদের অনুসরণ করা জরুরি।

যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য উলামাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাকলীদ (অনুসরণ) করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে, যারা মুজতাহিদ নয়, তাদেরকে সরাসরি কুরআন অনুসরণের অনুমতি দিলে তারা ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করবে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হালালকে হারাম বলবে, হারামকে হালাল বলবে। এ প্রসঙ্গে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীন, ফকীহ, উসুলবিদ, মুফাসসিরগণের বক্তব্য নিচে উপস্থাপন করা হল-

ইবনু আব্দিল বার (রহঃ) "জা'মিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি" নামক কিতাবে লিখেছেন,

"العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة"، ثم قال: "ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله – عز وجل – فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[64] ...وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره، ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك مَن لا علم له ولا بصر، بمعنى ما يدين به، لا بد من تقليد عالمه[65]

"সাধারণ মানুষের জন্য মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে, তখন তার জন্য আলেমদের অনুসরণ বা তাকলীদ জরুরি। কেননা সাধারণ মানুষের

---

[৬৪] سورة النحل آية : 43 –

[৬৫] انظر الجامع جـ 2 ص 140 .

নিকট দলিলের উৎস অস্পষ্ট থাকে। এবং মৌলিক বুঝ না থাকার কারণে সে দলিলের প্রকৃত উৎস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কেননা ইল্‌মের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখন সে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন না করার কারণে ইল্‌মের উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারবে না। আর প্রাথমিক জ্ঞান না থাকাটা সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক দলিল বের করার পথে একটি অন্তরায়। আলেমদের মাঝে এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, সাধারণ মানুষের জন্য তাদের নিকট বর্তমান আলেমদের অনুসরণ করা জরুরি। কেননা এদেরকেই উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জেনে থাক।" এ ব্যাপারে আলেমদে মাঝে "ইজমা" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অন্ধ ব্যক্তির জন্য কেবলার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে অন্য একজন দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নামায পড়তে হবে। তেমনি এমন লোক শরীয়তের বিষয়ে যার কোন জ্ঞান নেই, প্রাথমিক কোন বুঝ নেই, তার জন্য অভিজ্ঞ আলেমের অনুসরণ জরুরি"

[জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়াফাযলিহি, আলাম্মা ইবনু আব্দিল বার (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা-১৪০]

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ইমাম গাজালী (রহঃ) "মুসতাসফা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

" العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء "[66]

"সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করা, এবং তাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব"

[আল-মুসতাসফা, খ.২, পৃষ্ঠা-১২৪]

- যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ আলাম্মা ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন,

" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا"، ثم قال: "فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك "[67]

অর্থাৎ শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে তাকলীদ করার বৈধতার ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন, এজন্যই শাখাগত

---

[৬৬] انظر المستصفى جـ 2 ص 124

[৬৭] انظر الروضة ص 206

মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ। বরং সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করা ওয়াজিব”

- শ্রেষ্ঠ উসুলবিদ ও ফকীহ আলামা শাতবী (রহঃ) “আল-ই’তেসাম” নামক কিতাবে লিখেছেন,

" الثاني: أن يكون مقلِّدًا صرفًا خليًا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به[68]

“দ্বিতীয় শ্রেণী হল, যারা শুধু অন্যের অনুসরণ করবে। কেননা শরীয়তের বিষয়ে এদের জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। এবং এ ব্যাপারে এদের মৌলিক কোন জ্ঞান থাকে না। সুতরাং তার জন্য এমন পরিচালক প্রয়োজন যে তাকে পরিচালনা করবে, এমন বিচারক বা ফয়সালাকারী দরকার যে তার সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের সমাধান দিবে এবং এমন আলেমের প্রয়োজন যার সে অনুসরণ করবে।”
[আল-ই’তেসাম, খ.২, পৃষ্ঠা-৩৪৩]

- আলামা আ’মাদী (রহঃ) “আল-ইহকাম” নামক কিতাবে লিখেছেন,

" العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد –وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد– يلزمه اتباع قول المجتهدين، والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين "[69]

“সাধারণ কোন ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যার মধ্যে ইজতেহাদের কোন যোগ্যতা নেই, যদিও ইজতেহাদী বিষয়ক কিছু জ্ঞান সে অর্জন করেছে, তার জন্য অন্য মুজতাহিদের ইজতেহাদের অনুসরণ করা জরুরি। এবং তার ফতোয়া গ্রহণ করাও জরুরি। এটি মুহাক্কিক উসুলবিদদের অভিমত।”
[আল-ইহকাম, খ.৪, পৃষ্ঠা-২২৮]

- আলামা ইবনুল জাওযি (রহঃ) তার “তালবীসে-ইবলিস” নামক কিতাবে লিখেছেন,

---

[৬৮] انظر الاعتصام جـ2 ص 343

[৬৯] انظر الإحكام جـ 4 ص 228

" وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها، واعتاص على العامي عرفانها، وقرب لها أمر الخطأ فيها؛ كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سير ونظر "[70]

"যেহেতু শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, আর একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেগুলোর সঠিক সমাধান বের করা অসম্ভব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, ফলে সাধারণ মানুষের জন্য এসমস্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারীদের তাকলীদ করাটা অধিক কল্যাণকর"
[তালবীসে ইবলিস, পৃষ্ঠা-৭৯]

- শায়খ হামদ বিন নাসের বিন মা'মার তাঁর "রিসালাতুল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলিদি" নামক কিতাবে লিখেছেন,

" وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظّ ولا نصيب فرضه التقليد "

"সারকথা হল, সাধারণ ব্যক্তি যার শরীয়ত ইলম বলতে গেলে শূন্য, তার জন্য আবশ্যক হল, তাকলীদ করা"
তিনি আরও বলেন,

من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك "[71]

"সাধারণ মানুষ যাদের ফিকহ ও হাদীস সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই এবং যারা আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্যের ব্যাপারে অবগত নয়, তাদের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে তাকলীদ করা আবশ্যক। বরং অনেকের বক্তব্য হল, এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে "ইজমা" (চূড়ান্ত ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"

আল্লাহ তায়ালা সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতে বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

---

৭০ انظر تلبيس إبليس ص 79

৭১ انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، رسالة الاجتهاد والتقليد جـ2 ص 7 و ص 21 و ص 6 .

(যদি তোমরা না জান, তবে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করো)

প্রামাণিক দিকঃ কোন বিষয় না জানলে আল্লাহ তায়ালা যারা জানে তাদেরকে প্রশ্ন করতে বলেছেন, আর যেহেতু প্রশ্ন করে যদি সেটা আমলে না আনা হয়, তবে প্রশ্ন করার কোন অর্থ থাকে না। সুতরাং প্রশ্ন করে তার উপর আমল না করলে, প্রশ্ন করাটাই অবান্তর। অতএব, এটি তাকলীদের আবশ্যকার ব্যাপারে প্রমাণ।

তাফসীরে কুরতুবীতে আলাম্মা কুরতুবী (রহঃ) বলেন-

" لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعَامَّة عَلَيْهَا تَقْلِيد عُلَمَائِهَا , وَأَنَّهُمْ الْمُرَاد بِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : " فَاسْأَلُوا أَهْل الذِّكْر إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَعْمَى لَا بُدّ لَهُ مِن تَقْلِيد غَيْره مِمَّن يَثِق بِمَيْزِهِ بِالْقِبْلَةِ إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ ; فَكَذَلِكَ مَن لَا عِلْم لَهُ وَلَا بَصَر بِمَعْنَى مَا يَدِين بِهِ لَا بُدّ لَهُ مِن تَقْلِيد عَالِمه , وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعَامَّة لَا يَجُوز لَهَا الْفُتْيَا ; لِجَهْلِهَا بِالْمَعَانِي الَّتِي مِنهَا يَجُوز التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم . "

আলেমদের মাঝে এ ব্যপারে কোন মতনৈক্য নেই যে, সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের অনুসরণ জরুরি। এবং কুরআনের এ আয়াত (যদি তোমরা না জানো, তবে যারা ‘আহলুয যিকির রয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) দ্বারা এটি উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে যেমন সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অন্ধ ব্যক্তির জন্য কিবলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের উপর নির্ভর করতে হয়, তেমনি শরীয়তের বিষয়ে যারা অজ্ঞ, তাদেরকেও আলেমদের অনুসরণ করতে হবে। এবং এ ব্যাপারেও আলেমগণ একমত যে, সাধারণ মানুষের জন্য “ফতোয়া” দেয়া বৈধ নয়। কেননা কোন কোন বিধানে হারাম ও হালালের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে সে অজ্ঞ।”[৭২]

“আত-তাফসীরুল মুয়াস্‌সায়ার” এ এ আয়াতের ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

والآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها من العلماء الراسخين في العلم

“দ্বীনের যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে আয়াতটি ব্যাপক। যখন কোন ব্যক্তির দ্বীনের কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকবে, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করবে।”[৭৩]

তাফসীরে বায়যাবীতে আলাম্মা বায়যাবী (রহঃ) আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ে লিখেছেন,

في الآية دليل على وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم

---

[৭২] তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৩৫

[৭৩] التفسير الميسر - (ج 4 / ص 415)

“আয়াতটি অজানা বিষয়ে আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করার আবশ্যকতার প্রমাণ”[৭৪] অধিকাংশ তাফসীরে এ ধরণের বক্তব্য রয়েছে। সবগুলো উলেখের অবকাশ এখানে নেই।

সাধারণ মানুষের জন্য উলামাদের নিকট প্রশ্ন করার বিষয়ে এ আয়াতটি সর্বশ্রেণীর উলামায়ে কেরামের নিকট দলিল। যেমন, বর্তমান বিশ্বে সালাফীদের ইমামতুল্য আলেম শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহঃ) বলেছেন-

وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ الأنبياء/43 . [75]

“কোন মুসলমান যদি এমন হয় যে, সে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দিতে না পারে, তখন তার জন্য জরুরি হল, সে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করবে যাদের ইলম ও দ্বীনদারির ব্যাপারে সে আস্থাশীল এবং তাদের ফতোয়ার উপর আমল করবে। কেননা আলাহ তায়ালা বলেছেন ,
“যদি তোমরা না জেনে থাক, তবে যারা জানে তাদেকে জিজ্ঞেস করো”

[৭৪] তাফসীরে বায়যাবী, পৃষ্ঠা-৩৯৯

[৭৫] الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين ص: ২৩ .

তাকলীদের যৌক্তিকতা

ডক্টর সা'য়াদ বিন নাসের আশ-শাছারী[৭৬] "আত-তাকলীদ ও আহকামুহু"[৭৭] নামক কিতাবে তাকলীদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে লিখেছেন,

এক.

أن شروط الإجتهاد عسيرة تتعذر علي أكثر الناس إذ المجتهد لا بد أن يكون ذكيا نبيها متيقضا عالما باللغة و اللسان، عالما با لكتاب و السنة ، ناسخها و منسوخها، مجملها و موضحها، خاصها و عامها ، مطلقها ومقيدها، مع معرفة الأسانيد صحة و سقما، عالما با لإجماع، و هذه الشروط قليل توفرها، عزيز وجودها في إنسان واحد، لذا فإن الله بين حكم التقليد لكي يسلكه من لم يستطع الإجتهاد

"কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করার (ইজতেহাদ) বিষয়টি খুবই কঠিন। যা অর্জন করা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কেননা মুজতাহিদ (যিনি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে পারেন) এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকা আবশ্যক-

১. মুজতাহিদ প্রখর মেধাশক্তি এবং তীক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।
২. মাকাসেদে শরইয়্যা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হতে হবে।
৩. বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ জানতে হবে।
৪. কুরআন ও সুন্নাহের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে।
৫. কুরআনের নাসেখ (রহিতকারী আয়াতসমূহ) এবং মানসুখ (যে আয়াত বা আয়াতের হুকুম রহিত) পূর্ণ অবগত হতে হবে।
৬. কুরআনের মুজমাল (অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ) এবং কুরআনের মুফাস্‌সার (দ্ব্যর্থহীন শব্দ) এর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
৭. কুরআনের আম (ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ) এবং খাস (সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে।
৮. কুরআনের "মুতলাক" (সাধারণ অর্থবোধ শব্দ) এবং "মুকায়্যাদ" (সীমাবদ্ধ অর্থবোধক শব্দ)

---

[৭৬] শরীয়া বিভাগ, জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল-ইসলামী, রিয়াদ। জন্ম-১৩৮৭ হিঃ
ড.সা'য়াদ ৬০ এর বেশি গ্রন্থের প্রণেতা। আন্তর্জাতিক স্কোলার। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।
[৭৭] দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, এটি প্রকাশ করেছে। প্রথম প্রকাশ-১৪১৬ হিঃ

৯. হাদীসের সনদ (বর্ণনার পরম্পরা) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। হাদীসের কোনটি সহীহ এবং কোনটি সহীহ নয়, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
১০. ইজমা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

এ সমস্ত শর্ত যেহেতু অধিকাংশ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এবং সাধারণতঃ একই ব্যক্তির মধ্যে একই সাথে এতগুলো গুণের সমন্বয় ঘটেনা, এজন্য শরীয়তে তাকলীদের ব্যবস্থা রয়েছে, যেন একব্যক্তি এ স্তরে না পৌঁছতে পারলেও যারা এ স্ত রে পোঁছেছে, তাদের অনুসরণ করতে পারে।

দুই.

قلة المجتهدين و كثرة من يضادهم، فكانت الحاجة للتقليد قوية

বাস্তবে যেহেতু মুজতাহিদদের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় খুবই কম, এজন্য অধিকাংশ মানুষের উপকারিতার কথা বিবেচনা করে তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তিন.

قلة الوقت ، فإن العامي إذا نزلت به نازلة فإذا لم نجوز له التقليد و نبين له أحكامه متي سيبلغ رتبة الإجتاد ليعرف حكم هذه النازلة بل لعله لا يبلغ هذه الرتبة، أفتضيع الأحكام؟!
زد علي ذلك ان الإجتهاد يحتاج علي ذلك مزيد وقت مع التفرغ للمامرسة، و النظر مع نفاذ القريحة و خلو المشاغل

"তাকলীদের প্রয়োজনীয়তার আরেকটি দিক হল, সময়ের স্বল্পতা। কেননা সাধারণ মানুষ যখন কোন মাসআলা বা সমস্যার মুখোমুখি হবে, তখন যদি আমরা তার জন্য তাকলীদের অনুমতি না দেই এবং উক্ত মাসআলার হুকুম তার নিকট বর্ণনা না করি, তবে ঐ ব্যক্তি কবে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করার (ইজতেহাদ) স্তরে উন্নীত হবে এবং এ মাসআলার সমাধান বের করে তার উপর আমল করবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হবে যে, সে হয়ত সে স্তরে উন্নীত হতেই পারবে না। এমতাবস্থায় তাকলীদ না করে কি সে শরীয়তের হুকুমকে জলাঞ্জলি দিবে?

উপর্যুপরি, ইজতেহাদের জন্য দীর্ঘ সাধনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। আর এজন্য তাকে একনিষ্ঠ চিত্তে অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘ সময় অনুশীলন করা প্রয়োজন। (যা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে অসম্ভব)

চার.

أن بالتقليد تعمر الدنيا، إذ لو لم يكن التقليد سائغا لأدي إلي إنقطاع الحرث ، و هلاك النسل ، و تعطل الحرف ، وفساد الصنائع و الإشتغال عن المعايش، و يؤدي إلي خراب الدنيا لو إشتغل الناس كلهم بالعلم و طلبه لتحصيل رتبة الإجتهاد

"তাকলীদের মাধ্যমে জাগতিক জীবনে ভারসাম্য ঠিক থাকে, যদি তাকলীদের অনুমতি না থাকত, তবে চাষাবাদের ধারা অব্যাহত থাকত না, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের মুখোমুখি হত, বিভিন্ন ধরণের শিল্প ও পেশা বন্ধ হয়ে যেত, শিল্প-কারখানাগুলো বিকল হয়ে যেত এবং মানুষ জীবিকা অর্জনে সময় দিতে পারত না; ফলে দুনিয়া মহা ধ্বংসের আবর্তে ঘুরপাক খেত। কেননা দুনিয়ার সকল মানুষ যদি ইলমের শীর্ষ শিখরে পৌছার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হত এবং প্রত্যেকেই মুজতাহিদের স্তরে উন্নীত হতে চাইত, তবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত।

পাঁচ.

أن رفع التقليد هومن الحرج و الإضرار المنفي في شرعنا المطهر، قال تعالي : (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدين من حرج) و قال النبي صلي الله عليه و سلم (لا ضرر و لا ضرار)

"তাকলীদের অনুমতি না দেয়াটা মারাত্মক ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হবে, যা আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা ধর্মের মধ্যে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর কোন বিষয় রাখেননি" এবং রাসূল (সঃ) বলেছেন, "তোমরা অন্যের ক্ষতি করো না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না"

যুগে যুগে মাযহাবের অনুসারী ছিলেন কারা?

দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকলেই মাযহাব অনুসরণ করেছেন। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, আলেম সকলেই এ চার মাযহাবের অধীনে থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি-

মাযহাবের অনুসারী বিখ্যাত হাদীস বিশারদগণ

- যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন-
    ১. ইমাম ত্বহাবী (রহঃ)
    ২. ইমাম যাইলায়ী (রহঃ)
    ৩. আলাম্মা আইনী (রহঃ)
    ৪. আলাম্মা আলাবী (রহঃ)
    ৫. আলাম্মা ইবনে বালবান (রহঃ)
    ৬. ইমাম আলমুত্তাকি আল-হিন্দি (রহঃ)
    ৭. মোলা আলী ক্বারী (রহঃ)
    ৮. শাহ ওয়ালিউলাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ)
    ৯. শাহ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ)
    ১০. আব্দুল হাই লাখনবী (রহঃ)
    ১১. শায়খ যাকারিয়া কান্ধলবী (রহঃ)

উস্তাদ-ছাত্র সম্পর্কঃ

প্রসঙ্গতঃ উলেখ্য যে, বড় বড় মুহাদ্দিসগণ যারা হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন, তাদের প্রায় সককেই পরোক্ষভাবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ছাত্র। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এই উস্তাদ-ছাত্র সম্পর্কের কয়েকটি নমুনা নিচে পেশ করা হল-

১. ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)→ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) → বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন→ **ইমাম বোখারী (রহঃ)**
২. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) → বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন→ **ইমাম মুসলিম (রহঃ)**

৩. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) → বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন→ **ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) → ইমাম নাসায়ী (রহঃ)**
৪. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) → বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন→ **বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু ইয়ালা (রহঃ)**
৫. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) → মুহাদ্দিস ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকছাম (রহঃ) → **ইমাম তিরমিযি (রহঃ) → ইমাম ইবনে মাজা (রহঃ)**
৬. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) → **ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) → ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)**
৭. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → শায়েখ মুসঈর বিন কুদাম (রহঃ) → ইমাম বোখারী (রহঃ) → **ইমাম ইবনে খোজাইমা (রহঃ) → ইমাম দারে কুতনী (রহঃ)**
৮. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → শায়েখ মুসঈর বিন কুদাম (রহঃ) → ইমাম বোখারী (রহঃ) → ইমাম ইবনে খোজাইমা→ ইমাম হাকেম (রহঃ) → ইমাম বাইহাকী (রহঃ)
৯. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → শায়েখ মক্কী বিন ইবরাহিম (রহঃ) → শায়েক আবু আওয়ানা (রহঃ) → ইমাম তাবরানী (রহঃ)
১০. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) → শায়েখ মক্কী বিন ইবরাহিম (রহঃ) → শায়েখ আবু আওয়ানা (রহঃ) → ইবনে আদী (রহঃ)

- যারা মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন-
    ১. আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহঃ)
    ২. আল্লামা কাযী ইয়ায (রহঃ)
    ৩. ইবনুল মুনীর (রহঃ)
    ৪. ইবনে বাত্তাল (রহঃ)
    ৫. আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহঃ)
    ৬. আল্লামা যারকানী (রহঃ)

- যারা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন-

- ইমাম তিরমিযি (রহঃ)
- আলামা ইবনে খোজাইমা (রহঃ)
- ইমাম দারে কুতনী (রহঃ)
- ইমাম হাকেম (রহঃ)
- ইমাম বাইহাকী (রহঃ)
- খতীবে বাগদাদী (রহঃ)
- ইমাম রওয়ানী (রহঃ)
- ইমাম ইবনে আসাকির (রহঃ)
- আলামা ইবনুস সালাহ (রহঃ)
- ইমাম নববী (রহঃ)
- ইমাম ইবনে জামাআ (রহঃ)
- আলামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)
- ইমাম সাখাবী (রহঃ)
- জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ)

- যারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন,
  ১. ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)
  ২. ইমাম নাসায়ী (রহঃ)
  ৩. ইমাম ইবনে মাজা (রহঃ)
  ৪. ইমাম দারমী (রহঃ)[৭৮]
  ৫. আব্দুলাহ ইবনে আহমাদ (রহঃ)
  ৬. আলামা ইবনুল জাওযী (রহঃ)
  ৭. আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ)
  ৮. ইবনু আব্দিল হাদী (রহঃ)

---

[৭৮] শাহ ওয়ালীউলাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) এর মত অনুযায়ী ।

মাযহাবের অনুসারী বিখ্যাত তাফসীরবিদগণ

- যারা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেছেন-
    ১. ইমাম জাছ্ছাস (রহঃ)
    ২. ইমাম আলুসী (রহঃ)
    ৩. ইমাম নাসাফী (রহঃ)
    ৪. কাযী সানাউল্লাহ পানিপতি (রহঃ)

- যারা মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন,
    ১. আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ)
    ২. ইমাম কুরতুবী (রহঃ)
    ৩. ইমাম ইবনে আ'শূর (রহঃ)

- যারা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন,
    ১. ইমাম বাগাবী (রহঃ)
    ২. ইবনে কাসীর (রহঃ)
    ৩. ইমাম বায়যাবী (রহঃ)
    ৪. জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ)
    ৫. জালালুদ্দিন মহল্লী (রহঃ)
    ৬. ইমাম যারকাশী (রহঃ)

- যারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন,
    ১. ইবনুল যাওযী (রহঃ)
    ২. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)

মাযহাবের অনুসারী উসুলে ফিকাহের বিখ্যাত ইমামগণ

- যারা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন-
    ১. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ)
    ২. ইমাম সারাখসী (রহঃ)
    ৩. ইমাম বাযদবী (রহঃ)

৪. ইমাম শাশী (রহঃ)
৫. ইবনে আমীর আলহাজ্ব (রহঃ)

- যারা মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন-
    ১. ইবনুল হাজেব (রহঃ)
    ২. ক্বারাফী (রহঃ)
    ৩. ইবনুল আরাবী (রহঃ)
    ৪. ইমাম শাতবী (রহঃ)

- যারা শাফেয়ী মাযহাবে অনুসরণ করেছেন-
    ১. ইমাম জুয়াইনি (রহঃ)
    ২. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালী (রহঃ)
    ৩. আলামা আ'মাদী (রহঃ)
    ৪. আলামা রাযী (রহঃ)
    ৫. আলামা শিরাযী (রহঃ)
    ৬. আলামা ইবনুস সুবকি (রহঃ)
    ৭. জালাল আলমাহালী (রহঃ)

- যারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন-
    ১. ইবনে কুদামা (রহঃ)
    ২. ইবনুন নাজ্জার (রহঃ)
    ৩. আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)
    ৪. ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)

রাজনৈতিক ও ভৌগলিকভাবে মাযহাবের অনুসরণ

আমরা যদি ইসলামের রাজা–বাদশা ও বিশ্বজয়ীদের দিকে লক্ষ করি, তবে দেখা যাবে তাদের সকলেই কোন কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

- যারা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন-

১. আব্বাসীয় খিলাফতকালে প্রায় ৫০০শ’ বছর যাবৎ হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেন। তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে হানাফী মাযহাব পালিত হত।

ইবনু আব্দিল বার (রহঃ) লিখেছেন-

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.(ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র) আব্বাসীয় খলিফা, মাহদী, হাদী এবং হারুনুর রশিদের সময়ে সমগ্র খিলাফতের কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি ছিলেন)[৭৯]

২. উসমানী খলিফাগণ দীর্ঘ সাড়ে ছয় শ’ বছর যাবৎ হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন।

৩. ভারত উপমহাদেশের প্রায় সকল সম্রাটই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। গজনী, মামলুক, খলজী, সৈয়দ, লোদী, তুঘলক, মুঘল সকলেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

পূর্ব থেকে এখনও পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করা হয়-

১. সুদান, মিশর, জর্দান, সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, আলবেনিয়া, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, রাশিয়া, চীন, তুরঙ্ক, বলকান, আজারবাইজান, ইইক্রেন, শাম, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা মারিশাছ লিভান্ট ইত্যাদি।

২. যে সমস্ত অঞ্চলে মালেকী মাযহাব অনুসরণ করা হয়-
উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, ইউনাইটেড আরব আমীরাত, কুয়েত, সওদী আরবের কিছু অংশ, উমান, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, পশ্চিম সাহারা, চাদ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রে মালেকী মাযহাব অনুসরণ করা হয়। ইউরোপে বিশেষভাবে স্পেনে মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করা হত।

---

[79] قال ابن عبد البرّ: «كان أبو يوسف قاضي القضاة، قضى لثلاثة من الخلفاء، ولي القضاء في بعض أيام المهدي ثم للهادي ثم للرشيد. وكان الرشيد يكرمه ويجلّه، وكان عنده حظياً مكيناً. لذلك كانت له اليد الطولى في نشر ذكر أبي حنيفة وإعلاء شأنه، لما أوتي من قوة السلطان، وسلطان القوة».

৩. যে সমস্ত অঞ্চলে শাফেয়ী মাযহাব অনুসরণ করা হয়-
দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, উত্তরপূর্ব আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারত উপমহাদেশের কিছু অংশ।
৪. সওদী আরবে বিশেষভাবে হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

আমরা এখানে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের যে সংখ্যা উলেখ করেছি, এটি খুবই সামান্য। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ায় যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য আলেমের নাম উলেখ করা হয়নি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং ফকীহগণের জীবনীর উপর লেখা গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে। যেমন-

১. আলামা ইবনে খালিকান (রহঃ) কর্তৃক রচিত "ওফায়াতুল আ'য়ান"।
২. মিশর ওযারাতুল আওকাফ থেকে প্রকাশিত "মাউসুআতুল আ'লাম"।
৩. আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যা, আব্দুল কাদের বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ (রহঃ)
৪. তাবাকাতুল ফুকাহা, আবু ইসহাক শিরাযী (রহঃ)
৫. তবাকাতুল হানাবেলা, আলামা ইবনু আবি ইয়ালা।
৬. আদ-দিবাজুল মাযহাব ফি মা'রিফাতি আ'য়ানি উলামিল মাযহাব। মালেকী মাযহাবের উলামায়ে কেরামের জীবনীর উপর রচিত।
৭. তবাকাতুল শাফেয়ীয়া আলকুবরা, আলামা তাজুদ্দিন সুবকী (রহঃ)

মোট কথা ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখায় হিজরী তৃতীয় শতকের পরে যারাই কোন অবদান রেখেছেন, তাদেও প্রায় সকলেই নির্দিষ্ট একটা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

দীর্ঘ বার-তের শ' বৎসরের ইতিহাসে উলেখযোগ্য দু'জন[৮০] আলেম চার মাযহাবের বিরোধীতা করেছেন-

---

[৮০] আবু ইসহাক শিরাজী (রহঃ) তাঁর তাবাকাতুল ফুকাহা গ্রন্থে যাহেরী মাযহাবের অনুসারী ১৭ জন আলেমদের সংখ্যা উলেখ করেছেন। সম্প্রতি ২০০৯ সালে বইরুত থেকে "তাবাকাতু আহলিয যাহির" নামে একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। সংকলক হলেন "আবু মুয়াবিয়া বইরুতী"। তিনি এ কিতাবে দাউদে যাহিরী কিংবা ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) এর অনুসারী তথা যাহেরী মাযহাবের অনুসারী ১৮৫ জন আলেমের নাম উলেখ করেছেন। যাহেরী মাযহাবের অনুসারীগণ মূলতঃ দাউদে যাহেরী কিংবা ইবনে হাযাম যাহেরী এর অনুসরণ করে থাকে। সর্বযুগের উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হল, এ সমস্ত যাহেরী বা বাহ্যিকবাদীদের বক্তব্য বা ফতোয়া কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য

১. দাউদে যাহিরী (রহঃ)। তিনি প্রথম জীবনে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, পরবর্তীতে মুজতাহিদ হওয়ার দাবী করলেও মুসলিম উম্মাহ তাঁকে গ্রহণ করেনি।
২. আলামা ইবনে হাযাম যাহিরী (রহঃ)। তিনি প্রথম জীবনে দাউদে যাহেরীর অনুসারী ছিলেন, পরবর্তীতে নিজেই মুজতাহিদ হিসেবে মাসআলা প্রদান করতে শুরু করেন। তাঁকেও মুসলিম উম্মাহ প্রত্যাখ্যান করেছে।

আলামা ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) শুধু কুরআন ও হাদীস অনুসরণ করতে গিয়ে এমন সব মাসআলা দিয়েছেন, যার ব্যাপারে সকল যামানার সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে, এসমস্ত মাসআলা কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পবিত্র কুরআনে আছে, তোমরা পিতা-মাতাকে "উফ" শব্দ বলে না। এ থেকে তিনি বলেন যে, এখানে শুধু উফ শব্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে পিতা-মাতাকে গালি দেয়া, প্রহার করা, অপবাদ দেয়া, হত্যা করা এগুলো থেকে নিষেধ করা হয়নি। এই মাসআলা সর্ব প্রথম প্রদান করে দাউদে যাহিরী (১ম ব্যক্তি)। তাঁর এ মত অনুসরণ করেছে, ইবনে হাযাম যাহেরী (বাহ্যিকবাদী)। আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এদের এ সমস্ত ভ্রান্ত মতামতকে সুস্পষ্টভাবে খণ্ডণ করেছেন।[৮১]

ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) কর্তৃক প্রদত্ত এ জাতীয় কয়েকটি মাসআলা নিম্নে পেশ করা হল-
১. বোখারী শরীফে আছে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, "তোমরা স্থির পানিতে পেশাব করো না।" এ হাদীস থেকে ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) মাসআলা দিয়েছেন-

فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره

নয়। এরা আক্বীদাগতভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন। বাহ্যিকবাদীগণ "কুরআন" সৃষ্ট এ আক্বীদায় বিশ্বাসী। এরা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ ক্বিয়াসকে অস্বীকার করে ইসলামে এমন সব মাসআলা দিয়েছে, যা সরাসরি ইসলামের বিকৃতি সাধনের নামান্তর।

[৮১] দেখুন, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৭, মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২০৭

কেউ যদি পানিতে পায়খানা করে কিংবা সরাসরি স্থির পানিতে পেশাব না করে পাড়ে পেশাব করে আর সেই পেশাব গড়িয়ে পানিতে যায়, তবে পানি নাপাক হবে না।
[আল-মুহাল্লা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৫]

ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসে রাসূল (সঃ) অল্প পানিতে 'পেশাব' করে ওযু করতে নিষেধ করেছেন। তিনি পায়খানা করে ওযু করতে নিষেধ করেননি। এজন্য কেউ যদি অল্প পানিতে পায়খানা করে তবে পানি নাপাক হবে না।

মুসলিম শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" নামক গ্রন্থে ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) এর এ জাতীয় মাসআলা প্রসঙ্গে বলেছেন-
وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله ، وفساده مغن عن الاحتجاج عليه

"এটি বড় আশ্চর্য জনক মাযহাব। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। ইবনে হাযাম যাহেরী থেকে বর্ণিত মাসআলাগুলোর নিকৃষ্টতম মাসআলার একটি। আর এটি যে সুস্পষ্ট ভুল তা বলার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই"
[আল-মাজমু, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৮]

২. ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) মাসআলা দিয়েছেন, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে উক্ত পাত্র সাত বার না ধৌত করা পর্যন্ত পাক হবে না। অথচ তিনি বলেন, শুয়োরের এঁটে পাক, এমনকি তা পান করা যাবে, তা দিয়ে ওযু করাও যাবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূলের কোন হাদীস নেই।
৩. হাদীসে এসেছে, রাসূল (সঃ) রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে ফজরের নামাযের পূর্বে শয়ন করতেন, অতঃপর ফযরের নামায আদায় করতেন। এ হাদীস থেকে ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) ফতোয়া দিয়েছেন, কেউ যদি ফযরের আগে দু'রাকাত নামায আদায় করে, তবে তার জন্য কিছুক্ষণ ডান কাত হয়ে না শুয়ে ফযরের নামায আদায় করা জায়েয নয়। সে ওয়াক্তে আদায় করুক কিংবা

ঘুমের কারণে কাযা করে আদায় করুক। এখন কেউ যদি ডান কাত হয়ে শুতে অৰম হয়, তবে তার জন্য যতদূর সম্ভব ইশারা করতে হবে।[৮২]

৪. যে কোন ক্ষেত্রে পুরুষের পেশাবের উপর চিহ্ন দূরীভূত হওয়ার জন্য শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ঠ। আর মহিলার পেশাব কোন কিছুতে লাগলে তা ধৌত করা জরুরি।[৮৩]

৫. কোন মহিলা যদি কোন পানি দ্বারা ওযু কিংবা গোসল করে এবং কিছু পানি অবশিষ্ট থাকে, তবে সে মহিলা ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক, অবশিষ্ট পানি দ্বারা অন্য কোন পুরুষের জন্য ওযু কিংবা গোসল করা জায়েয নয়। তবে সে পানি পান করা যাবে। অবশ্য মহিলাদের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অন্য কোন মহিলা ওযু কিংবা গোসল করতে পারবে। আর পুরুষের ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানির দ্বারা সকলেই ওযু ও গোসল করতে পারবে।[৮৪]

৬. আলা্মা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়া এর মাঝে ইবনে হাযাম (রহঃ) এ ভ্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। আলা্মা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন,

وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت، كقوله "أنت طالق عند رأس الشهر". وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلّق. ولم يُعلم فيه خلافاً قديماً. لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق! وهو قول الإمامية (أي الرافضة).

কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাকের ক্ষেত্রে বলে যে, আগামী মাসের শুরুতে তুমি তালাক। তবে সমস্ত উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য হল, স্ত্রী নির্দিষ্ট সময় অত্রিক্রান্ত হলে তালাক হয়ে যাবে। পূর্বে কেউ এ ব্যাপারে মতানৈক্য করে নি। অথচ ইবনে হাযাম ধারণা করেছে যে, এতে তালাক হবে না। এটি হল, ইমামিয়া তথা রাফেযীদের অভিমত।

[খণ্ড-৩৩, পৃষ্ঠা-৪৬]

৭. হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কোন সুদ নেই। অর্থাৎ শুধু স্বর্ণে, রৌপ্য, গমের, যবের, খেজুর, এবং লবণের বেচাকেনায় সুদ হবে, অন্য কোথাও সুদ হবে না।

---

[৮২] আল-মুহালা্, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯৬

أنه يجب على من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن قبل صلاة الفجر سواء صلاها في وقتها أو قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم ، فإن عجز عن الضجعة أشار إلى ذلك حسب طاقته . ولم يجز له أن يصلي الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن .

[৮৩] আল-মুহালা্, খ.১, মাসাইলুন ফি ইযালাতিন নাজাসাতি। মাসআলা নং ১২৩, দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত।

[৮৪] আল-মুহালা্, খ.১, মাসাইলুন ফি ইযালাতিন নাজাসাতি। মাসআলা নং ১৫১, দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত।

৮. ওযুর মধ্যে প্রথমে ডান পাশের অঙ্গ সমূহ যেমন ডান হাত, ডান পা, ধৌত করা ওয়াজিব । অর্থাৎ বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করা ওয়াজিব । [আল-মুহাল্লা, খ-৩৩,পৃ-৬৬]

অথচ উলামায়ে কেরামের মাঝে ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, এটি ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব ।

[দেখুন! আল-আওসাত, আল্লামা ইবনুন মুনযির (রহঃ), খ.১, পৃ.৩৮৭, আল-মাজমু', আল্লামা নববী (রহঃ), খ-১, পৃষ্ঠা-৩৮৩]

৯. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নখ ইত্যাদি কর্তন করা জায়েয । এর জন্য তাকে কোন দম ইত্যাদি দেয়া লাগবে না । [আল-মুহাল্লা, খ.৭, পৃ.২৪৬]

অথচ এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে যে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নখ ইত্যাদি কর্তন করা হারাম ।

[আল-ইজমা,আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহঃ), পৃষ্ঠা-১৭]

১০. পবিত্র কুরআনে রয়েছে

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

"দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না"

এ আয়াত থেকে ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) মাসআলা দিয়েছেন- ধনাঢ্যতা থাকা অবস্থায় সন্তানদেরকে হত্যা করা যাবে । কেননা এ আয়াতে শুধু দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে ।

[মাজমুউল ফাতাওয়া, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৫০]

১১. সম্মানিত তিনটি মসজিদ (মক্কা, মদীনা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস) ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম । আর নবীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে সফর করা মুস্তাহাব ।

[আর-রাদ্দু আলাল আখনাবী, পৃষ্ঠা-১৫, মাজমুউল ফাতাওয়া, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-২৫০]

১২. আক্বীদার ক্ষেত্রেও ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হয়ে গেছেন । তিনি আল্লাহ তায়ালার সিফাতকে অস্বীকার করেন । এটি মূলতঃ মু'তাযেলাদের আক্বীদা ।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وكذلك أبو محمد بن حزم ـ مع معرفته بالحديث ، وانتصاره لطريقة داود ، وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر ـ قد بالغ في نفي الصفات ... ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ، ونحوهما لا تدل على العلم ، والقدرة

، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة ، ويدعي أن قوله هو: قول أهل السنة ، والحديث ، ويذم الأشعري ، وأصحابه ذما عظيما ، ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة ، والحديث في الصفات ، ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري ، وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك .

“একইভাবে আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযাম (রহঃ) হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সাথে সাথে তিনি ক্বিয়াস অস্বীকারকারী বাহ্যিকবাদী যেমন দাউদে যাহেরী (রহঃ) কে সাহায্য করেছেন; কিন্তু তিনি আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করেছেন। তিনি ধারণা করেছেন-আল্লাহর সিফাত যেমন “আলীম” সিফাত আল্লাহর ইলমকে বোঝায় না। এবং “কাদীর” সিফাতটি আল্লাহর কুদরত থাকাকে বোঝায় না। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সহ অপরাপর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উলামাদের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। এবং তিনি দাবী করেছে যে, তাঁর কথা হল, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কথা। তিনি আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে মারাত্মক নিন্দা করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, আশআরী আক্বিদায় বিশ্বাসীগণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বহির্ভূত; অথচ বাস্তব সত্য কথা হল- সিফাতের ক্ষেত্রে আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণের মাযহাব ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) এর মাযহাবের তুলনায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অধিক নিকটবর্তী।
[দারউ তাআরুজিল আকলি ওয়ান নকলি, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ইবনে হাযাম সহ তার অনুসারী যাহেরীদেরকে ভ্রান্ত ফেরকা জাহমিয়াদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।
[মিনহাজুজ সুন্নাহ, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), খণ্ড-২, পৃ.৫৮৩]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এধরণের বাহ্যিকবাদীদেরকে তাওহীদ, আল্লাহর সিফাত ও নামের ক্ষেত্রে বাতেনী কারামতী সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। [৮৫]

১৩. দাউদে যাহিরী খলকে কুরআন তথা ‘কুরআন সৃষ্ট’ এ বিশ্বাস পোষণ করতেন।

---

[৮৫] فهذا، ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، مع ادعائهم الحديث، ومذهب السلف، وإنكارهم على الأشعري، وأصحابه أعظم إنكار، ومعلوم أن الأشعري، وأصحابه أقرب إلى السلف، والأئمة، ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير. العقيدة الأصفهانية ص 106-108 شيخ الإسلام ابن تيمية

১৪. মু’তাযেলারা ইসলামী শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ ক্বিয়াসকে অস্বীকার করে। এই ধারাবাহিকতায় দাউদে যাহিরী[৮৬], ইবনে হাযাম যাহেরীও ক্বিয়াসকে অস্বীকার করে।

- বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু আব্দিল বার (রহঃ) এধরণের যাহেরী (বাহ্যিকবাদী) সম্পর্কে লিখেছেন-

فما أرى هذا الظاهري، إلا قد خرج عن جماعةِ العلماءِ من السلف والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء وشذّ عنهم.

“এই যাহেরী (বাহ্যিকবাদী) সম্পর্কে আমার অভিমত হল, সে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল উলামাদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে। সে সমস্ত ফকীহদের বিরোধীতা করেছে এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।”[৮৭]

বিজ্ঞ পাঠক! এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, যারা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের কথা বলে এবং সাহাবা, তাবেয়ীন এবং বড় বড় ইমামদের বক্তব্য এবং ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করে, ইসলামে তারা হল, বিচ্ছিন্নতাবাদী। তারা হাজার সহীহ কুরআন ও হাদীস অনুসরণের কথা বললেও, তারা মূলতঃ ইসলামে বিকৃতির পথ চালু করে।[৮৮]

---

[৮৬] তারিখে বাগদাদ, খ.৮, পৃ.৩৭৪,

[৮৭] আল-ইসতেযকার, পৃষ্ঠা-৩০৯

[88] قال إمام الأندلس ابن عبد البر في الاستذكار (302\1) عن صاحبه ابن حزم» :وقد شذّ بعض أهل الظاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد في ترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها». ويبين أنه يقصد واحداً بعينه (ص307): «والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه». وبين ابن عبد البر أن هذا ليس مذهب الظاهرية، وذكر استدلالات ابن حزم بعينها. وقال بعد كل ذلك (ص309): «فما أرى هذا الظاهري، إلا قد خرج عن جماعةِ العلماءِ من السلف والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء وشذّ عنهم. ولا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذِّ من العِلم .«قلت: صدق رحمه الله، فإن من تتبع زلات العلماء تزندق، فكيف بمن جمع موسوعة من الأقوال الشاذة التي لم يسبق بها؟

قال الحافظ السلفي ابن كثير (تلميذ شيخ الإسلام) في الجزء 12 من "البداية والنهاية": «كان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقَلَمه، فأوْرثه ذلك حِقداً في قلوب أهل زمانه. ومازالوا به حتى بَغّضَوه إلى ملوكهم، فطردوه عن بلاده. والعجب —كل العجب— منه أنه كان ظاهرياً حائراً في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره. وهذا الذي وَضَعَهُ عند العلماء، وأدْخَلَ عليه خطأ كبيراً في نظره وتصرّفه. وكان —مع هذا— من أشد الناس تأويلاً في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه كان أولاً قدْ تضلّع من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني .ففسُد بذلك حاله في باب الصفات».

وقال ابن كثير أيضاً (332\14): «ورأيتُ في ليلة الإثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ثلاث وستين وسبعمائة الشيخ محي الدين النووي رحمه الله فقلت له: يا سيدي الشيخ لِمَ لا أدْخلتَ في "شرحك المهذب" شيئاً من مصنفات ابن حزم؟ فقال ما معناه: أنه لا يحبه. فقلت له: أنت معذور فيه فإنه جمع بين طرفيْ النقيضين في أصوله وفروعه. أما هو في الفروع فظاهريّ جامد يابس. وفي الأصول قول مائع قرمطة القرامطة وهَرَس الهرائسة. ورفعت بها صوتي حتى سمعت وأنا نائم. ثم أشَرْتُ له إلى أرض خضراء تشبه النخيل بل هي أرْدأ شكلاً منه، لا يُنتفع بها في اسْتغلالٍ ولا رعي. فقلت له: هذه أرض ابن حزم التي زرعها. قال: أنظر هل ترى فيها شجراً مثمراً أو شيئاً يُنتفع به؟ فقلت: إنما تصلح للجلوس عليها في ضوء القمر. فهذا حاصل ما رأيته. ووقع في خلدي أن ابن حزم كان حاضرنا عندما أشرْت للشيخ محيي الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم، وهو ساكتٌ لا يتكلم».

وصفه الآلوسي عند ذكره في تفسيره (76/21) بقوله) :الضال المضلل

- আলামা ইবনে কাসীর (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" তে লিখেছেন-

كان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقَلَمه،... فطردوه عن بلاده

"ইবনে হাযাম (রহঃ) তার মুখের ভাষায় এবং কলমে উলামাদের ব্যাপারে খুব বেশি বিষোদগার করতেন। ফলে লোকেরা তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল"[৮৯]

বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোককে দেখা যায়, তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা থেকে বের হয়ে যাহেরী মাযহাবের অনুসরণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এরা মূলতঃ চার মাযহাবের বিরোধীতা করে মানুষকে ইবনে হাযাম যাহেরীর অনুসারী বানাতে আগ্রহী। কেননা তারা যখন কঠোরভাবে চার মাযহাবের বিরোধীতা করেছে, তখন তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে, চার মাযহাবের বিকল্প হিসেবে কোন কিছুকে দাঁড় করান, চাই তা যে স্তরেরই হোক না কেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এরা চার মাযহাবের সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত অথচ চার মাহযাবের চেয়ে জঘন্য ভুল করা সত্ত্বেও তাদের নিকট যাহেরী মাযহাব প্রিয়। এদের এ অবস্থা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়-

১. এদের মূল উদ্দেশ্য থাকে সৎ ও অসৎ যে কোন মূল্যে চার মাযহাবের সমালোচনা করা। এজন্য তারা মারাত্মক মারাত্মক ভুল করা সত্ত্বে ও যাহেরী মাযহাবকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।
২. চার মাযহাবের অধিকাংশ মাসআলা বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে সেগুলোর বিরোধীতা করার দ্বারা মাধ্যমে এরা মূলতঃ ইসলামে বিকৃতি পথ চালু করে। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, চার মাযহাবে সীমাবদ্ধ থাকলে তারা তাদের স্বেচ্ছাচারিতার উপর চলতে পারে না। এবং তাদের নিজস্ব মনগড়া বক্তব্য পেশ করতে পারে না। চার মাযহাব ছেড়ে যাহেরী মাযহাবের অনুসারী হওয়াটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বের বিকৃত চিন্তা-ধারার অনুগামী বানানোর জন্য গবেষণার পথে অগ্রসর হয় এবং কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের কথা বলে ইসলামে বিকৃতির অপচেষ্টা করে থাকে। বর্তমানে তাদের এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

[৮৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৩

ইসলামে বাহ্যিকবাদিতার অবস্থান

ইজমা ও ক্বিয়াস শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ। যাহেরী বা বাহ্যিকবাদীদের ভ্রষ্টতার প্রথম কারণ হল, তারা এ দু'টিকে অস্বীকার করে। তারা ক্বিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এবং ইজমার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ইজমার বিরোধীতা করে। এছাড়া আক্বীদাগত ভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বহির্ভূত আক্বীদা পোষণ করে। এ কারণে উলামায়ে কেরাম এ সমস্ত বাহ্যিকবাদীদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নিম্নে এধরণের বাহ্যিকবাদী যারা শুধু কুরআন ও হাদীস অনুসরণের কথা বলে এবং ইজমা, ক্বিয়াসকে অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উপস্থাপন করা হল-

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত হল, এধরণের বাহ্যিকবাদীরা যদি কোন মতপার্থক্য করে কিংবা তারা যদি কোন প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়ের বিরোধীতা করে, তবে তাদের কথা গ্রহণযেগ্য নয় এবং তাদের কথার প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

উলামায়ে কেরামের এ সিদ্ধান্তটির কথা উলেখ করেছেন-

১. আবু ইসহাক ইসফারায়িনী রহ. [মৃত্যু-৩১৬ হিঃ]

আবু ইসহাক (রহঃ) এর এ অভিমতটি উলেখ করেছেন-

১. আলামা ইবনুস সালাহ তাঁর ফতোয়ায়[৯০],
২. ইমাম নববী রহ.[৬৭৬ হিঃ] তাঁর "তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত"[৯১] নামক কিতাবে,
৩. ইমাম যাহাবী রহ. ["সিয়ারু আ'লামিন নুবালা"[৯২]
৪. আলামা ইবনে কাসীর ["তবাকাতুল ফুকাহাশ শাফিয়ীন"[৯৩]
৫. আলামা যারকাশী (রহঃ) ["বাহরে মুহীত"[৯৪]]
৬. আলামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহঃ) ["তবাকুল কুবরা"[৯৫]]

---

[৯০] পৃ.৬৭
[৯১] খ.১, পৃষ্ঠা-১৮৩
[৯২] খ.১৩, পৃষ্ঠা-১০৪
[৯৩] খ.১, পৃষ্ঠা-১৭২
[৯৪] খ.৪, পৃষ্ঠা-৪৭১
[৯৫] খ.২, পৃষ্ঠা-২৮৯

ইমাম নববী (রহঃ) লিখেছেন-

ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور

"কোন মাসআলায় দাউদে যাহিরী (রহঃ) এর বিরোধীতা ঐ বিষয়ে ইজমা সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না"
[আল-মাজমু, খ.২, পৃ.১৫৬]

আলাম্মা যারকাশী (রহঃ) লিখেছেন-

ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء . . . وأخرجوهم من أهل الحل والعقد

"বিশেষক আলেমগণ তাদেরকে ফকীহদের অন্তর্ভূক্ত মনে করে না এবং তাদেরকে গবেষণাধর্মী আলেমদের জামাত থেকে বের করে দিয়েছে"
[আল-বাহরুল মুহীত, খ.৬, পৃষ্ঠা-২৯১]

যাহেরী বা বাহ্যিক বাদীদের কথা পরিত্যাজ্য হওয়ার বিষয়ে আরও যারা অভিমত দিয়েছেন-

১. আলাম্মা ইবনে দাকীক আল-ঈদ রহ. [মৃত্যু-৭০২ হিঃ]
[আল-ইমাম শরহুল ইলমাম, খণ্ড.১, পৃ.৪১৩]
২. আবুল হাসান কারখী রহ. [মৃত্যু ৩৪০ হি:][৯৬]
৩. আবু বকর জাসসাস রহ. [মৃত্যু ৩৭০ হি:][৯৭]
৪. আলাম্মা ইবনু আবিদীন রহ. [মৃত্যু ১২৫২ হি:][৯৮]
৫. কাযী আবু বকর বাকিলানী রহ.[মৃত্যু-৪০৩ হি:][৯৯]
৬. ইবনে বাত্তাল রহ. [মৃত্যু-৪৪৯ হি:][১০০]

---

[৯৬] আল-ফুসুল ফিল উসুল, খ.২, পৃষ্ঠা-২৯৭

[৯৭] আহকামুল কুরআন এর ভূমিকা, তিনি লিখেছেন

لو تكلم داود في مسألة حادثة في عصره وخالف فيها بعض أهل زمانه لم يكن خلافا عليهم

[৯৮] আলাম্মা ইবন আবিদীন, ফতোয়ায় শামী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৯, তিনি লিখেছেন-

أن خلاف الظاهرية لا ينقض إجماع الفقهاء

"যাহেরী (বাহ্যিকবাদীদের) বিরোধীতা ফকীহগণের ইজমার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না ।"

[৯৯] نقله ابن الصلاح في (الفتاوى ص 67)، والقرطبي في (المفهم 1 \ 543)، والزركشي في (البحر المحيط 4 \ 471)، وابن السبكي في (الطبقات الكبرى 2 \ 289). وقارن بما نقله الزركشي عنه في موضع آخر من (البحر المحيط 5 \ 185)

[১০০] বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, শরহু সহীহিল বোখারী, খ.১ পৃ.৩৫২

৭. কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. [মৃত্যু-৫৪৩ হি:][১০১]
৮. আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. [মৃত্যু-৬৫৬ হিঃ][১০২]
৯. আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ রহ. [মৃত্যু-৩০৬ হিঃ][১০৩]
১০. আবু আলী বিন আবী হুরাইরা রহ. [মৃত্যু-৩৪৫][১০৪]
১১. ক্বাযী আবুল হাসান মারুযী রহ. [মৃত্যু-৪৬২ হিঃ][১০৫]
১২. ইমাম গাযালী রহ. [মৃত্যু-৫০৫ হিঃ][১০৬]
১৩. ওয়ালী উল্লাহ ইরাকী রহ. [মৃত্যু-৮২৬ হিঃ][১০৭]
১৪. আবু মানসুর বাগদাদী রহ. [মৃত্যু-৪২৯ হিঃ][১০৮]
১৫. নজমুদ্দিন তুফী রহ. [মৃত্যু-৭১৬][১০৯]

যাহেরী তথা যারা ক্বিয়াস অস্বীকার করে, তাদের কথা পরিত্যাজ্য হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন এর উলেখযোগ্য কিছু কারণ নিম্নে প্রদান করা হল-

أن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء ، بل هم من جملة العوام الذين لا يعتد بخلافهم

এক.

আহলে যাহের তথা বাহ্যিকবাদীরা আলেম এবং ফকীহদের অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং তারা অন্যান্য সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাদের বক্তব্য বা মতানৈক্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।
[আল-মুফহিম, খ.১, পৃষ্ঠা-৫৪৩, ক্বাযী আবু বকর বাকিলানী (রহঃ) এর উক্তি]
বাহ্যিকবাদীরা সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত সুতরাং তাদের কথার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।
[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী (রহঃ), খ.১৩, পৃষ্ঠা-১০৪]

---

১০১ আল-আওয়াছেম মিনাল কাওয়াসেম, পৃষ্ঠা-২৫৭
১০২ المفهم لأبي العباس القرطبي 1 \ 543.)
১০৩ المحمدون من الشعراء للقفطي 2 \ 427
১০৪ نقله عنه ابن الصلاح في (فتاويه ص 67) ، والنووي في (تهذيب الأسماء 1 \ 183
১০৫ [البحر المحيط 4 \ 474 ،
১০৬ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 2 \ 242
১০৭ طرح التثريب شرح التقريب ، لولي الله العراقي 2 \ 37
১০৮ نقله عن أبي منصور ابن الصلاح في (فتاويه ص 67) ، والنووي في (تهذيب الأسماء واللغات 1 \ 183) ، والذهبي في (سير أعلام النبلاء 13 \ 104)
১০৯ التعيين في شرح الأربعين ، للطوفي ص 244

أن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد ، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة ، فبإنكارهم القياس والاجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام ، وكيف يدعون الاجتهاد ، ولا اجتهاد عندهم

দুই.

নিশ্চয় শরীয়তের অধিকাংশ বিষয় ইজতেহাদ দ্বারা প্রমাণিত । বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শরীয়তের এক দশমাংশ বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা (নস) নেই । সুতরাং বাহ্যিকবাদীদের ক্বিয়াস ও ইজতেহাদকে অস্বীকার করার কারণে তারা সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত হবে । আর তারা কিভাবে ইজতেহাদের দাবী করবে? তাদের নিকট তো ইজতেহাদ বৈধ নয়!

[আল-বুরহান, আলামা জুয়াইনী (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা-৮১৮]

তিন.

أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد ، وإنما هو متمسك بالظواهر ، فهو كالعامي الذي لا معرفة له

"যে ক্বিয়াসকে অস্বীকার করে, সে ইজতেহাদের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ; বরং সে বাহ্যিক শব্দের উপর আমলকারী । সুতরাং সে অজ্ঞ-মূর্খ সাধারণ মানুষের অন্তর্ভূক্ত হবে ।

[আল-বাহরুল মুহীত, খ.৪, পৃষ্ঠা-৪৭২]

ولأنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات

চার.

শরীয়তের বিষয়ে তাদের অবস্থান, আকলী বিষয়ে সুফুসতিয়াদের মত ।

[আল-বাহরুল মুহীত, খ.৪, পৃষ্ঠা-৪৭২]

أنهم كالشيعة في الفروع ، ولا يلتفت إلى أقوالهم ، ولا ينصب معهم الخلاف ، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم ، ولا يدل مستفت من العامة عليهم (سير أعلام النبلاء 13 \ 104)

পাঁচ.

শাখাগত বিষয়ে তারা শিয়াদের মত । তাদের কথার প্রতি কর্ণপাত করা হবে না । এবং তাদের মতানৈক্যের দিকেও কোন ভ্রুক্ষেপ করা হবে না । তাদের লিখিত কোন কিতাব সংগ্রহে লিপ্ত হওয়া যাবে না এবং তাদের কথা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের নিকট কোন ফতোয়া প্রদান করা যাবে না ।

[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী (রহঃ), খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-১০৪]

أنهم قد أخذوا هذا القول – نفي القياس – عن النظام من المعتزلة ، وقد كفره جمع من أهل العلم

"ক্বিয়াস অস্বীকারের এ ধারণা মূলতঃ নিজাম মু'তাযেলীর নিকট থেকে নেয়া। আর নিজামে মু'তাযেলীকে অনেক আলেম কাফের বলেছে"
[ফিকহু আহলিল ইরাক ও হাদীসিহিম, আলামা কাওসারী (রহঃ), পৃষ্ঠা-১৭]

أن من أنصف لنفسه علم أن النصوص التي أخذت منها الأحكام لا تفي بعشر معشار الحوادث التي لا نهاية لها ، فما الذي يقوله الظاهري في غير المنصوص إذا أتاه عامي وسأله عن حادثة لا نص فيها ، أيحكم فيها بشيء أم يدع العامي وجهله ؟لا قائل من المسلمين بالثاني ؛ أعني أنا ندع العامي يخبط في دينه ، وإن حكم فيها – والواقع أن لا نص – ؛ فإما أن يقيس ، أو يخترع من نفسه حكما يلزم الناس الأخذ به .إن اخترع من عند نفسه ونسبه إلى الحكم الشرعي كان كاذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وإلا كان ملزما للناس بفلتات لسانه ، فما بقي إلا أنه لا يخترعه من عند نفسه ويقيسه على الصور المنصوص عليها .والظاهري لا يقول بذلك ، فعاد الأمر إلى أنه إما أن يدع العامي يخبط في دينه بما لم ينزل الله به سلطانا ، أو يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أو يلزم الناس بهفواته ، والثلاثة لا يقولها ذو لب – معاذ الله

"একজন বিবেকবান অবশ্যই জানেন যে, যে সমস্ত নস (নির্দেশনা) থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান আহরণ করা হয়, তার সংখ্যা শরীয়তের অসংখ্য উদ্ভূত সমস্যার এক দশমাংশও হবে না। সুতরাং কোন বাহ্যিকবাদীকে যদি কোন সাধারণ মানুষ এমন কোন বিষয় জিজ্ঞেস করে, যার সুস্পষ্ট নির্দেশনা শরয়ী নসে বিদ্যমান নেই, এক্ষেত্রে এ বাহ্যিকবাদী কী করবে? সে কি তাকে কোন ফয়সালা দিবে, না কি অজ্ঞ লোকটিকে তার অজ্ঞতার উপর ছেড়ে দিবে? মুসলমানদের কেউ দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে তাদের অজ্ঞতার উপর ছেড়ে দেয়ার কথা কখনও বলেনি।

এ ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে বাহ্যিকবাদী যদি মাসআলার সমাধান দেয়, তবে হয়ত সে ক্বিয়াসের মাধ্যমে সমাধান দিবে, নতুবা নিজের থেকে মাসআলা তৈরি করবে। এখন বাহ্যিকবাদী যদি নিজের থেকে সমাধান তৈরি করে, তবে এটি হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর ব্যাপারে মিথ্যারোপ। সুতরাং এক্ষেত্রে নিজে মনগড়া কিছু বলা কিংবা ক্বিয়াসের মাধ্যমে ফয়সালা দেয়া ছাড়া কোন পথ থাকে না। আর বাহ্যিকবাদী কেউ এর কোনটিই স্বীকার করে না। সুতরাং এধরণের ব্যক্তিদের জন্য হয়ত সে সাধারণ মানুষকে তাদের অজ্ঞতার উপর ছেড়ে দিবে কিংবা আল্লাহ ও

আলাহর রাসূল (সঃ) এর প্রতি মিথ্যারোপ করে মাসআলা দিবে অথবা নিজের মনগড়া কোন বক্তব্যকে শরীয়ত হিসেবে চালিয়ে দিবে (নাউযুবিলা)। বুদ্ধিমান কেউ এ তিনটির বিষয়ের কোনটির ব্যাপারে ফয়সালা দিবে না।
[আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত, খ.১৩, পৃষ্ঠা-৪৭৫]

أن الظاهرية عندما أنكروا القياس خرجوا عن دائرة العلم ، وأهله وصاروا في دائرة العوام ، أو الجهال أو المبتدعة أو المباهتين أو الكفار والمشركين

“বাহ্যিকবাদীরা যখন ক্বিয়াস অস্বীকার করেছে, তখন তারা ইল্‌ম এবং আলেমদের পরিধি থেকে বেরিয়ে গেছে এবং তারা সাধারণ মানুষ[১১০]কিংবা অজ্ঞ-মূর্খ[১১১], বিদআতী,[১১২] মিথ্যাপূজারী[১১৩] অথবা কাফের মুশরিকদের [১১৪]কাতারে শামিল হয়েছে”

---

[১১০] قاله الجويني في (البرهان 2 \ 818) ، وأبو بكر الباقلاني (وعنه في المفهم 1 \ 543) ، والجصاص في (الفصول 3 \ 296) ، والزركشي في (البحر المحيط 4 \ 472) ، وانظر : سير أعلام النبلاء 13 \ 104 .

[১১১] ওয়াসেতী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মূর্খতার মাঝে অবস্থান করতে চায়, সে যেন দাউদে যাহেরী (রহঃ) এর উপর মাযহাব উপর চলে”
[بواسطة تحرير بعض المسائل ص 51

[১১২] আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) যাহেরী মাযহাবকে রাফেয, খারেযী এবং বাতেনী সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করেছেন। [আল-আওয়াসেম মিনাল কাওয়াসেম, পৃষ্ঠা-২৪৯,২৫৭]
আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) লিখেছেন-
" إن ابن حزم كان في حماية الملوك لما كان يلقي إليهم من شبه البدع ، والشرك "
ইবনে হাযাম (রহঃ) বাদশাহদের তত্ত্বাবধায়নে থেকে তাদের মাঝে বিদআত ও শিরক ছড়াত
বকর বিন বিশরী (রহঃ) যাহেরীদেরকে খারেজী সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করেছেন ।
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাসআলার ক্ষেত্রে যাহেরীদেরকে বিদআতী আখ্যায়িত করেছেন।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২০৭]
[আল-ইহকাম, ইবনে হাযাম যাহেরী, খ.১, পৃষ্ঠা-২৮৯]

[১১৩] আল-বুরহান, আলামা জুয়াইনি (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা-৮১৮

[১১৪] আলামা সাবী তাফসীরে জালালাইনের টিকায় লিখেছেন-
" الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر " অর্থাৎ শুধু কুরআান ও সুন্নাহের বাহ্যিকের আমল করার ধ্যান-ধারণা কুফুরী” কেননা তখন, আলাহ তায়ালার জন্য হাত সাব্যস্ত করা আবশ্যক হবে। মুসা (সঃ) এর ঘটনায় গাছ থেকে আওয়ায আশায় গাছকে খোদা মানা আবশ্যক হয়ে পড়ে (নাউযুবিলাহ)। এ জন্য বিখ্যাত তাফসীর “রুহুল মাআনী” তে আল্লামা আলুসী (রহঃ) বাহিক্যবাদীদেরকে বলেছেন-
الضال المضلل
“অর্থাৎ নিজেও পথভ্রষ্ট, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে” [তাফসীরে রুহুল মা’নী, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৭৬]

আমরা এখানে বাহ্যিকবাদীদের অবস্থান উলেখ করেছি। এটি মূলতঃ আলোচনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা যুগে যুগে যাহেরী মাযহাবের ভ্রান্ত বিষয়গুলোর চর্চা না করার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে একটা চক্র চার মাযহাবের বিকল্প হিসেবে ইবনে হাযাম যাহেরী (রহঃ) এর পরিত্যাজ্য মাযহাবের চর্চা শুরু করেছে। এবং এরা দাবী করে যে, "শুধু কুরআন ও হাদীস মানি, আমরা ক্বিয়াস মানি না"; অথচ বাস্তবক্ষেত্রে এরা কুরআন ও হাদীস অনুসরণের নামে ইসলামে বিকৃতির পথ চালু করছে। এবং বিভিন্ন ধরণের বিকৃত মাসআলা প্রদান করে ইসলামে স্বেচ্ছাচারিতার দ্বার উন্মোচন করছে।

এটি মূলতঃ অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। ড. সাঈদ রমজান বাউতী লিখেছেন-

وجاء رسل الإنجليزو مبشروهم يدخلون بآ فكارهم و آرائهم المخربة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها علي الأزهر و علمائه بإسم الإجتهاد و تحت إمتيازاته...وبهذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن المرأة و الحجاب و بهذا تسلل الإنجليز إلي الأزهر في أشخاص كثيرين من ممثليه و أتباعه و بطانته و بهذا نسخت أحكام و مناهج إسلامية عظيمة بأحكام و مناهج أوربية سخيفة

"ইংরেজদের প্রতিনিধি ও তল্পিবাহক পণ্ডিমাদের বিকৃত চিন্তা-ধারা এবং অসার ধ্যান-ধারণা নিয়ে মিশরের সমাজে আগমন করে। এর জন্য তারা "আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়" এবং আযহারের কিছু আলেমকে "ইজতেহাদ" ও গবেষণার নামে তাদের সমমনা ও অনুগামী বানানোর প্রয়াস পায়। এরই ধারাবাহিকতায় আহমাদ আমীন ইসলামের হিযাব ও পর্দার ব্যাপারে তার চিন্তা-ধারা প্রবেশ করিয়েছে। এই পদ্ধতিতে পণ্ডিমা বিশ্ব ও ইংরেজরা তাদের অনুসারী, অনুগামী এবং সমমনা ব্যক্তিদের মাধ্যমে আল-আযহারে অনুপ্রবেশ করেছে। এভাবে তারা ইসলামের অনেক সুমহান হুকুমকে ইজতেহাদ ও গবেষণার নামে জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং এর স্থলে পণ্ডিমাদের বিকৃত ও অসার ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছে।
[মুহাজারাতুন ফিল-ফিকহিল মুকারিন, ড. সাঈদ রমজান বাউতী, পৃষ্ঠা-৭-৮]

ইসলামী সমাজ এবং ফিকহের ক্ষেত্রে লর্ড ক্রোমার এবং অন্যান্য অরিয়েন্টালিস্টদের প্রচেষ্টায় তারা এমন একটি দল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যাদের মাধ্যমে তারা আক্বীদা ও ফিকহের ক্ষেত্রে গবেষণার নামে ইসলামের মূল ভাবধারায় ঘুণ ধরানোর পথে অনেকটা সফল হয়েছে।

এজন্যই বর্তমানে বিকৃতির পথে অগ্রসরমান এসমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ড. সাঈদ রমজান বাউতি লিখেছেন-

و أما الدعوة إليه بمفهومه الثاني، فهي دعوة باطلة، و شهوة مجردة للتلاهب بالأحكام الشرعية الثابتة و إحتجاج يختبئ من ورائه غرض سيئ

"এজন্যই দ্বিতীয় অর্থে [পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করে] ইজতেহাদের দাবী হল একটি ভ্রান্ত দাবী। এটি নিরেট প্রবৃত্তিপূজা এবং শরীয়তের প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান নিয়ে খেল-তামাশার নামান্তর। এবং এটি এমন একটি বক্তব্য যার অন্তরালে অসৎ উদ্দেশ্য সুপ্ত থাকে।"
[মুহাজারাতুন ফিকহিল মুকারিন, পৃষ্ঠা-৮]

ইজমা ও ক্বিয়াস এবং পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পথ পরিবত্যাগ করে বর্তমানে যারা শুধু কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের দাবী করে, তাদের এ দাবীর পিছে কপটতা লুকিত থাকে। এটি মূলতঃ তাদের মৌখিক দাবী। এর অন্তরালে সুপ্ত থাকে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা আর প্রবৃত্তি পূজা। এদের ক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ) এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

كلمة حق أريد بها الباطل

"কথা সত্য মতলব খারাপ"

ঐক্যের নামে অনৈক্যের ডাক

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন,
When I ask a muslim: what is he? What school of thought do you belong to? What is his mazhab? Most of the Indians tell me: they are Hanafi. Some may say: they are Safii. If I go to outside of the India and I ask this question, beside hanafi, or Safii I get the reply I am Hanboly. Or some may say they are Maleki…

"যখন আমি কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি, সে কোন মাযহাবের? "অধিকাংশ ইন্ডিয়ান বলে যে, তারা হানাফী। কেউ বলে তারা শাফেয়ী। আমি যদি ইন্ডিয়ার বাইরে গিয়ে এ প্রশ্ন করি, তখন হানাফী ও শাফেয়ী ছাড়াও অনেকে উত্তর দেবে যে, তারা হাম্বলী..."

ডাঃ জাকির নায়েক আরও বলেছেন[১১৫]-
Which is better? Hanafi is better or Shafi is better? Most of these groups of Muslims will give the reply "Charu Musalla Bor Haq Hai"- All the four scools of thaougt are on the truth. That is the common reply that all the four scools of thought Hanafi, maleki, Shafi, hanboli, all of these four scools of thought they are BorHaq, they are correct. Some will say Hanafi is right, some say Shafi is right. But the majority says"Charu Musalla Bor Haq Hai" - All the four schools of thought are correct.

কোনটি উত্তম? হানাফী, না কি শাফেয়ী? মুসলমানদের **অধিকাংশ উত্তর দিবে**, চার মাযহাবই সঠিক। সাধারণ উত্তর হল, চার মাযহাব তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী সঠিক। কেউ হয়ত বলতে পারে, হানাফী উত্তম। কেউ হয়ত বলতে শাফেয়ী উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ বলবে যে, চারও বর হক হ্যাঁয় (চারও মাযহাব সঠিক)। চার ইমাম সকলেই সঠিক।"

---

[১১৫] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/
Strickly Following a Madhab _ Dr Zakir Naik _ part - 1 - of - 2 - YouTube_1
http://www.youtube.com/watch?v=6wbBlvZszMA

ডাঃ জাকির বলেছেন, অধিকাংশ মুসলমান চার মাযহাবকে সঠিক বলে থাকে, কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, অধিকাংশ মুসলমান যখন চার মাযহাবকে সঠিক বলছে, আপনি তাকে ভুল বলছেন কেন?

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন, "চারও মাযহাব সঠিক" এটি হল, "কমন উত্তর"। আমাদের প্রশ্ন হল, এটি যদি "কমন রিপাই" হয়ে থাকে, তবে সেটি তাঁর নিকট কেন "আন কমন" মনে হচ্ছে?

ডাঃ জাকির নায়েক বলছেন, ম্যাজোরিটি অফ দ্য মুসিলম উম্মাহ...অর্থাৎ অধিকাংশ মুসলিম চার মাযহাবের অনুসরণ করছে, তখন আমরা বলব, আপনি কেন এই ম্যাজোরিটি থেকে বেরিয়ে আসছেন? অধিকাংশ মুসলমান যখন মাযহাব মানছে, তখন আপনি কেন তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করছেন? যেখানে সুন্নী মুসলমানদের সকলেই (সমগ্র মুসিলম উম্মাহ ৯২.৫ ভাগ এবং অবশিষ্ট ৭.৫ ভাগ শিয়া) চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করছে, তবে মুসলিম উম্মাহের এই বৃহৎ জামাত থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করাটা কি ইসলামে বিভক্তি নয়?

ইসলামের শিক্ষা হল, মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে থাকা আবশ্যক। এর মাঝেই মুসলিম উম্মাহের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে। মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এবং রাসূল (সঃ) এর বিভিন্ন হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ডাঃ জাকির নায়েক যে "ম্যাজোরিটি" এর কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি হল,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"যে কেউ রসূলের (সঃ) বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং **সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে**, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।"
[সূরা নিসা, আয়াত নং১১৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে আলামা ইবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন,

فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة

"উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ মর্যাদা এবং তাদের নবী (সঃ) এর সম্মানের কারণে তাদের ঐকমত্যের বিষয়টি ত্রুটিমুক্ত হওয়ার যিম্মাদারি নেয়া হয়েছে। আর এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।"
[তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪১২]

আলাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

"তোমরা সকলে আলাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্বরণ করো, যা আলাহ তায়ালা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আলাহ তায়ালা তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে, অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আলাহ নিজের নির্দর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার"
[সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং১০৩]

মুফাসসিরগণ আয়াতে উলেখিত "হাবলুলাহ" বা আলাহর রজ্জুর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন হাবলুন অর্থ হল, কুরআন, প্রতিশ্রুতি, মুমিনদের জামাত এবং আলাহ ও আলাহর রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য ইত্যাদি।

তাফসীরে কাবীরে আলামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) এ সকল অর্থের মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলেছেন,

وهذه الأقوال كلها متقاربة ، والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل في البئر يعتصم بحبل تحرزاً من السقوط فيها وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه من السقوط في قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله ، وأمروا بالاعتصام به.

"উলেখিত অর্থগুলো পরস্পর নিকটবর্তী। এক্ষেত্রে সার কথা হল, কুপে নামার সময় কোন ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য যেমন রশির ইত্যাদি বেঁধে নেয় তেমনি কুরআন, আলাহর প্রতিশ্রুতি, তার দ্বীন, তার আনুগত্য এবং **মুমিনদের জামাতের সাথে ঐকমত্য পোষণ** কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামের গভীরে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।"[১১৬]

মুসলমানদের জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর অনেক হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উলেখ করা হল-

১ম হাদীসঃ

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة

"তোমাদের উপর জামাতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। কেননা শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে দূরে থাকে। যে জান্নাতের মাঝখানে অবস্থান করতে চায় সে যেন জামাতকে আঁকড়ে ধরে"[১১৭]

২য় হাদীসঃ রাসূল (সঃ) বলেছেন,

يد الله مع الجماعة

"জামাতের সাথে আলাহর হাত রয়েছে"[১১৮]

৩য় হাদীসঃ

إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه و سلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار

"নিশ্চয় আলাহ তায়ালা আমার উম্মতকে অথবা (রাসূল স. বলেছেন) মুহাম্মাদ স. এর উম্মতে গোমরাহীর উপর একত্রিত করবেন না। মুসলমানদের জামাতের সাথে

---

[১১৬] তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৮

[১১৭] তিরমিযি শরীফ, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং 2165

[১১৮] তিরমিযি, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২১৬৬

আলাহর হাত রয়েছে। যে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে জাহান্নামে নিপতিত হল”[১১৯]

أخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم:(قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন,
তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। তারা হল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত “মুসলমানদের জামাত”[১২০]। আর আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে তাদের প্রবৃত্তিপূজা এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমন জলাতঙ্ক রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে।[১২১]

- হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

"يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمرَ به، وإنّ ما تكرهون في الجماعة والطاعة، هو خيرٌ مما تستحبون في الفرقة"

“হে মানব সকল! তোমাদের জন্য জরুরি হল, আনুগত্য ও মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা এটি আলাহর রজ্জু, যাকে আঁকড়ে ধরার আদেশ তিনি দিয়েছেন। আর তোমরা আনুগত্য ও জামাতবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কোন কিছু অপছন্দ করো সেটি তোমাদের জন্য বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে কোন কিছুকে পছন্দ করার চেয়ে উত্তম।[১২২]
আব্দুলাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন,

إن الجماعة حبلُ الله فاعتصموا مِنه بعروته الوثقى

---

[১১৯] তিরমিযি শরীফ কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২১৬৭
[১২০] আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ
[১২১] কিতাবুস সুন্নাহ, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৪৫৯৭, হাদীসটি হাসান।
[১২২] তাফসীরে তবারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০

"নিশ্চয় মুসলমানদের জামাত হল, আল্লাহর রজ্জু, সুতরাং তোমরা সুদৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরো।
[তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৯]

- আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেছেন,

ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه .

"জামাতকে আঁকড়ে ধরার ফল হল, "আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। এটি পরকালে মুখ ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যম[123]
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-১৭]

- আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আরও বলেন,

" فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب[124]

"নিশ্চয় জামাতবদ্ধ থাকা হল, আল্লাহর রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব"
(মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২১)

লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস বা সালাফীরা সর্বপ্রথম এই আওয়ায তুলেছে যে, 'আমরা কোন মাযহাব মানি না বরং আমরা শুধু কুরআন ও হাদীস মানি।' এই শ্লোগানের দিয়ে তারা মুসলমানদের মাঝে নতুন একটা দল সৃষ্টি করেছে।

লা-মাযহাবীরা মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে তারা কি মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখেছে, না কি মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করেছে? তাদের বই পড়ে দেখুন! অনেকেই মাযহাবীদেরকে কাফের, মুশরিক ইত্যাদি বলে থাকে। আর এটি তাদের নিকট একটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা নিজেরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে একদল অপর দলকে কাফের

---

[১২৩] مجموع الفتاوى ج1، ص.17
[১২৪] مجموع الفتاوى ج3، ص.421

বলছে। ডাঃ জাকির নায়েক "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ"[১২৫] শিরোনামের লেকচারে বলেছেন-

Ahle Hadith, which Ahle Hadith? In Bombay there are two Ahle Hadith, Jamiete Ahle Hadith, and Gurba Ahle Hadith. Which Ahle Hadith do you belong to? One Ahle Hadith is blaming the other Ahle Hadith.
"আহলে হাদীস! কোন আহলে হাদীস? বোম্বেতে আহলে হাদীসদের দু'টি দল রয়েছে, ১.জমিয়তে আহলে হাদীস ২.গুরবা আহলে হাদীস। তুমি কোন আহলে হাদীসের কোন গ্রুপের? এক আহলে হাদীস আরেক আহলে হাদীসকে দোষী সাব্যস্ত করছে"[১২৬]

তিনি আরও বলেছেন,

In the Ahle Hadith, I went to Kashmir, there are many groups of Ahle Hadith, I went to Kerala, Mujahidin - KNM, Kerala Nadvathul Mujahideen.
There, people don't call themselves Ahle Hadith - Mujahideen. If you go to Saudi Arabia and say: I am Ahle hadith, what is this new Ahle hadith? Very few people of Saudis know who that Ahle Hadith. For them they know the Salafi. But Salafi and Ahle hadith belong to the same, groups or names are different. In some country Ansari, why?

"আহলে হাদীসদের মাঝেও অনেক গ্রুপ রয়েছে। আমি কাশ্মীরে গিয়েছি, সেখানে আহলে হাদীসদের অনেক গ্রুপ। আমি কেরালায় গিয়েছি, সেখানে তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে না। তারা কেরালা নাদভাটুল মুজাহিদিন (কে.এন.এম) নামে পরিচিত। আপনি যদি সউদি যান সেখানে গিয়ে যদি বলেন, "আমি আহলে হাদীস, তারা বলবে, এ নতুন আহলে হাদীস আবার কারা? অধিকাংশ আরব জানে না যে, আহলে হাদীস কি? তারা সালাফী গ্রুপকে চেনে।

---

[১২৫] আহলে হাদীস ও সালাফীদের সম্পর্কে ডাঃ জাকির নায়েকের এ আলোচনাটি ইউটিউবে নিম্নের শিরোনামের পাওয়া যাবে- Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0

[১২৬] আহলে হাদীস ও সালাফীদের সম্পর্কে ডাঃ জাকির নায়েকের এ আলোচনাটি ইউটিউবে নিম্নের শিরোনামের পাওয়া যাবে- Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0

যদিও সালাফী ও আহলে হাদীস একই দল, এদের নাম ভিন্ন। আবার দেখা যায়, একই দেশে এদের কোন গ্রুপের নাম আনসারী, এটি কেন?[১২৭]

সালাফীদের সম্পর্কে ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন,

Sheikh Nasiruddin Albani says we should call ourselve salafi. My question is which Salafi, my counter question Do you know how many Salsfi are there? Are you Kutubi, Sururi, or Madkhali. I can name another Salafi.
"শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) বলেন, আমাদের নিজেদেরকে সালাফী বলা উচিৎ। আমার প্রশ্ন হল, কোন্ সালাফী? আমার উল্টো প্রশ্ন, তুমি কি জানো, সালাফীদের কতগুলো গ্রুপ আছে? তুমি কি "কুতুবী, সুরুরী না কি মাদখালী? আমি সালাফীদের আরও অনেক গ্রুপের নাম বলতে পারব।"[১২৮]

"But even in Salafi there are various groups and if you go to U.K. Mashallah! Subhanallah! Allahu Akbar! There are so many groups. In U.K each group fighting against the other, calling the other Salafia kafir, Nauzubillah! . . . Which salafia do you belong to?

"সালাফীদের নিজেদের মধ্যেই অনেক গ্রুপ রয়েছে। তুমি যদি যুক্তরাজ্যে যাও, মাশাআল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! সেখানে সালাফীদের অনেক গ্রুপ। একদল আরেকদলকে কাফের বলে তাদের সাথে ফাইট করছে, নাউযুবিল্লাহ! সুতরাং তুমি কোন সালাফী?[১২৯]

সালাফীদের যদি এ অবস্থা হয়, তবে তারা চার মাযহাব ছেড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে মুসলিম উম্মাহের ক্ষতি হয়েছে, না কি লাভ হয়েছে? মুসলিম উম্মাহ কি এক প্লাটফরমে এসেছে? না কি তাদের অনৈক্য আরও বেড়েছে? তাদের দাবী হল, আমরা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস মানব, তবে তাদের মাঝে এত

[১২৭] আহলে হাদীস ও সালাফীদের সম্পর্কে ডাঃ জাকির নায়েকের এ আলোচনাটি ইউটিউবে নিম্নের শিরোনামের পাওয়া যাবে- Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0
[128] http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0
[১২৯] http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0

গ্রুপিং কেন? আর ডাঃ জাকির নায়েক তাদের প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম উম্মাহের ঐক্যের ডাক দিলেন না কি অনৈক্যের?

ডাঃ জাকির নায়েক তার শ্রোতাদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলেছেন। তাঁর শ্রোতা যদি দশ হাজার থাকে, তবে দেখা যাবে, কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে দশ হাজার মাযহাব গড়ে তুলবে। পরিণতি এক। পৃথিবীতে তখন চার মাযহাব থাকবে না, এরকম হাজার হাজার গ্রুপের সৃষ্টি হবে। এই বাস্ত বতাকে কোন বিবেকবান মানুষই অস্বীকার করতে পারবে না।

ডাঃ জাকির নায়েক ইসলামে অন্যের অনুসরণ বা তাকলীদকে বৈধ মনে করেন না। তিনি মনে করেন, প্রত্যেককে সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে হবে। অথচ আমরা দেখি, তিনি তার লেকচারে কিংবা প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইলের সমাধান দিয়ে থাকেন। তিনি কেন এ সমস্ত মাসআলার সমাধান দেন? কারও জন্য যদি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) প্রদত্ত মাসআলা গ্রহণে সমস্যা থাকে, তবে ডাঃ জাকির নায়েকের মাসআলা গ্রহণে আপত্তি থাকবে না কেন? কাউকে যদি অনুসরণ করা অবৈধ হয়ে থাকে, তবে তিনি কেন প্রশ্নকারীকে বলে দেন না, আপনি কুরআন ও হাদীস দেখে নিন! ডাঃ জাকির নায়েক তো এমন কোন সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন নি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাসআলায় ভুল হলেও তার মাসআলায় কোন ভুল হবে না?

ডাঃ জাকির নায়েকের একটি একটি অনুষ্ঠানে হাজার হাজার শ্রোতা থাকে। তিনি তাদের সবাইকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলছেন। শ্রোতাদের অধিকাংশ এমন যে, কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করা তো দূরে থাক, সঠিকভাবে কুরআন ও হাদীস পড়ারই যোগ্যতা রাখে না। এদেরকে তিনি যখন কুরআন ও হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দিলেন, তখন প্রত্যেকেই সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে প্রতিটি মাসআলা বের করে করে আমল করবে। শরীয়তের বিষয়ে এধরণের অজ্ঞ লোকেরা যখন কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে নিজেদের মতামত পেশ করতে থাকবে, তখন তাদের মাঝে কি একটি মতবাদ থাকবে না কি হাজারটা মতবাদের সৃষ্টি হবে? এতে কি এক মাযহাব থাকবে না কি কয়েক হাজার কিংবা

কয়েক লক্ষ মাযহাবের সৃষ্টি হবে? যেই ঐক্যের ডাকের পরিণতি হল মহা অনৈক্য, সেটিকে কিভাবে ঐক্য বলা যায়?

আর যদি ডাঃ জাকির নায়েক মনে করেন যে, তার শ্রোতারা চার মাযহাবের অনুসরণ না করে তাঁর দেয়া মাসআলার উপর আমল করবে, তবে আমরা বলব, তিনি নিজেই শরীয়তের বিষয়ে অন্যকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েকের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তার পক্ষে যেমন শরীয়তের বিষয়ে কোন মাসআলা দেয়া জায়েয নয়, তেমনি তার শ্রোতাদের কারও জন্যও কোন মাসআলার ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা বৈধ নয়। তিনি যদি মাসআলা দেন আর তার শ্রোতারা তার কথার উপর আমল করে, তবে এক্ষেত্রেও তো অন্যের অনুসরণ বা তাকলীদ করা হল, যা তার দৃষ্টিতে অবৈধ। অথচ আমরা দেখি, তিনি তার লেকচারে বিভিন্ন মাসআলা প্রদান করে থাকেন। তিনি কেন এধরণের স্ববিরোধীতার আশ্রয় নেন?

ডাঃ জাকির নায়েক মাযহাবের অনুসরণকে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করেছেন। মূলতঃ তাকলীদ তথা মাযহাবের অনুসরণ মুসলমানদের অনৈক্যের কোন কারণ নয়। মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ এর উপর ঐকমত্যের সাথে আমল করে আসছে। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, চার মাযহাবের অনুসরণ করেই মুসলিম উম্মাহ নিজেদের ঐক্য ও সংহতিকে টিকিয়ে রেখেছে। একই সাথে তারা হজ্ব পালন করে, একই সাথে তারা সালাত আদায় করে, একই ইমামের পিছে কেউ আস্তে আমীন বলছে, কেউ জোরে আমীন বলছে, কিন্তু কেউ কখনও কাউকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলে না যে, তুমি ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব অনুসরণ করে জোরে আমীন বললে কেন, তুমি ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুসরণ করে আস্তে আমীন বললে কেন?

আমরা জানি যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আলাহর অশেষ মেহেরবানীতে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তাবলীগ জামাতের সকলেই কি এক মাযহাবের অনুসারী? কখনও নয়। তাদের মাঝে কেউ হানাফী, কেউ শাফেয়ী, কেউ মালেকী..। কিন্তু চার মাযহাব হওয়ার কারণে তাদের মাঝে কখনও কি কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে? মাযহাব অনুসরণ করেও আল-হামদুলিলাহ সকলেই ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে।

সুতরাং শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে চার মাযহাব পরস্পর অনৈক্যের স্বীকার, এ দাবী করা নিতান্তই অযৌক্তিক; বরং যারা মুসলিম উম্মাহকে এক করার মানসে নতুন মাসআলা–মাসাইল দিতে শুরু করেছে, তারাই আরেকটা দল সৃষ্টি করে বসেছে।

চার মাযহাব অনুসরণ করা যাবে না, বর্তমান সময়ে এ আওয়ায তুলেছে, সালাফী বা আহলে হাদীসগণ। তারা মানুষকে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের উপর আমল করার আহক্ষান করলেও নিজেরা অধিকাংশ মাসআলায় তাদের সমমনা কোন আলেমের বক্তব্য অনুসরণ করে থাকে।

এ সম্পর্কে ড.ইউসুফ আল-কারযাভী তার এক সাক্ষাৎকারে[১৩০] বলেছেন,
প্রশ্নঃ কিছু কিছু দায়ী রয়েছেন, যারা মুসলিম উম্মাহকে এক হওয়ার মতামত পেশ করে থাকেন। এবং 'ইসলামী সমাজে যে কোন ধরণের অনৈক্য নিষিদ্ধ' এ বক্তব্য জোরালভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। সুতরাং মুসলিম সমাজ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত থাকাটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এবং তারা বলে থাকেন, ইসলাম ঐক্য ও সংহতির ধর্ম। সমস্ত মানুষ একই চিন্তাধারায় পরিচালিত হবে এবং একই দল ও মতের অনুসারী হবে; যারা হবে আলাহর দল বা হিযবুলাহ্। সুতরাং তারা মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐক্যের জোর দাবী জানিয়ে থাকেন।

উত্তরঃ উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ ইউসুফ আলকারজাবী বলেছেন-

أجاب الدكتور القرضاوي : أنا أقول هناك فرقاً كبيراً بين الاختلاف والتفرق، هناك اختلاف مشروع وهناك تفرق ممنوع، الاختلاف المشروع اختلاف الناس في الآراء وفي السياسات، وفي المناهج وفي هذه الأشياء .. ممكن الناس تختلف في الأهداف، تتكون جماعات، وتتكون أحزاب لها أهداف مختلفة، أو ترتيب الأهداف؛ جماعة يرون الاقتصاد أولاً، وجماعة تقول لا الأخلاق أولاً، وجماعة تقول لا الوحدة أولاً، وجماعة تقول لا الثقافة أولاً .. !!

---

[১৩০] কাতার ভিত্তিক আল-জাযিরা টি.ভি চ্যানেলের, সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম "শরীয়ত ও জীবন" (আশ-শরীয়াতু ওয়াল হায়াতু) এ ড. ইউসুফ কারযাবীর সাক্ষাৎকার। আলোচ্য বিষয়,موقف الإسلام من الأحزاب والتعددية السياسية
http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/632.html

“আমি বলব, মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। একদিকে মতপার্থক্য শরীয়তে বৈধ এবং দলাদলি শরীয়তে অবৈধ। শরীয়তসম্মত মতপার্থক্য হল, মানুষের মতামত, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য। উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিরূপণে মানুষের মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হওয়াটাও স্বাভাবিক। একদলের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অন্য দল থেকে ভিন্ন হতে পারে। কোন দল অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিবে, কোন দল চারিত্রিক পবিত্রতাকে গুরুত্ব দিবে। কোন বিশেষ দল হয়ত বলবে, সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হল, ঐক্য। হয়ত কোন দল বলবে, না, বরং সাংস্কৃতিক বিকাশই মুখ্য!

ডাঃ কারযাবী আরও বলেছেন-

المهم سيظل الناس يختلفون، هذا الاختلاف ليس تفرقاً، اختلاف
رؤى، لا بد للناس أن تختلف، بعدين نعرض هذا على الناس ليرى الناس أينا أولى بالتقديم وأينا أولى بالتأخير ..!
ما تقوله قاله بعض الناس في الاختلاف الفقهي؛ يعني هناك دعوة من بعض الناس لإزالة المذاهب الفقهية، ناس يسموهم اللامذهبيين، يقول لك: المذاهب ده فرقت المسلمين، إيه معنى مالكي، وشافعي، وحنبلي، وإباضي، وزيدي وكذا .. كل ده يجب أن يزول، والناس على مذهب واحد .. !

“বিবেচনার বিষয় হল, এজাতীয় ক্ষেত্রে মানুষ মতপার্থক্য করতে থাকবে। এধরণের মতপার্থক্য তাফার্‌রুক বা দলাদলি সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এটি হল, মতের বিভিন্নতা, যা স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ।

তবে ফিকহী মাসআলা–মাসাইলের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য রয়েছে, সে ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য কী? একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা ফিকহী মাযহাবসমূহকে মূলোৎপাটিত করতে চায় এবং নিজেদেরকে লা-মাযহাবী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা আপনাকে বলবে, মাযহাবসমূহ! সে তো মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করেছে এবং তারা উদ্দেশ্য নেয় মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, ইব্বাজী, যায়দী ইত্যাদি। সবগুলো দূরীভূত হওয়া আবশ্যক এবং সব মানুষকে এক মাযহাবের অনুসারী হতে হবে!

তিনি পরবর্তীতে বলেছেন-

تكون النتيجة أن هؤلاء الناس الذين يدعون إلى إلغاء المذاهب يزيدون المذاهب مذهباً واحداً، كما نقول نحن: المذهب الخامس، هم في الحقيقة ده يقولوا آراء، وإلهم بعض الشيوخ، وإلهم بعض الاجتهادات يجتمعون على هذه الاجتهادات، فأصبح مذهباً جديداً ..! إذا زدنا المذاهب مذهباً لم نزل الخلاف، ومحاولة إزالة الخلاف بين الناس لا يزيد الناس إلا فرقة، طبيعة الناس لازم تختلف ..!

Òdj GB `uvwo‡q‡Q †h, †hmgস্ত লোক মাযহাব মূলোৎপাটনের দাওয়াত দিয়ে থাকে, তারা আরেক নতুন মাযহাবের সূচনা করে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে তারা পঞ্চম মাযহাবের অবতারণা করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও নিজেদের মনগড়া বক্তব্য পেশ করে থাকে, কখনও কোন শায়খের উক্তি বর্ণনা করে, কখনও কোন ইমামের ইজতেহাদের সাথে একমত হয় এবং এভাবে এক নতুন মাযহাবের সৃষ্টি করে। এভাবে আমরা যদি মাযহাবসমূহের উপর আবার নতুন মাযহাব সৃষ্টির পিছে পড়ি, তাহলে উম্মাহের মাঝে অনৈক্য বাড়বে, তারা আরও বেশী বিভেদে লিপ্ত হবে। মানুষের প্রকৃতিই সেক্ষেত্রে অনৈক্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে।

الصحابة اختلفوا، الصحابة كانوا مختلفين، سيدنا عمر بن عبد العزيز قال: ما أحببت أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنه لو لم يختلفوا لكان أمراً واحداً، ومنهجاً واحداً، أما وقد اختلفوا فقد فتحوا لنا باب اليسر والسعة، تختار أي واحد من الصحابة، فتحوا لنا باب تنوع المنازع وتعدد المشارب

"সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মতপার্থক্যে করেছেন, তারা মতপার্থক্য করতেন। উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেছেন, রাসূলের সাহাবীরা (রাঃ) মতপার্থক্য না করুক এটি আমি পছন্দ করি না। কেননা তাদের মধ্যে যদি মতপার্থক্য না থাকত, তাহলে একটিই মাত্র পদ্ধতি থাকত, একটি মাত্র তরিকা থাকত। কিন্তু তারা মতপার্থক্য করেছেন এবং আমাদের জন্য প্রশস্ততার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তুমি যে কোন একজন সাহাবীকে অনুসরণ কর। তারা আমাদের জন্য বিবিধ উৎস ও বিবিধ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিম্নে লিখিত উপসংহারে আসতে পারি–

১. শাখাগত মাসআলা-মাসাআইলের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহের মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা কোন অনৈক্য ও ফেরকাবাজী সৃষ্টি করে না। এবং একে অনৈক্য ও ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত মনে করা নিতান্ত বোকামী। মূল কারণ বাদ

দিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করা দূরদর্শীতা ও রাজনৈতিক অপরিপক্বতাকে আরও প্রকট করে তোলে।

২. চার মাযহাবকে উৎপাটিত করার দাওয়াত মূলতঃ মানুষকে নতুন এক মাযহাব সৃষ্টির দাওয়াত দেয়ারই নামান্তর। কেউ যদি এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে, সেও নতুন কোন মাযহাব প্রবর্তনে আগ্রহী।

৩. মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের ডাক দিয়ে তাদের মধ্যে একটা গৌণ বিষয় নিয়ে তুলকালাম সৃষ্টি করে ফেতনার কুরুক্ষেত্র তৈরিই বা কতটা যুক্তিসঙ্গত। ঐক্যের এটি কোন পদ্ধতি? যে ঐক্যের ডাকের পরিণতি হল মহা অনৈক্য, সেই ঐক্যই বা কোন ধরণের ঐক্য?

৪. ডাঃ জাকির নায়েকের বাতলান ঐক্যের স্বরূপ তো আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তিনি যে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন, সেই একই ডাক দিয়ে সালাফী, লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীসগণ খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তারা নিজেরাই বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে কাফের বলে থাকেন (নাউযুবিলাহ্)। সুতরাং যেই ঐক্যের ফল হল, মুসলিম উম্মাহের মাঝে নতুন নতুন ফেতনার জন্মদান এবং সাধারণ মুসলমানদের অনিশ্চয়তার হাতে সমর্পণ, সেটা কিভাবে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐক্য হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এবং Unity in the Muslim Ummah এর যৌক্তিকতা বা কোথায়?

লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীসদের অভিযোগ হল, মুসলমানরা চার মাযহাব মেনে ইসলামে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। এক নবী, এক কুরআন, তবে চার মাযহাব মানব কেন ইত্যকার হাজারও প্রশ্ন তারা করে থাকে।

আমাদের জিজ্ঞাসা হল, তারা যে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, তারা নিজেরা তার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছে? তাদের মাঝে কি এমন কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারে?

তিক্ত হলেও সত্য যে, সালাফীরা নিজেদের মাঝে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবী করেছে তার কিয়দাংশও কখনও বাস্তবায়ণ করতে সক্ষম হয়নি, বরং তারা মুসলিম উম্মাহের মাঝে ফেতনার জন্ম দিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহকে আরও বিভক্ত করেছে।

ডাঃ জাকির নায়েক শাখাগত বিষয়ের মতভেদকে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এবং তাঁর নিকট এ অনৈক্য থেকে মুক্তির পথ হল, শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ।
ডাঃ জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর সালাফীরা এ বিষয়টির জোর প্রচারণনা চালিয়ে থাকেন যে, শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অসুরণ করলেই মুসলিম উম্মাহের মাঝে কোন অনৈক্য থাকবে না। কিন্তু সালাফীদের এ দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ বাস্তবতার পরিপন্থি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, সালাফী আলেমগণের মাঝে মতভেদ। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

ডাঃ জাকির নায়েকের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন, শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ)। আলবানী (রহঃ) সম্পর্কে ডাঃ জাকির বলেছেন, তিনি সাগরতুল্য হলে জাকির নায়েক তার তুলনায় এক ফোঁটা পানির সমতুল্যও নন। বর্তমান সময়ে সালাফীদের ইমামতুল্য আলেম শায়খ নাসীরুদ্দিন এবং অপরাপর উলামাদের মাঝে মতনৈক্যের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল–

১. আলামা ইবনে হাযাম (রহঃ) গান-বাদ্য ইত্যাদিকে জায়েয মনে করতেন অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) গান-বাদ্য ইত্যাদিকে হারাম মনে করেন।
২. আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ও আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তিন তালাক একত্রে দিলে এক তালাক হওয়ার পক্ষে। অথচ আলামা ইবনে হাযাম যাহেরী একে তিন তালাক মনে করেন এবং মহিলার অন্যত্র বিবাহ না দেয়া পর্যন্ত পূর্বের স্বামীর জন্য তাকে বৈধ মনে করতেন না।
৩. আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) সফরের সময় দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার পক্ষে ছিলেন না, অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী সেটাকে বৈধ মনে করেন।
৪. আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, আরাফার দিনে গোসল করা রাসূলের সুন্নত অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী একে বিদআত বলেন।

৫. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু করা মুস্তাহাব অথচ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী বলেন, ওযু করা ওয়াজিব ।
৬. শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করাকে বৈধ মনে করেন অথচ শায়খ সালে আল উছাইমিন একে অবৈধ মনে করেন ।[১৩১]

সালাফীরা যাদেরকে তাদের অনুসরণীয় মনে করে থাকে, তাদের মাঝে যখন বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে, তখন এ দাবী করা নিতান্তই অযৌক্তিক যে, শুধু কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করলে মুসলিম উম্মাহের মাঝে কোন অনৈক্য থাকবে না ।

প্রকৃতপক্ষে শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামদের মাঝে যে মতানৈক্য রয়েছে, একে উলামায়ে কেরাম উম্মতের জন্য রহমত মনে করেছেন । সুতরাং যেই বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ এবং মুসলিম উম্মাহের মাঝে স্বীকৃত, সে বিষয়কে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করা, নিতান্ত বোকামী । কেননা চার মাযহাব অনুসরণের কারণে মুসলিম উম্মাহের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছে, এটি যেমন প্রমাণিত নয়, তেমন চার মাযহাবকে পরিত্যাগ করলেই যে কোন অনৈক্য হবে না, এরও কোন নিশ্চয়তা নেই । ডাঃ জাকির যখন মাসআলা দেন, তখন তিনি দাবী করেন যে, তিনি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে মাসআলা দিচ্ছেন, কিন্তু ডাঃ জারিক নায়েক প্রদত্ত অধিকাংশ মাসআলা সমগ্র বিশ্বের উলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । তিনি যেমন এ দাবী করতে পারেন না যে, তিনি যা বলবেন সেটিই সঠিক এবং এর উপর তার অনুসারীরা আমল করলে কোন অনৈক্য থাকবে না, তেমনি পৃথিবীর কোন আলেমই এ দাবী করতে পারেন না যে, তার দেয়া মাসআলার উপর আমল করলে কোন অনৈক্য থাকবে না ।

যারা জগদ্বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং যারা যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন, তাদের মাঝে যখন মতানৈক্য হয়েছে, তখন বর্তমান সময়ে মাযহাবকে মূলোৎপাটিত করে কার মতের উপর একমত হওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়?

---

[১৩১] আল- আলবানী শুযুযুহু ও আখতাউহু, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫

ডাঃ জাকির নায়েক যদি উদ্দেশ্য এই নিয়ে থাকেন যে, মানুষ মাযহাব ছেড়ে তাঁর দেয়া ফতোয়ার উপর আমল করবে, তবে মুসলিম উম্মাহ সেটা গ্রহণ করে সকলেই ডাঃ জাকির নায়েকের ভক্ত হয়ে যাবে, এটা অসম্ভব ও অকল্পনীয়। এখন তিনি যদি সালাফীদের কোন আলেম যেমন শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী, শায়েখ ইবনে উছাইমিন (রহঃ) এর অনুসরণের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তবে আমরা বলব, দেখুন অসংখ্য মাসআলায় তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। সব মাসআলায় সালাফী আলেমগণ একমত হয়ে যাবেন, এটি একটি অকল্পনীয় ও অসম্ভব বিষয়। আমরা এখানে এ জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি-

প্রথম উদাহরণঃ

"সম্প্রতি ১৪৩০ হি. মোতাবেক ২০০৯ সালে ড. সাদ ইবনে আব্দুলাহ আলবারীকের দুই খণ্ডের একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। যার নাম
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني و إبن عثيمين و إبن باز رحمهم الله تعالي
কিতাবটির পৃষ্ঠা ৮শ'র অধিক।

কিতাবটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই কিতাবে তিনি এমন কিছু মাসআলা উলেখ করেছেন, যেসব মাসআলায় এ যুগের তিনজন সম্মানিত সালাফী আলেম: শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুলাহ বিন বায রাহ.(১৩৩০-১৪২০ হি.) শায়খ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে উছাইমীন রাহ. (১৪২১ হি.) ও শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০) এর মাঝে মতভেদ হয়েছে।"[১৩২]

এ তিনজনই কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী ছিলেন। তবে তাদের মাঝে কেন মতানৈক্য হল? তারা তো আধুনিক প্রযুক্তির যুগের আলেম, যে সম্পর্কে জাকির নায়েক বলেছেন, বর্তমান সময়ে এক মিলিওন হাদীস এক ডিস্কে পাওয়া যায়। ডাঃ জাকির নায়েকের বক্তব্য অনুযায়ী উপর্যুক্ত সালাফী শায়েখদের মাঝে কোন ধরণের মতভেদ থাকাটা অসম্ভব ছিল, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল, তাঁদের মাঝেও মতভেদ হয়েছে।

---

[১৩২] উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা, মাওলানা আব্দুল মালেক, পৃষ্ঠা-৬৯

দ্বিতীয় উদাহরণঃ

শায়েখ সালেহ আল-উছাইমিন (রহঃ) যিনি বিখ্যাত সালাফী আলেম, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বেশ কিছু মাসআলা থেকে ফিরে এসেছেন কিংবা কোন মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন। এ মাসআলাগুলি সম্পর্কে

ما رجع عنه إبن عثيمين أو توقف فيه

নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। শায়খ সালেহ আল-উছাইমিন আধুনিক প্রযুক্তির যুগের আলেম। তিনি হাদীস অনুসরণের ব্যাপারে যথেষ্ঠ রক্ষণশীল ছিলেন। অথচ সকল হাদীসের কিতাব এবং উলামায়ে কেরামের মতামত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের থেকে এমন মতামত প্রকাশিত হয়েছে, যা থেকে পরবর্তীতে তারা নিজেরাই ফিরে এসেছেন কিংবা ঐ ব্যাপারে কোন মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন।

তিনি কোন মাযহাবী আলেম নন যে, সালাফী বন্ধুগণ তার সম্পর্কে অভিযোগ করার সুযোগ পাবেন। তিনি একজন বিখ্যাত সালাফী আলেম। একইভাবে অনেক মাসআলায় শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীও পূর্বের মত থেকে ফিরে এসেছেন। মূলতঃ মতপার্থক্য হওয়া কিংবা একই মাসআলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত থাকার বিষয়টি এতটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কেউই এর থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

একইভাবে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী অনেক মাসাআলায় পূর্বের মত থেকে ফিরে এসেছেন এবং নতুন কোন মাসআলা দিয়েছেন অথবা সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি।

তৃতীয় উদাহরণঃ

কোন হাদীসের উপর আমল করার পূর্বশর্ত হল, হাদীসের সনদে কোন দুর্বলতা আছে কি না, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া অর্থাৎ হাদীসটি কোন স্তরের, সেটি কি সহীহ, যয়ীফ, কিংবা মওযু এসম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা। সুতরাং হাদীসের উপর আমল হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) বিখ্যাত সালাফী আলেম। বর্তামানে তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। তিনি পৃথিবী বিখ্যাত অনেক মুহাদ্দিসের হাদীসকে যয়ীফ কিংবা মওযু বলেছেন।

এমনকি তিনি নিজেও একজন স্ববিরোধী ছিলেন। কোন কিতাবে কোন একটি মাসআলা প্রমাণ করতে গিয়ে একটি সহীহ হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, আবার অন্য কিতাবে সে হাদীসকেই সহীহ বলেছেন। এভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন। দু'একটি হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন, বিষয়টি এমন নয়, বরং তিনি অসংখ্য হাদীসে এধরণের স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন।

এ সম্পর্কে যে কিতাবগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে-

1. আল আলবানী, শুযুযুহু ওয়াখতাউহু।
2. "تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف[133]
3. التعقب المتواني على السلسلة الضعيفة للألباني
4. السبل الوضيحة ببيان أوهام الألبانى بين الضعيفة والصحيحة[134]
5. تراجعات الشيخ الألباني من خلال موقع الدرر السنية[135]
6. "تصحيحُ حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والردّ على الألباني في تضعيفه"
7. "التعريفُ بأوهام من قسم (السنن) إلى صحيح وضعيف"[136]
8. "التعقّبُ الحثيث على من طعن فيما صحَّ من الحديث"[137]
9. "تعقباتٌ على: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) للألباني"[138]
10. "التعقباتُ المليحة على: (السلسلة الصحيحة)"[139]
11. "تناقضاتُ الألباني الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات"[140]
12. "تنبيهُ القارئ على تقوية ما ضعفه الألباني"[141]
13. "تنبيهُ القارئ لتضعيف ما قواه الألباني"[142]

---

১৩৩ أبو الحسن الشيخ طبع بعناية دار المعارف بالرياض اختصره : محمد بو عمر

১৩৪ المؤلف: أحمد شحاته الاسكندري

১৩৫ كتبه: عَبْد الله بن محمد زُقَيْل
zugailam@islamway.net

১৩৬ لمحمود سعيد ممدوح

১৩৭ عبدالله الحَبَشيّ الهَرَري

১৩৮ إسماعيل بن محمد الأنصاري رَحِمَهُ اللهُ

১৩৯ للشيخ: **عبدالله بن صالح العبيلان**

১৪০ للحسن بن علي السقاف

১৪১ عبدالله بن محمد الدويش رَحِمَهُ اللهُ.

১৪২ عبدالله بن محمد الدويش رَحِمَهُ اللهُ

14. [143]"جزءٌ فيه الردّ على الألباني وبيان بعض تدليسه وخيانته"
15. [144]"تنبيهُ المسلم إلى تعدي الألباني على: (صحيح مسلم)"
16. [145]"صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم"
17. [146]"نظراتٌ في: (السلسلة الصحيحة) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني"
18. [147]تراجع العلامة الألباني فيما نص عليه تصحيحاً وتضعيفا
19. [148]النصيحة في بيان الأحاديث التي تراجع عنها الألباني في الصحيحة
20. [১৪৯] 500حديث مما تراجع عنها العلامة المحدث الألباني في كتبه

সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েক যদি চার মাযহাব ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেটা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি অন্য কোন সালাফী আলেমের অনুসরণের বিষয়টিও মতানৈক্য থেকে মুক্ত নয়।

তবে তিনি চার মাযহাব ছেড়ে মুসলিম উম্মাহকে কিসের দিকে দাওয়াত দিলেন? তিনি নিজেই কি কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী? না কি সালাফী ও আহলে হাদীসদের মাযহাব গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, যারা নিজেরাই একে অপরকে কাফের বলে?

---

[১৪৩]عبدالله بن الصديق الغماري

[১৪৪] محمود سعيد ممدوح

[১৪৫] حسن بن علي السقاف

[১৪৬]للشيخ: أبي عبدالله مصطفى العدوي، وخالد بن أحمد المؤذن

[১৪৭]جمع وإعداد:أبو الحسن محمد حسن عبد الحميد الشيخ
الناشر: مكتبة المعارف الرياض
عدد الأجزاء: صدر منه حتى الآن جزءان ،
صدر الأول عام ১৪২৩هـ في ৩৫০صفحة ، وصدر الثاني عام ১৪২৪هـ في ৪৩৭ صفحة.

[১৪৮] لأبي عمر حاي بن سالم الحاي
دار النفائس بالكويت
عام ১৪১৩

[১৪৯]جمعه : عوده بن حسن بن عوده
إصدار : ((دار النفائس - الأردن)) ১৪২৪هـ

ইসলামে মতানৈক্য বা মতভেদ

ডাঃ জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজী বা দলাদলির অন্ত র্ভূক্ত মনে করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াত উলেখ করেছেন এবং দু'টি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামে মতানৈক্য বা মতভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আরবী ভাষায় 'মতানৈক্য বা মতপার্থক্য বোঝাতে' 'ইখতিলাফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর ইখতেলাফের পারিভাষিক অর্থ হল,

الاختلاف والمخافة ان ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله او في قوله

"ইখতিলাফ বা মতানৈক্য হল, বিশেষ কোন অবস্থা কিংবা বক্তব্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিপরীত বিষয়টি গ্রহণ করা।"

মতানৈক্য বা মতপার্থক্য একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আলাহ পাক মানুষের বর্ণ, ভাষা, চাহিদা-রুচি সবক্ষেত্রে ভিন্নতা দিয়ে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব বিবেচনা বুঝশক্তি। বুদ্ধি-বিবেচনার পার্থক্যের কারণে মানুষের চিন্তা-চেতনায় সেই পার্থক্য সু-স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেক্ষেত্রে মতানৈক্য আবশ্যক বা ফরয। কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যে ক্ষেত্রে মতানৈক্য হারাম। কোন কোন ক্ষেত্রে মতানৈক্য বৈধ সীমার মধ্যে থাকে। কোন ক্ষেত্রে মতানৈক্য ই কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে বিষয়টির ব্যাপকতার কারণে প্রত্যেক বিষয়ের মতনৈক্যের সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল-

প্রবৃত্তি তাড়িত মতাক্যৈঃ

কখনও মতানৈক্য মানুষের প্রবৃত্তির তাড়নায় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে যেহেতু প্রবৃত্তির ইচ্ছাই মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে এজন্য এধরণের মতাক্যৈ কল্যাণকর কিছু থাকে না। এসম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হল,

- আলাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বলেছেন,

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

"ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না"

- পবিত্র কুরআনের সূরা আন-আমের ৫৬ নং আয়াতে আলাহ্ পাক বলেছেন,

قل لا أتبع اهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين

"হে নবী! আপনি বলুন, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না, আর যদি আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি, তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ব। অথচ আমি হেদায়াতপ্রাপ্তদের একজন।"

যেহেতু স্বেচ্ছাচারিতা ও নফসের কামনার বহুবিধ দিক রয়েছে এবং এর উৎস প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, এজন্য বিষয়টি খুবই নাজুক। বাহ্যিক কিছু নিদর্শনের সাহায্যে বিষয়টি নিরূপণ করা সম্ভব। যেমন-

১. মতানৈক্যর বিষয়টি সরাসরি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের বিরোধী হওয়া। (যেখানে দ্বিমত পোষণের কোন সুযোগ নেই)
২. পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথ, যার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই, সে ব্যাপারে বিপরীত বক্তব্য পেশ করা, যার কোন প্রমাণ সরাসরি কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস কোনটিতে বিদ্যমান নেই।
৩. সুস্থ বিবেক যে বিষয়টি অসম্ভব ও অবৈধ মনে করে। যেমন, এমন মতবাদ যাতে যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মতানৈক্য ঃ

যে মতাক্যৈ মানুষের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে না বরং যা নিরেট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেক্ষেত্রে কারও স্বার্থ চিন্তার লেশমাত্রও থাকে না, এ ধরণের বিষয়ে মতানৈক্য করা আবশ্যক। যেমন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে একজন মুসলমানের মতানৈক্য। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতির সাথে একজন মুসলমানের মতানৈক্য আবশ্যক। এ ব্যাপারে কোন প্রকার শিথিলতার কোন অবকাশ নেই।

মনে রাখতে হবে, তাদের সাথে মতানৈক্যের অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে সত্যের দিকে আহক্ষান করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ রয়েছে। তারা তাদের কুফরী, শিরকী, বিদআতী আক্বীদা ত্যাগ করে ইসলামের সুস্পষ্ট বাণীকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। বরং মতানৈক্যের মূল বিষয় হল, ইসলামের সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস এবং তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের মাঝে।

দোদুল্যমান মতানৈক্য ঃ

যে সমস্ত বিষয়ে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ উভয়ের সম্ভাবনা থাকে যেমন শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের মাঝে ইখতেলাফ, এধরণের মতানৈক্য দোদুল্যমান। এখন যদি মতানৈক্য দলিলের দাবী অনুযায়ী, তার আদব এবং সুনির্দিষ্ট মূলনীতির আলোকে হয়ে থাকে এবং দলিলের আলোকে সত্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং ইসলামী আইন শাস্ত্রের বহুমূখী সম্ভাবনার একটি উত্তম উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি কোন মূলনীতি (اصول) ছাড়া, ইখতেলাফের আদব রক্ষা ছাড়া, এধরণের মতানৈক্য করা হয়, তবে অবশ্যই তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হবে।

ফিকহ শাস্ত্রে অসংখ্য মাসআলায় উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন নামাযের শেষে জোরে আমিন বলা, ইমামের পিছে মুক্তাদীর ক্বিরাত পড়া, রক্ত বের হলে ওযু ভাঙা ইত্যাদি।

এসমস্ত বিষয়ের মতভেদ দোদুল্যমান। কেননা সাধারণভাবে এটি প্রশংসনীয়। কিন্তু কেউ যদি অন্যকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে এধরণের মতানৈক্যে লিপ্ত হয়, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয় হবে।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল, মতানৈক্যের যেসমস্ত আদব রয়েছে সেগুলো রক্ষা করা হচ্ছে কি না। যদি মতানৈক্যের আদব রক্ষা না করে মতানৈক্য করা হয়, তবে এধরণের মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখনই সে মতানৈক্যের মাঝে অমূলক উক্তি ও শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করবে, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠবে, সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মূলতঃ এ মতানৈক্য নয় বরং এটি প্রবৃত্তি পূজার অংশ। যেমন, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ তার বিখ্যাত কিতাব, আসরুল হাদিসিশ শরীফ... এর ভূমিকায়

লিখেছেন, এক যুবক তার নিকট এসে মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইলে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। এবং বড় বড় আলেমদের নাম বিকৃত করে উচ্চারণ করতে থাকে। যেমন, আলাম্মা ইবনুল হুমাম (রহঃ) এর নাম সে ব্যঙ্গ করে, ইবনুল হাম্মাম (বাথরুমের ছেলে) বলে।

অতএব, শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে মতভেদের ক্ষেত্রে আবশ্যকভাবে মুসলমানদের পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। শাখাগত মাসআলায় মতভেদ যদি মুসলমানদের মাঝে হিংসা-দ্বেষ ও পারস্পারিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

উসুলে দ্বীন বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতপার্থক্যঃ
দ্বীনের যে সমস্ত বিষয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য বা মতপার্থক্যের কোন সুযোগ নেই। অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত এ সকল বিষয়ে যে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে, সেই কাফের হয়ে যাবে। উদাহরণঃ

১. আলাহর অস্তিত্ব।
২. আলাহর একত্ববাদ।
৩. আলাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস।
৪. আলাহর প্রেরিত কিতাব সমুহের প্রতি বিশ্বাস।
৫. ফেরাশতাদের প্রতি বিশ্বাস।
৬. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস।
৭. তাকদীরের উপর বিশ্বাস।

অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় মৌলিক আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোর ব্যাপারে যদি কেউ মতানৈক্য করে, তবে যে সঠিক অবস্থানে থাকবে, সে মু'মিন এবং যে ভুল অবস্থানে থাকবে, সে কাফের।

অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত শাখাগত বিষয়ঃ
দ্বীনের শাখাগত যে সমস্ত বিষয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, এ সমস্ত বিষয়ে কেউ যদি মতানৈক্য করে, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে।
উদাহরণঃ

১. নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এগুলো ফরয হওয়া।

২. যিনা হারাম হওয়া ।
৩. মদ হারাম হওয়া ইত্যাদি ।

শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে মতপার্থক্যঃ

দলিল অস্পষ্ট থাকার কারণে শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে মতপার্থক্য সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ বরং অনেকক্ষেত্রে তা উম্মতের জন্য রহমত ও প্রশস্ততার কারণ ।

এ ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর যামানায় বনী কুরায়যার ঘটনা সুস্পষ্ট প্রমাণ । এছাড়াও সাহাবীরা এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, তাদের মধ্যে শাখাগত মাসআলা মাসাইলের বিষয়ে যে মতানৈক্য রয়েছে, যেমন, ঈবাদাত, বিবাহ, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন, দান, রাজনীতি ইত্যাদি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাহাবী তার ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবে ।

ইসলামে শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে যে মতানৈক্য রয়েছে, এটি মূলতঃ মুসলিম উম্মাহের জন্য রহমত ও প্রশস্ততার কারণ ।

শাখাগত
বিষয়ে মতপার্থক্য উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন,

مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَالْعَمَلُ بِهِ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنِّي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي . إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ , فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ , وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ

"তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং তার উপর আমল করা আবশ্যক। সেটি ত্যাগ করার ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বিষয়টি আল্লাহর কিতাবে না থাকে, তবে আমার সুন্নতের অনুসরণ করবে। যদি আমার পক্ষ থেকে কোন সুন্নত না থাকে, তবে আমার সাহাবীরা যা বলে তার উপর আমল করবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকাতুল্য। তাদের মধ্য থেকে যাকেই অনুসরণ করবে, হেদায়েত পেয়ে যাবে। আমার সাহাবীদের মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত।[১৫০]

১. আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহঃ) "জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়াফাজলিহি" নামক কিতাবে লিখেছেন,

رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْ مِثْلِ قَوْلِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : لَقَدْ نَفَعَ اللَّهُ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَعْمَالِهِمْ , لَا يَعْمَلُ الْعَامِلُ بِعَمَلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ فِي سِعَةٍ[151]

"তাবেয়ী কাসেম বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) এর সাহাবীগণের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তার মাঝে মানুষের উপকার নিহিত রেখেছেন। সাহাবীদের কোন

---

[১৫০] الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي – (ج 1 / ص 116) برقم(101) والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي – (ج 1 / ص 114) برقم(113) وسنده واه

[১৫১] جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر برقم(1052) وهو صحيح مقطوع

একজনের আমল অনুযায়ী কেউ যদি আমল করে, তবে সে ব্যাপক প্রশস্ততা দেখতে পাবে।"

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَخْتَلِفُوا ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ , وَأَنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ , فَلَوْ أَخَذَ أَحَدٌ بِقَوْلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَانَ فِي سِعَةٍ .[152]

- উমর ইবনে আব্দুল আযীয় (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম মতপার্থক্য না করুক, এটি আমি পছন্দ করি না। কেননা যদি একটি মত থাকত, তবে মানুষ সংকীর্ণতায় নিপতিত হত। রাসূল (সঃ) এর সাহাবীগণ হলেন, হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম; যারা আমাদের অনুসরণীয়। কেউ যদি তাদের কোন একজনের কোন বক্তব্যের উপর আমল করে, তবে সে ব্যাপক প্রশস্ততার মাঝে থাকবে।

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَوْسِعَةٌ , وَمَا بَرِحَ الْمُفْتُونَ يَخْتَلِفُونَ , فَيُحَلِّلُ هَذَا وَيُحَرِّمُ هَذَا , فَلَا يَعِيبُ هَذَا عَلَى هَذَا , وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا .[153]

- হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন,

"উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য প্রশস্ততার কারণ। যুগে যুগে মুফতীগণ (দলিলের ভিত্তিতে) মতানৈক্য করেছেন। সুতরাং কারও নিকট একটি বিষয় জায়েয, অপরের নিকট তা হারাম; অথচ তারা একে অপরকে এ কারণে দোষারোপ করেন না।"

وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ – لَا مُطْلَقِ الِاخْتِلَافِ – مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ فَإِنَّ اخْتِلَافَهُمْ تَوْسِعَةٌ لِلنَّاسِ . قَالَ : فَمَهْمَا كَانَ الِاخْتِلَافُ أَكْثَرَ كَانَتْ الرَّحْمَةُ أَوْفَرَ[154]

- আলামা ইবনু আবিদীন (রহঃ) বলেছেন, শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে দু'জন মুজতাহিদের মধ্যকার মতপার্থক্য রহমতস্বরূপ। অন্যান্য বিষয়ের মতানৈক্য

---

[১৫২] جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر – (ج 3 / ص 120)والموافقات في أصول الشريعة – (ج 3 / ص 79و83) وبرقم(1055) وهو صحيح مقطوع

[১৫৩] المقاصد الحسنة للسخاوي – (ج 1 / ص 58) برقم (39) وكشف الخفاء من المحدث – (ج 1 / ص 73) برقم(153) وهو صحيح عنه

[১৫৪] حاشية ابن عابدين 46/1 و رد المحتار – (ج 1 / ص 168)

এর ব্যতিক্রম। কেননা শাখাগত মাসআলায় মতানৈক্য হওয়াটা মূলতঃ মানুষের জন্য প্রশস্ততার দ্বার উন্মোচন।"

তিনি আরও বলেন, সুতরাং মাসআলা-মাসাইলে মতপার্থক্য যত বেশি হবে, রহমতের ধারা তত ব্যাপক হবে।"
যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, হাফেযে হাদীস আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ) বলেছেন,
اعلم أن اختلاف المذاهب في الملة نعمة كبيرة ، وفضيلة عظيمة ، وله سر لطيف أدركه العالمون ، وعمي عنه الجاهلون ، حتى سمعت بعض الجهال يقول : النبي (صلى الله عليه و على آله و سلم) جاء بشرع واحد ، فمن أين مذاهب أربعة ؟. !

"মুসলিম উম্মাহের মাঝে বিভিন্ন মাযহাব থাকা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত এবং এর তাৎপর্য ও মর্যাদাও ব্যাপক। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির মাঝে সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত আছে, যা আলেমগণ অনুধাবন করে থাকেন এবং অজ্ঞ লোকেরা এ ব্যাপারে অন্ধ থেকে যায়। এমনকি আমরা কোন কোন মূর্খ লোকের মুখে শুনে থাকি, হুজুর (সঃ) এক শরীয়ত নিয়ে এসেছেন সুতরাং চার মাযহাব কোত্থেকে উদয় হল?"[১৫৫]

তিনি আরও বলেন,
وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة (رضى الله عنهم و ارضاهم) ، وهم خير الأمة ، فما خاصم أحد منهم أحداً ، ولا عادى أحد أحداً ، ولا نسب أحد أحداً إلى خطأ ولا قصور

"সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর মাঝে শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে; অথচ তারা উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানব। তারা একে অপরের সাথে এ বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হতেন না এবং কেউ কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন না। এবং এক সাহাবী আরেক সাহাবীকে ভ্রান্ত কিংবা ত্রুটিযুক্ত মনে করতেন না"[156]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে যে মতানৈক্য রয়েছে, সেটি উম্মতে মুসলিমার জন্য রহমতস্বরূপ। অথচ ডাঃ জাকির নায়েক দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য এবং শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্যকে একই পালায়

---

[১৫৫] জাযিলুল মাওয়াহিব ফি ইখতিলাফিল মাযাহিব, পৃষ্ঠা-২৫
[১৫৬] প্রাগুক্ত

মেপেছেন এবং উভয়টিকে হারাম মনে করেছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি মাযহাবী মতানৈক্যকেও হারাম মতানৈক্যের অন্তর্ভূক্ত মনে করেছেন। যা একটি চরম ভ্রান্তি ।

শাখাগত বিষয়ে সাহাবীদের মাঝে মতভেদ

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর মাঝে শাখাগত বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইলে মতপার্থক্য ছিল। এখানে এধরণের মতপার্থক্যের কয়েকটি উদাহরণ উলেখ করা হল-

২. তাকবীরে তাশরীকের ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝে মতভেদ ছিল।[১৫৭] (আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা (ফতোয়ায়ে আলমগীর), খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৫)
৩. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিবাহ করা যাবে কি না, এব্যাপারে মতভেদ ছিল।[১৫৮]
৪. আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাসের তাশাহুদ ভিন্ন।
৫. আমীন আস্তে বলা, জোরে বলা নিয়ে মতভেদ ছিল।[১৫৯]
৬. হাত উঠান, না উঠানোর বিষয়ে মতভেদ ছিল।[১৬০]
৭. কোন কোন সাহাবী নামাযে বিসমিলাহ পড়তেন, কোন কোন সাহাবী নামাযে বিসমিলাহ পড়তেন না।[১৬১] [মাজমুউল ফাতাওয়া]
৮. কোন কোন সাহাবী নামাযে জোরে আওয়ায করে "বিসমিলাহ" পড়তেন, কোন কোন সাহাবী আস্তে আওয়ায করে বিসমিলাহ পড়তেন। কেউ কেউ ফযরের নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়তেন, কেউ কেউ তা পড়তেন না।[১৬২] (তিরমিযি শরীফ, হাদীস নং ৪০৩)
৯. কোন কোন সাহাবী সিঙ্গা, বমি ইত্যাদিতে ওযু করতেন, কোন কোন সাহাবী ওযু করতেন না।[১৬৩] [মাজমুউল ফাতাওয়া, আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫]

---

[১৫৭] الفتاوى الهندية – (ج 3 / ص 185) و الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 10 / ص 270)

[১৫৮] انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة – (ج 5 / ص 8083) و الفتاوى الهندية – (ج 4 / ص 124

[১৫৯] موطأ مالك – (ج 2 / ص 430) برقم(5) وصحيح البخاري برقم (5114) وصحيح مسلم برقم(3512

[১৬০] مجموع الفتاوى – (ج 22 / ص 286) ومجموع فتاوى ابن تيمية – (ج 5 / ص 166) والفتاوى الكبرى – (ج 2 / ص 258)

[১৬১] انظر مجموع الفتاوى – (ج 22 / ص 279) و (ج 23 / ص 374) وفتاوى يسألونك – (ج 4 / ص 26)

[১৬২] سنن الترمذى برقم(403) ومصنف عبد الرزاق مشكل – (ج 2 / ص 453) برقم(4946–4980)

[১৬৩] مجموع الفتاوى – (ج 23 / ص 375) وفتاوى يسألونك – (ج 4 / ص 26

১০. কোন কোন সাহাবী পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে এবং কামোত্তেজনা সহ মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে ওযু করতেন, কোন কোন সাহাবী ওযু করতেন না ।[১৬৪] [মাজমুউল ফাতাওয়া, আলাম্মা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৫২৪]

১১. কোন কোন সাহাবী আগুনে জ্বালান খাবার খেলে ওযু করতেন কোন কোন সাহাবী করতেন না[১৬৫] (হুজ্জাতুলাহিল বালেগা, শাহ ওয়ালিউলাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহঃ), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০১)

১২. কোন কোন সাহাবী উটের গোশত খেলে ওযু করতেন, কোন কোন সাহাবী করতেন না[১৬৬] [মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫]

---

[১৬৪] مجموع الفتاوى – (ج 20 / ص 524) و(ج 23 / ص 375) وفتاوى يسألونك – (ج 6 / ص 298)

[১৬৫] فتاوى يسألونك – (ج 6 / ص 298) وحجة الله البالغة للدهلوي – (ج 1 / ص 101)

[১৬৬] مجموع الفتاوى – (ج 23 / ص 375) وفتاوى يسألونك – (ج 4 / ص 27)

শাখাগত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে মতভেদ দূর করা অসম্ভব

ডাঃ জাকির নায়েক সহ অপরাপর সালাফীগণ মনে করে থাকেন, মাযহাবের অনুসরণ পরিত্যাগ করে সরাসরি কুরআন ও হাদীস মানলে হয়ত কোন মতপার্থক্য থাকবে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা বাস্তবতার বিপরীত। চার ইমাম যেমন স্বেচ্ছায় কোন মাসআলায় মতপার্থক্য করেননি বরং দলিলের দাবী অনুযায়ী তাদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে, তেমনি হক্বপন্থী কোন আলেমই স্বেচ্ছায় মতপার্থক্য করেন না। সুতরাং এ ধারণা পোষণ করা অমূলক যে, আধুনিক টেকনোলজির যুগে সমস্ত কিতাবাদি আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে, সুতরাং বর্তমানে কোন মতানৈক্য হবে না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল- সালাফীদের বিখ্যাত তিন আলেম শায়েখ আব্দুলাহ বিন বায (রহঃ), শায়েখ সালেহ আল-উছাইমিন (রহঃ) এবং শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর মাঝে অসংখ্য মাসআলায় মতপার্থক্য। নিম্নে এধরণের কয়েকটি মাসআলা উলেখ করা হল-

মাসআলা	ইবনে বায (রহঃ)	ইবনে উছাইমিন (রঃ)	আলবানী (রহঃ)
দাঁড়ি এক মুষ্ঠির বেশি হলে তা কাটার হুকুম	কোন অবস্থাতেই দাঁড়ি কাটা জায়েয নয়, যদিও তা এক মুষ্ঠির বেশি হয়।	কোন অবস্থাতেই দাঁড়ি কাটা জায়েয নয়।	সাহায়ে কেরাম (রাঃ) এর যুগ থেকে প্রচলিত সুন্নত হল, দাঁড়ি এক মুষ্ঠির বেশি হলে, তা কেটে ফেলা।
মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার হুকুম	যে সমস্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা হয়, তাদের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে। অন্যথায় তা পবিত্র হবে না।	যে সমস্ত প্রাণী জবাই করার দ্বারা হালাল হয়, সেসমস্ত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে। অন্যথায় তা পবিত্র হবে না।	যে কোন চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে, যদিও তা শুকরের চামড়া হোক।
ওযুতে বিসমিলাহ পড়ার হুকুম।	উচ্চারণসহ ওযুতে বিসমিলাহ পড়া ওয়াজিব।	বিসমিলাহ পড়া সুন্নত।	বিসমিলাহ পড়া ওয়াজিব।
ওযুতে ধারবাহিকতা রক্ষার হুকুম	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়।
নাপাকী অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করার হুকুম।	নাপাকী ছোট হোক কিংবা বড়, কোন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়।	কোন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়।	যে কোন নাপাকী অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয।
অবজ্ঞা কিংবা অলবসতা বশতঃ নামায তরক কারীর হুকুম।	সুনিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে।	সাধারণভাবে নামায তরক কারী মুরতাদ হয়ে যাবে।	অলসতা বশতঃ নামায তরক কারী কাফের নয়।

মাসআলা	ইবনে বায (রহঃ)	ইবনে উছাইমিন (রঃ)	আলবানী (রহঃ)
মুক্তাদীর জন্য আমীন বলার হুকুম		ইমাম আমীন বললে মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা সুন্নতে মুয়াক্কাদা ।	ইমাম আমীন বললে মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা ওয়াজিব ।
জোরে আওয়ায বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম ।	যে কোন নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ।	যে কোন নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব ।	মুক্তাদি শুধু আস্তে আওয়ায বিশিষ্ট নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে । জোরে আওয়ায বিশিষ্ট নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না । (কেননা এ হুকুমটি তাঁর নিকট রহিত)
পানাহার ব্যতীত অন্য কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের হুকুম ।	পানাহার সহ কোন কাজেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয নয় ।	পানাহার ব্যতীত অন্যান্য কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয ।	স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা হারাম । তবে পানাহার ব্যতীত অন্যান্য কাজে রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয ।
রুকু থেকে দাঁড়িয়ে হাত বাঁধার হুকুম ।	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নত ।	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নত ।	রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধা বিদআত
তারাবীহের নামাযে রাসূল (সঃ) থেকে প্রমাণিত রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নামায আদায়ের হুকমু ।	রাসূল (সঃ) থেকে প্রমাণিত রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নামায আদায় করার ব্যাপারে সুযোগ রয়েছে । কেউ যদি অতিরিক্ত আদায় করে তবে কোন সমস্যা নেই । তবে উত্তম হল, অতিরিক্ত না করা ।	রাসূল (সঃ) থেকে প্রমাণিত রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নামায আদায় করার ব্যাপারে সুযোগ রয়েছে । কেউ যদি অতিরিক্ত আদায় করে তবে কোন সমস্যা নেই । তবে উত্তম হল, অতিরিক্ত না করা ।	রাসূল (সঃ) থেকে প্রামাণিত রাকাতের (এগার রাকাত) চেয়ে অতিরিক্ত পড়া জায়েয নেই ।
কতটুকু পথ অতিক্রম করলে মুসাফির হবে?	অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত হল, সফরের দূরত্বের পরিমাণ হল, প্রায় আশি কিলোমিটার ।	সফরের দূরত্বের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই । এটি প্রচলিত রীতির উপর নির্ভর করবে ।	সমাজের প্রচলন অনুযায়ী দূরত্ব নির্ধারিত হবে ।

আমরা এখানে সামান্য কয়েকটি মাসআলা[১৬৭] উলেখ করেছি। মূলতঃ সালাফী আলেমদের মাঝেও অসংখ্য মাসআলায় মতপার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং শুধু কুরআন ও হাদীস অনুসরণ করলেই যে সব ধরণের মতপার্থক্যের অবসান ঘটবে, এ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই অযৌক্তিক। চার ইমামের মতপার্থক্য যদি ইসলামে অনৈক্যের কারণ হয় এবং তাদের কোন একটি মাযহাবের অনুসরণ যদি কুফুরী, শিরকী হয়, তবে সালাফী তিন আলেমের মাঝে যে তিন মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কী বলা হবে?

সুতরাং শাখাগত বিষয়ে মাযহাবের বিরুদ্ধে প্রচারণা বা বিষোদগার করার পূর্বে অন্তঃত এতটুকু চিন্তা করা দরকার যে, চার মাযহাবের তুলনায় আমাদের অবস্থান কোথায়? যেই মতভেদের দোষে চার মাযহাবকে দুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, সেই মতভেদ থেকে পৃথিবীর কোন ফকীহই বেঁচে থাকতে পারবে না। সুতরাং অনৈক্যের কথা বলে চার মাযহাবের মূলোপাটনের চেষ্টা করার চেয়ে গঠনমূলক কাজে নিজের মেধাটা ব্যয় করা অধিক কল্যাণকর।

---

[১৬৭] এ ব্যাপারে দলিলসহ আলোচনা করেছেন, ড.সা'য়াদ বিন আব্দুলাহ আল-বারীক।"সম্প্রতি ১৪৩০ হি. মোতাবেক ২০০৯ সালে ড. সাদ ইবনে আব্দুলাহ আলবারীকের দুই খ-ের একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। যার নাম

الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني و إبن عثيمين و إبن باز رحمهم الله تعالي

কিতাবটির পৃষ্ঠা ৮শ'র অধিক।

কিতাবটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এই কিতাবে তিনি এমন কিছু মাসআলা উলেখ করেছেন, যেসব মাসআলায় এ যুগের তিনজন সম্মানিত সালাফী আলেম: শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুলাহ বিন বায রাহ.(১৩৩০-১৪২০ হি.) শায়খ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ ইবনে উছাইমীন রাহ. (১৪২১ হি.) ও শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০) এর মাঝে মতভেদ হয়েছে।"

চার মাযহাব কি
কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত?

ডাঃ জাকির নায়েক ইসলামে যে কোন ধরণের মতপার্থক্যকে হারাম বলেছেন এবং এই হারাম ফেরকাবাজীর মধ্যে তিনি চার মাযহাবকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াত উলেখ করেছেন। এবং উভয় আয়াতের ক্ষেত্রে মনগড়া তাফসীর করেছেন। যেটি হারাম নয় সেটিকে হারামের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

অথচ পৃথিবীর কোন মুফাসসির উক্ত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যায় শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের মতানৈক্যকে অন্তর্ভূক্ত করেন নি। বরং তারা ডাঃ জাকির নায়েকের বক্তব্যের বিপরীত অর্থই প্রদান করেছেন; অথচ ডাঃ জাকির নায়েক একেবারে মনগড়া ব্যাখ্যা করে চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। একটি হালাল ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে হারাম বলা বড় বড় কবিরা গোনাহের অন্তর্ভূক্ত। এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিৎ।

ডাঃ জাকির নায়েক তার বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াত এবং সূরা আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন।

ডাঃ জাকির নায়েক তার Sectarian Madhabs_Groups শিরোনামের লেকচারে[১৬৮] বলছেন,

"The answer is given in the Glorious Qur'an, in Surah Al Imran, Ch. No. 3, V. No. 103, it says ...(Arabic)... 'Hold to the rope of Allah strongly, and be not divided'. Which is the rope of Allah? The Glorious Qur'an, is the rope of Allah (swt). It says that the Muslims should hold to the rope of Allah... the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith, and they should not be divided. And the Qur'an says as I mentioned earlier, in Surah Anam, Ch. 6, V. 159, that... 'Anyone who divides the Religion into sects - you have nothing to do with him. Allah will tell him about their affairs, on the day of judgment'. That means, it is prohibited for anyone to make sects in the Religion of Islam. But

---

168 http://www.youtube.com/watch?v=QhCKCVO5sSA

when you ask, certain Muslims...'What are you?' Some say...'I am a Hanifi', some say...'I am Shafi', some say...'I am a Hambli', some say... 'I am a Maliki'. What was our beloved Prophet ? Was he Shafi ?... was he Hambli ?... Was he Maliki ?... What was he ?

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন-"তামরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর। এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না" আল্লাহর রজ্জু কী? পবিত্র কুরআন হল আল্লাহর রজ্জু। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হল, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরা উচিৎ এবং বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ছয় নং সূরা, আল-আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন,
"হে নবী যে ইসলাম ধর্মে কোন ধরণের বিভক্তির বা দলাদলির চেষ্টা করে তার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।"

"ইসলামে বিভক্তি বা দলাদলি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এটি হারাম। কিন্তু আমরা যখন কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কে? কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজী কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, তিনি কি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন। তিনি কি ছিলেন?

আমরা এখানে উল্লেখিত আয়াত দু'টির সঠিক উদ্দেশ্য ও তাফসীর নিয়ে আলোচনা করব-

সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের তাফসীরঃ

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-ইমরানেরন ১০৩ ং আয়াতে বলেছেন,
"তোমরা সকলে্ আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না"
এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পর তাফাররুক তথা বিভক্তি সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন ।

এ আয়াতে বিভক্তি বা ফেরকা সৃষ্টির যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এটি আসলে কোন ধরণের বিভক্তি উদ্দেশ্য?
ডাঃ জাকির নায়েক এ আয়াতে ব্যাখ্যায় ইসলামে "মুসলামন" ব্যতীত যে নামই প্রদান করা হবে, তাকেই ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত মনে করেছেন । তিনি বলেছেন,
See, whatever label you give, there is bound to be Tafarraqa

"মুসলমানদেরকে মুসলিম ব্যতীত অন্য যে নামই প্রদান করা হবে, তা কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত হবে ।"[১৬৯]

ডাঃ জাকির নায়েক শুধু হানাফী, শাফেয়ী...এগুলোকেই ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত মনে করেন নি বরং তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকেও ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত মনে করেছেন ।

বিজ্ঞ পাঠক! এখানে আমাদের জন্য লক্ষণীয় বিষয় হল-এ আয়াত দুটির ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ কী লিখেছেন এবং এ আয়াতগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা কী, ডাঃ জাকির নায়েক যেভাবে আয়াত দু'টি দ্বারা চার মাযহাবকে হারাম ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন, এটি আসলে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি না । ডাঃ জাকির নায়েক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এধরণের ব্যাখ্যা পৃথিবীর কোন মুফাসসির যদি প্রদান করতেন এবং শাখাগাত বিষয়ের মতানৈক্যকে হারাম বলতেন, তবে ডাঃ জাকির নায়েকের বক্তব্য মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকত না । কিন্তু ডাঃ জাকির নায়েক

---

[১৬৯] Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH – YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0
ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ,

কুরআনের নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য তথা মাযহাব সমূহকে হারাম বলেছেন। অথচ মুফাসসিরগণ সংশিষ্ট আয়াত দু'টির যে ব্যাখ্যা উলেখ করেছেন, ডাঃ জাকির নায়েক সম্পূর্ণ তার বিপরীত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

কুরআনের বিখ্যাত ব্যখ্যাগ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবীতে আবু আব্দুলাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ কুরতুবী এ আয়াতের ব্যখ্যায় বলেছেন,

ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والاغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر،وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متآلفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختلاف أمتي رحمة) وإنما منع الله اختلافا هو سبب الفساد.

অর্থাৎ তোমরা বিভক্ত হয়ো না, এর সম্ভাব্য অর্থ হল- তোমরা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। বরং তোমরা আলাহর দ্বীনের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকো। সুতরাং এ আয়াতে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা এবং বিভক্তি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। **কুরআনের এ আয়াত ফুরূ তথা শাখাগত মাসআলা-মাসাঈলের ক্ষেত্রে যে মতবিরোধ রয়েছে, তা নিষিদ্ধ করা হয়নি**। কেননা মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃত অর্থে কোন অনৈক্য নয়। কেননা প্রকৃত অনৈক্য হল সেটিই, যার কারণে পারস্পারিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট থাকে না ও পারস্পারিক মিলন সম্ভব না হয়। কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য দেখা যায়, এটি মূলতঃ শরীয়য়তের আবশ্যক বিধান সমূহ কুরআন ও হাদীস থেকে বের করার ক্ষেত্রে জটিলতা এবং শরীয়তের নির্দেশনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম নিত্য-নতুন মাসআলার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন; অথচ তারা একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাসূলুলাহ সলালাহ আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন,

“আমার উম্মতের মধ্যে [মাসআলার ক্ষেত্রে] যে মতপার্থক্য তা আলহর পক্ষ থেকে রহমত। সুতরাং আলহা তায়ালা ঐ অনৈক্যকে নিষিদ্ধ করেছেন যা বিশৃংখলা ও ধ্বংসের কারণ হবে। [তাফসীরে কুরতুবী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৪]
আলামা আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) এর তাফসীরঃ

আলামা আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর " আহকামুহুস সুগরা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

((ولا تفرقوا)): يعني في العقائد: و قيل: لا تحاسدوا... وقيل : المراد التخطئة في الفروع، أي: لا يخطيء أحدكم صاحبه، و ليمض كل واحد علي اجتهاده، فإن الكل معتصم بحبل الله، و عامل بدليله. و التفرق المنهي عنه ما أدي إلي الفتنة و التشتيت؛ وأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة، لقوله عليه السلام(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد[170]

"তোমরা বিভক্ত হয়ো না, অর্থাৎ আক্বীদার ক্ষেত্রে তোমরা বিভক্ত হয়ো না। অথবা তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা করো না। অথবা শাখাগত বিষয়ে একে অপরকে ভুল সাব্যস্ত করো না। অর্থাৎ শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে ভুল সাব্যস্ত করবে না বরং প্রত্যেকেই তার ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবে। কেননা এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই আলাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং প্রত্যেকেই দলিলের উপর আমল করছে। আর এখানে যেই দলাদলির কথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটি হল, সেই ফেরকাবাজী মুসলমানদের মাঝে ফেতনা এবং বিভক্তির কারণ হয়। কিন্তু শাখাগত বিষয়ের মতানৈক্য মূলতঃ শরীয়তের সৌন্দর্য। কেননা রাসূল (সঃ) বলেছেন,

"কোন ফয়সালাকারী যদি ইজতেহাদ করে এবং তার ইজতেহাদ ঠিক হয়, তবে সে দু'টি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি সে ইজতেহাদ করে এবং তার ইজতেহাদ যদি ভুল হয় তবে সে এক সওয়াবের অধিকারী হবে।"
[আহকামুস সুগরা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) তিনটি বিষয় উলেখ করেছেন,

১. তোমারা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে মতানৈক্য করো না। কেননা ধর্ম একটিই সঠিক ও সত্য। এছাড়া যত ধর্ম আছে, সবগুলি ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। সুতরাং যখন একটি ধর্মই সঠিক, অতএব তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অনৈক্য করো না।

---

[১৭০] متفق عليه، أخرجه الشيخان و غيرهما (انظر الأحكام الصغري، بتحقيق سعيد أحمد إعراب، من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية و الثقافة و العلوم - أيسكو)١٤١٢هـ ١٩٩١ م، ج ١، ص/١٥٣

২. দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালা পারস্পারিক শত্রুতা, বিবাদ এবং হানাহানি থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা জাহেলী যুগে সদা বিবাদ ও হানাহানি লিপ্ত থাকতো।

৩. তাদেরকে এমন বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, যা তাদের মধ্যকার হৃদ্যতা ও ভালবাসাকে বিনষ্ট করে এবং তাদের অনৈক্যের কারণ হয়।

এ সমস্ত তাফসীর থেকে স্পষ্ট যে, চার মাযহাবের উপর মুসলিম উম্মাহের আমল মূলতঃ কোন বিভক্তি নয়। কেননা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ বার শত বৎসর যাবৎ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর উপর আমল করে আসছে। সুতরাং দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ সমগ্র মুসলিম উম্মাহের এ ঐকমত্যকে বিনষ্ট করার জন্য যারা নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে, মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, তারাই মূলতঃ মুসলিম উম্মাহের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে, তারাই মূলতঃ আল্লাহ তায়ালার এ বিধানকে লঙ্ঘন করছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে মুসলমানদের বৃহত্তর জামাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।

শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের মাঝে মতপার্থক্য, রাসূল (সঃ) এর যুগে ছিল। কিন্তু রসূল (সঃ) এর যুগে যদি মতপার্থক্য হত, তার সমাধান দিতেন আল্লাহর রসূল (সঃ) নিজে। আল্লাহর রসূলের (সঃ) অবর্তমানে অসংখ্য মাসআলা-মাসআলা ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। অতঃপর সাহাবীদের কাছ থেকে তাবেয়ীগণ ইলম শিখেছেন। তাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছেন তাবে তাবেয়ীন।

সুতরাং অধিকাংশ শাখাগত মাসআলার মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, এর মূল উৎস হল, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যকার মতপার্থক্য। অতএব, ডাঃ জাকির নায়েক এ মতপার্থক্যকে কিভাবে ইসলামের অনৈক্যের কারণ মনে করেন এবং তিনি কিভাবে একে হারাম সাব্যস্ত করেন?

চার ইমাম সম্পর্কে ডাঃ জাকির নায়েক নিজেই তার "ইউনিটি ইন দ্যা মুসলিম উম্মাহ শিরোনামের লেকচারে বলেছেন,

All these four great Aimmas, came to give us knowledge, the teaching of Allah and His Rasul. Their Madhab was no Madhab but the Madhab of the Rasul.

"বিখ্যাত এ চার ইমামের প্রত্যেকেই আমাদেরকে জ্ঞান দানের জন্য এসেছিলেন। তারা আমাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শিক্ষাই দিয়েছেন। তাদের একমাত্র মাযহাব ছিল, রাসূল (সঃ) এর মাযহাব।"[১৭১]

সুতরাং এ চার ইমামের মাযহাব যদি আল্লাহ এবং তার রাসূলের মাযহাবই হয়ে থাকে, তবে যারা তাদের অনুসরণ করছে তাদেরকে কেন সমালোচনা করা হবে?

[১৭১] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

সূরা আল-আনআমের ১৫৯ নং আয়াতের তাফসীর

ডাঃ জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এবং তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে সূরা আল-আনমামের ১৫৯ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন। ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-
আলাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ছয় নাম্মার পারার সুরা আল-আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন,"হে নবী যে ইসলাম ধর্মে কোন ধরণের বিভক্তির বা দলাদলির চেষ্টা করে তার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।" ইসলামে বিভক্তি বা দলাদলি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এটি হারাম। কিন্তু আমরা যখন কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি তুমি কে? কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজী কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, তিনি কি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন। তিনি কি ছিলেন?

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ হল-

- এ আয়াতটি মূলতঃ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।
  [এটি ইবনে আব্বাস (রাঃ), যাহ্হাক, কাতাদাহ প্রমুখ মুফাসসিরগণের অভিমত। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭, তাফসীরে বাহরে মুহীত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৩, তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৯,]

১. এ আয়াতে যে বিভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেটি দ্বারা যদি রাসূল (সঃ) এর উম্মতউদ্দেশ্য হয়, তবে এথানে ঐ সমস্ত লোকের মতানৈক্য উদ্দ্যেশ হবে যারা বিদআতী, প্রবৃত্তিপূজারী, স্বেচ্ছাচারী এবং পথভ্রষ্ট। [এটি আহওয়াছ রা. এবং উম্মে সালামা রা. এর অভিমত, বাহরে মুহীত, আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭[১৭২]]

২. আয়াতটিকে যদি ইহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে নির্দিষ্ট না করে ব্যাপক রাখা হয়, তখন উদ্দেশ্য হবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অনৈক্য। যাকে এ আয়াতে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে তাদেরকে

---

172 دار طيبة
سنة النشر: 1422هـ / 2002م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء

যে শাস্তি প্রদান করা হবে বা তারা যে শাস্তির যোগ্য হবে, তার জন্য হে নবী আপনি দায়ী নন। সুতরাং এখানে অন্যৈক্য দ্বারা ঐ বিষয়কেই বোঝান হয়েছে, যা হারাম ও নিষিদ্ধ। যেমন, তাওহীদ, রেসালাত, ও আখেরাত। শাখাগত বিষয় তথা দলিলের ভিত্তিতে যে মতপার্থক্য তা এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়। (তাফসীওে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭)। তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৬)

৩. এ আয়াতের একটি প্রচলিত তেলাওয়াত হল, 'ফার-রাকু' কিন্তু আরেকটি প্রসিদ্ধ তেলাওয়াত হল, ফা'রাকু। আর তখন এর অর্থ হবে, যারা দ্বীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।

[এটি হযরত আলী, হামযা এবং কাসায়ী রহ. এর ক্বিরাত, তাফসীরে বায়যাবী, পৃষ্ঠা-৪৭০, তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮, তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৫]

৪. আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,"তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই বা আপনি তাদের থেকে মুক্ত" এ অংশের ব্যখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন,

- যদি আয়াতের প্রথম অংশ অর্থাৎ যারা দ্বীনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ইহুদী ও খ্রিষ্টান তাহলে এ অংশের বিধান যুদ্ধের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যাবে। তাদের থেকে আপনি মুক্ত, পূর্বে যার অর্থ ছিল, তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সাথে যুদ্ধের হুকুম দেয়ায় এ হুকুম রহিত হয়ে যাবে। [তাফসীরে তবারী, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৭২]

- আর যদি প্রথম অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ঐ সমস্ত লোক যারা বিদআতী, যারা প্রবৃত্তি পূজারী, তাহলে এ অংশের অর্থ হবে পরকালে তাদের শাস্তির ব্যাপারে আপনি দায়িত্বমুক্ত। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৮[১৭৩], তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে যে মতানৈক্য, তা হারাম নয়। আর ঐ জিনিস কিভাবে হারাম হবে, যা রাসূল এর বর্তমানে হয়েছে এবং তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনদের মাঝে শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং কুরআনের এ ধরণের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা আর মানুষের সামনে হালালকে হারামের অন্তর্ভূক্ত করে প্রকাশ করা কতটুকু বাস্তবসম্মত ও বৈধ?

মুসলমানদেরকে কুরআনের দিকে
এবং
হিন্দুদেরকে বেদের দিকে ফেরার আহক্ষানঃ

ড. জাকির নায়েক বলেছেন,

The sister asked a question that a non-muslim sister asked, "there is a confusion among the Muslims, when you are neatly asked: are you Wahabi or are you Hanafi, or a Shafi, or a Maleki? So there is confusion among the Muslims. So what's the reply? I do agree with non-muslim sister that unfortunately many Muslims call different names. But when I tell the hindus go back to the Vedas and I tell the Muslims go back to the Quran (applause from the audience).

বোন যে প্রশ্ন করেছেন, "মুসলামনদের মধ্যে একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি ওহাবী, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী অথবা হাম্বলী। সুতরাং এ ধরণের দ্বিধা মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। এর কী উত্তর হবে? আমি অমুসলিম বোনের সাথে একমত যে, দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা নিজেদের বিভিন্ন নাম দিয়েছে। সুতরাং আমি হিন্দুদেরকে বেদের দিকে এবং মুসলমানদেরকে কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার আহক্ষান করছি।[১৭৪]

বিজ্ঞ পাঠক! ডাঃ জাকির নায়েক এখানে যে কথাটি বলেছেন, একটু গভীরভাবে লক্ষ করুন!

প্রথমতঃ এ প্রশ্নটি করেছে, একজন অমুসলিম বোন। তার প্রশ্ন ছিল, মুসলমানদের মাঝে ওহাবী, হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি বিভিন্ন দল আছে, এ সম্পর্কে ডাঃ অভিমত কী। এ প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ জাকির বলেছেন-

I tell the Hindus go back to the vedas and I tell the muslim go back to the Quran.

---

[১৭৪] http://www.youtube.com/watch?v=QhCKCVO5sSA

“আমি হিন্দুদেরকে বেদের দিকে এবং মুসলমানদেরকে কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার আহক্ষান করছি ।”

এই কথার অভ্যন্তরীণ কোন তাৎপর্য বিশেষণ না করে, সরাসরি যদি আমরা অর্থটি মেনে নেই, তাহলে এখানে মুসলমানদেরকে মাযহাব পরিত্যাগ করে কুরআনের দিকে ফেরার কী অর্থ হবে?

১. মাযহাবের উপরে আমল করার কারনে মুসলিম উম্মাহ ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে যেমন, হিন্দুরা বেদের উপর না চলার কারনে ভ্রান্তিতে আছে ।
২. কুরআন ও মাযহাবের অনুসরণ সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় । নতুবা একজন যদি মাযহাবের উপর চলার কারনে কুরআন ও হাদীসের উপর চলে থাকে, তবে তো তাকে পুনরায় আবার কুরআনও হাদীসের দিকে ফিরে যেতে বলার কোন অর্থ থাকে না । এবং বিষয়টিকে হিন্দুদের বেদের দিকে ফেরার সাথে তুলনা করা যায় না । তাহলে কী যারা মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে, তারা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী কারও মতের অনুসরণ করছে যে, হিন্দুদের মত মাযহাবীদেরকেও কুরআন ও হাদীসের দিকে ফেরার আহক্ষান করছেন?

তিনি কী উদ্দেশ্য এ কথাটা বললেন, আর দর্শকরা কেন করতালি দিয়ে তাকে বাহবা দিলেন, আমাদের নিকট তা অস্পষ্ট ।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল, ডাঃ জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয়েছে মুসলমানদের মাযহাব সম্পর্কে, এখানে তিনি মুসলমানদের মাযহাবের বিষয়ে হিন্দু ধর্ম উত্থাপন করলেন কেন? আর তার শ্রোতারাই বা কেন এ বক্তব্যের কারণে করতালি দিয়ে তাকে বাহবা দিলেন?

প্রিয় পাঠককে লেকচারটি দেখার অনুরোধ করছি । ডাঃ জাকির নায়েক যখন এ কথাটি বলেছেন, তখন সমস্ত দর্শক তাকে করতালি দিয়ে বাহবা জানিয়েছে । আমাদের প্রশ্ন হল, তারা কী বুঝে করতালি দিলেন?

একজন মুসলমান যখন হিন্দুদেরই একটা ধর্মগ্রন্থ বেদের দিকে ফেরার আহক্ষান করছে, তখন মুসলিম-অমুসলিম সকলেই কেন করতালি দিল?

বিষয়টি আমরা ডাঃ জাকির নায়েকের উপর সমর্পণ করব। তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। তবে আমরা এখানে এ বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করব।

১ম উদাহরণঃ

খালেদ ইবনে আরফাতা বলেন-

"كنت جالسا عند عمر رضى الله عنه إذ أتى برجل من عبد القيس سكنه بالسوس فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال : نعم قال : وانت النازل بالسوس ؟ قال : نعم فضربه بعصاة معه فقال : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس . فجلس فقرأ عليه (بسم الله الرحمن الرحيم آلر * تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص . . .) الآية فقرأها عليه ثلاثاوضربه ثلاثا فقال الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أنت الذي نسخت كتاب دانيال ؟ ! فقال : مرني بأمرك اتبعه قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس فلئن بلغني عنك انك قرأته أو أقرأته احدا من الناس لأنهكنك عقوبة

"একদা আমি হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি লোক এলো। সে ছিল "সুস" নামক স্থানের বাসিন্দা। হযরত উমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি আব্দুল কায়েস গোত্রের অমুকের ছেলে অমুক। তুমি কি সুসে অবস্থান করো? লোকটি বলল- হ্যাঁ। হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে একটি লাঠি ছিল। হযরত উমর (রাঃ) লোকটিকে লাঠি দিয়ে পেটান শুরু করলেন।

লোকটি বলল- হে আমিরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কী? হযরত উমর (রাঃ) বললেন, বসো! লোকটি বসল। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) তেলাওয়াত করলেন-
(بسم الله الرحمن الرحيم آلر * تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص . . .)

"আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। আমি তোমার নিকট

উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে।"[১৭৫]
হযরত উমর (রাঃ) আয়াতগুলি তিন বার তেলাওয়াত করলেন। এবং তাকে তিনবার প্রহার করলেন। লোকটি বলল-"আমিরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কী?
হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন- তুমিই কি দানিয়াল (আঃ) এর কিতাব লিখেছো?

লোকটি বলল- আপনি আদেশ করুন! আপনি যা বলবেন, আমি তা পালন করব। হযরত উমর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি যাও! এগুলো গরম পানি এবং সাদা পশম দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দাও!

অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) তাকে বললেন-

ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس فلئن بلغني عنك انك قرأته أو أقرأته احدا من الناس لأنهكنك عقوبة

"এরপর তুমিও সে কিতাব পাঠ করবে না এবং অন্যকেও তা পাঠ করতে দিবে না। যদি আমার নিকট সংবাদ আসে যে, তুমি নিজে পড়েছো কিংবা অন্যকে পড়িয়েছো, তবে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করব"

অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন-

انطلقت أنا فانتسخت كتابا من اهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا في يدك يا عمر ؟ قال : قلت : يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما الى علمنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار : اغضب نبيكم هلم السلاح السلاح فجاؤا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية ولا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون . قال عمر : فقمت فقلت : رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم "

"একদা আমি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে তাদের একটি কিতাব সংগ্রহ করলাম। অতঃপর তা একটি চামড়ায় মুড়ে নিয়ে এলাম। রাসূল (সঃ) বললেন- হে উমর! তোমার হাতে কি? আমি বললাম - হে আলাহর রাসূল (সঃ) এটি একটি কিতাব।

---

[১৭৫] সূরা ইউসুফ, আয়াত-১,২,৩..

আমি আহলে কিতাবদের থেকে অনুলিপি তৈরি করে নিয়েছি, যেন আমাদের যে ইলম রয়েছে তা এর মাধমে আরও বৃদ্ধি পায় । এতে রাসূল (সঃ) এতটা রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর উভয় গাল লাল হয়ে গেল ।
অতঃপর আমরা নামাযের জন্য মসজিদে গেলাম ।
আনসার সাহাবীরা বলল, তোমাদের নবী (সঃ) কে রাগান্বিত করেছে । অস্ত্র ওঠাও! অস্ত্র ওঠাও! অতঃপর তারা আসল এবং রাসূল (সঃ) এর মিম্বারের সামনে একত্রিত হল । রসূল (সঃ) বললেন- হে মানুষ সকল! নিশ্চয় আমাকে জাওয়ামিউল কালিম[১৭৬] হিসেবে পাঠান হয়েছে । আমাকে সর্বশেষ বিষয় দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । এবং আমার জন্য তা সুসংবদ্ধ করা হয়েছে ।

আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ দ্বীন নিয়ে এসেছি । সুতরাং তোমরা সংশয়ের মাঝে থেকো না এবং সংশয় সৃষ্টিকারীরা যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে । উমর (রাঃ) বলেন, “অতঃপর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বললাম-

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك رسولا[177]

“আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আলাহকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছি, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছি, এবং আপনাকে রসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি”

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, এরপর রাসূল (সঃ) মেম্বার থেকে নামলেন ।[১৭৮]
[তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৭-৩৬৮, আল-আহাদিসুল মুখতারা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪-২৫]

দ্বিতীয় উদাহরণঃ
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) মুসনাদে আহমাদে হযরত উমর (রাঃ) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

---

[১৭৬] নবী কারীম (সঃ) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি জাওয়ামিউল কালীম তথা স্বল্পভাষায় অধিক মর্ম ব্যক্ত করতেন । যেমন তিনি বলেছেন- আদ্ দ্বীনু আন-নসিহা” দ্বীন হল কল্যাণ কামিতার নাম ।
[১৭৭] রযীতু বিলাহি রাব্বা, ও বিল ইসলামি দ্বীনা ও বিকা রাসূলা
[১৭৮] أخرجه الضياء في " الأحاديث المختارة " (1 / 24 - 25)

عن جابر ابن عبد الله : " أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال : أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا أن يتبعني "

হযরত জাবের ইবনে আব্দুলাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,
একদা হযরত উমর (রাঃ) আহলে কিতাব তথা ইহুদ-খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে একটি কিতাব সংগ্রহ করলেন। হযরত উমর (রাঃ) রাসূল (সঃ) এর নিকট কিতাবটি পড়ল। রাসূল (সঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন-
"হে উমর! তুমি কী দ্বিনের বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়েছো? আলাহর শপথ! আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দ্বীন নিয়ে এসেছি। তোমরা তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করো না। কেননা হয়ত তারা তোমাদের নিকট কোন সত্য বিষয় প্রকাশ করবে, আর তোমরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। অথবা তারা তোমাদের নিকট কোন ভ্রান্ত বিষয় উপস্থাপন করবে, আর তোমরা তাকে সত্যায়ন করে বসবে। আলাহর শপথ! হযরত মূসা (আঃ) যদি জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর জন্য আমার অনুসরণ ব্যতীত কোন উপায় থাকত না।[১৭৯]
[মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৬৭]

তৃতীয় হাদীসঃ

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাঃ) একদা একটি কিতাব নিয়ে এলেন, যাতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা লেখা ছিল। তিনি হুজুর (সঃ) এর সম্মুখে কিতাবটি পড়ছিলেন। এতে হুজুর এর চেহারার রং পরিবর্তি হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন-

" والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم فاتبعتموه وتركتموني ضللتم "

---

[১৭৯] وكذا أخرجه الدارمي (1 / 115) وابن أبي عاصم في " السنة " (5 / 2) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2 / 42) والهروي في " ذم الكلام " (4 / 67 – 2) والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (33 / 2

"আমার জীবনের শপথ! আমি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমাদের নিকট যদি ইউসুফ (আঃ) আগমন করেন আর তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো এবং আমাকে পরিত্যাগ করো, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।[১৮০]
[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৯৯৩০/ ১০১৬৫, বাইহাকী, ৪৮২৭]

চতুর্থ হাদীসঃ
হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন-

"لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا ، وَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ وإما أنْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، وَإِنَّه –واللهِ–لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلا أَنْ يَتَّبِعَنِي"

তোমরা আহলে কিতাব (ইহুদী, খ্রিস্টান) এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করো না, কেননা তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট; তোমাদেরকে তারা কখনও পথ প্রদর্শন করতে পারবে না । তাদের মত অনুযায়ী হয়ত তোমরা কোন ভ্রান্ত বিষয়কে সঠিক মনে করবে, অথবা কোন সঠিক বিষয়কে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করবে । আল্লাহর শপথ! তোমাদের মাঝে মুসা (আঃ) ও যদি জীবিত থাকতেন, তবে তার জন্য আমাকে অনুসরণ ব্যতীত কোন উপায় থাকত না ।"[১৮১]
[মুসনাদে আহমাদ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৭]

আমরা জানি, হযরত দানিয়াল (আঃ) একজন নবী ছিলেন । একজন নবীর কিতাব পাঠের কারণে হযরত উমর (রাঃ) যদি এক লোককে প্রহার করেন, তবে হিন্দুদের বেদ তার তুলনায় কোন স্তরের?

এ বিষয়ে সার কথা হল, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যে কোন কিতাব, চাই সে খ্রিষ্টান, ইহুদী বা অন্য ধর্মের হোক কারও জন্য এনির্দেশ দেয়া জায়েয নেই যে, আপনারা নিজ নিজ ধর্মের কিতাবের অনুসরণ করুন ।

---

[১৮০] أخرجه الهروي (3 / 64 / 1 - 2)

[১৮১]) مسند البزار برقم (124) "كشف الأستار" ورواه أحمد في مسنده (387/3) والدارمي في السنن (115/1) قال الهيثمي في المجمع (174/1): "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى

এ আলোচনা দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, ডাঃ জাকির নায়েক অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তাদেরকে যে, ইসলামের বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে থাকেন, সেটি ইসলামে নিন্দনীয়। বরং এক্ষেত্রে তিনি ইসলামের যে খেদমত করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে এবং এটি মুসলমানদের অনেক বড় অর্জন। তবে তিনি এখানে যে উক্তিটি করে মাযহাব সমূহকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা করলেন, এ বিষয়টিকে আমরা কিভাবে ইসলামের দাওয়াত বলতে পারি?
অনেকেই হয়ত বলবেন,
বেদে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন কথা আছে, বেদে একত্ববাদের কথা আছে, মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া আছে ইত্যাদি। সে জন্যই তিনি বেদের দিকে ফেরার আহব্বান করেছেন। আমরা বলব, বিষয়টি যদি এমন হয়, তবে তা হিন্দুদের জন্য এটি একটি দুঃসংবাদ। কারণ মৌলিকভাবে তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার ধর্ম থেকে অন্য ধমের্র দিকে ফেরার আহব্বান করা হল। অতএব, এখানে করতালি দেয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না, বরং তাদের জন্য ক্রন্দন করা উচিৎ যে, তাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম থেকে ফিরে আসার আহব্বান করা হচ্ছে। অথচ সকলেই এখানে করতালি দিয়ে বিষয়টি উপভোগ করেছেন!

এই করতালির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মক্কার মুশরিকদের একটি ঘটনা উলেখ করা যেতে পারে[১৮২]-
“মক্কার মুশরিকদের এক সমাবেশে রাসূল (সঃ) সূরা নজমের ১৯ ও ২০ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আয়াত দু’টি হল-

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

---

১৮২ এই ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনা সম্পর্কে আলামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,

كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا

“অর্থাৎ অধিক সংখ্যক সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হওয়ায় এটি প্রমাণ করে যে, এর একটি ভিত্তি আছে” (লুবাবুন নুকুল, পৃষ্ঠা-১৫০)
আমাদের এখানে ঘটনার সূত্র নিয়ে কোন আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। মূল ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই সেটি আলোচনা করা উদ্দেশ্য। ঘটনাটি উলেখ করা হয়েছে- তাফসীরে তবারী (খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৩৩), ইবনুল মুনযির, ইবনু আবি হাতেম (ফাতহুল কাদির, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৬৩), আলামা তাবরানী, (আল-মু’জামুল কাবিরা, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৫৩]

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ, লাত ও উয্যাকে সম্পর্কে। এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?"

এ আয়াত তেলাওয়াতের পর শয়তান রাসূলের (সঃ) এর ভাষায় বলল-

تلك الغزانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى

"অর্থাৎ এরা হল সম্মানিত প্রতিমা, এদের সুপারিশের আশা করা যায়"

এ কথায় মক্কার মুশরিকরা যারপর নাই খুশি হল। এ সূরার শেষে একটি সেজদার আয়াত আছে। আয়াতটি তেলাওয়াত করার সাথে সাথে উপস্থিত মুশরিকদের বড় বড় নেতারা সকলেই সেজদা পড়ে গেল। তবে ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং আবু উহাইহা সাইদ ইবনে আস নামক দু' ব্যক্তি সিজদা করল না। তারা এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে কপালে লাগাল। এরা দু'জন ছিল খুব বৃদ্ধ।

যাই হোক! এ ঘটনাই রয়েছে-

ففرح بذلك المشركون

"মক্কার মুশরিকরা খুব খুশি হল"

এই খুশির বিষয়টি এখানেও স্পষ্ট প্রতীয়মান। আমরা জানি ডাঃ জাকির নায়েক হয়ত ভাল উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছেন, কিন্তু উপস্থিত শ্রোতারা ডাঃ জাকের নায়েকের সেই উদ্দেশ্য বুঝেই কি করতালি দিয়েছে? বিষয়টি প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়।

বেদের দিকে ফেরার বিষয়টি চোখ বুজে মেনে নেয়া গেলেও মাযহাবকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনীয় করে উলেখ করার বিষয়টি আমরা কিভাবে গ্রহণ করব? জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয়েছে, ওহাবী, হানাফী... ইত্যাদি সম্পর্কে। তাকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। অথচ তিনি ইসলামের হক বিষয় সমূহ উলেখ করতে গিয়ে সেগুলোকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা করেছেন। আমরা পূর্বে উলেখ করেছি, শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে তুলনা করেছে, আর শায়েখের অনুসারী ডাঃ জাকির নায়েক মাযহাব সমূহকে হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা করলেন। আলাহ্ পাক আমাদের হিফাজত করুন।

বাহাত্তর দল ও মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল

ডাঃ জাকির নায়েক তার আলোচনায় শুধু চার মাযহাবকেই ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভূক্ত মনে করেননি, বরং তিনি "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকেও ফেরকাবাজীর অন্ত ভূক্ত করেছেন। ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন,

"See whatever label you give there is bound to be Tafarraqa. When the Shias came people said "Be a Sunni." Again there was group Ahle Sunnah Wal Jamat. Then, again there was division Hanafi, Hanbolii, Shafi, Maleki. Then we came with Salafi, Ahle Hadith….. there is group even in this. The moment the name given by human beings – there is bound to be Tafarraqu.

"দেখুন! আপনি মুসলমানদেরকে যে নামই প্রদান করবেন, তা হবে দলাদলি সৃষ্টি। যখন শিয়াদের আবির্ভাব হল, তখন মুসলমানরা নিজেদেরকে সুন্নী বলেছে। অতঃপর একটা দল সৃষ্টি হয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে। অতঃপর হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আবির্ভাব হয়েছে। এরপর এসেছে ছালাফী, আহলে হাদীস। সুতরাং মুসলমানরা যে নামই প্রদান করবে, তারা তাফার্‌রাকু অর্থাৎ ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত হবে।"[১৮৩]

এভাবে ডাক্তার জাকির নায়েক নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হক দল সমূহকেও ভ্রান্ত ফেরকার অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

কিন্তু তিনি হয়ত এতটুকু খেয়াল করেন নি যে, রাসূলের হাদীসে তেহাত্তর দলের কথা বলা হয়েছে এবং তন্মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র দল হল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। অথচ ডাক্তার জাকির নায়েক হাদীসটির সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে বাতিল বলেছেন।

পৃথিবীর সকল হক্বপন্থী আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, তেহাত্তর দলের মাঝে মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র দল হল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত অর্থাৎ যারা রাসূলের সুন্নাহ এবং সাহাবাদের জামাতকে অনুসরণ করে।

---

183 Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH – YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়ঃ

এক.

রাসূল(সঃ) বলেছেন,

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم: (ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل خذو النعل بالنعل حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة) قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي).

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন," আমার উম্মতের মধ্যে সে সমস্ত জিনিসের আবির্ভাব ঘটবে, যা বনী ইসরাইলের মধ্যে ছিল, দুটি জুতার একটি অপরটির সাথে যেমন মিল রাখে। এমনকি বনী ইসরাইলের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে যিনা করে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে তা করবে। নিশ্চয় বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উমর তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতীত। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা? রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, আমি এবং আমার সাহাবার আদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[১৮৪]

أخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم):قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। আর তারা হল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দল (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত)। আর আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তি-

পূজা এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেমন জলাতঙ্ক রোগ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে ।[১৮৫]

এসমস্ত হাদীসে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের পরিচয় দেয়া হয়েছে, যারা রাসূল (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । আর রাসূল (সঃ) এবং সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র দল হল আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত । এছাড়া যত সম্প্রদায় তথা রাফেযী, খারেজী, মুরযিয়া, কাদেরিয়া, জাহমিয়া, হারুরিয়া সকলেই ভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় সম্পর্কে আল্লামা মায়দানী (রহঃ) লিখেছেন-

أهل السنة: السيرة و الطريقة المحمدية. و أهل الجماعة: من الصحابة و التابعين و من بعدهم من المتبعين للنبي

"আহ্লুস সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাসূল (সঃ) এর সীরাত এবং তাঁর তরিকার উপর যারা প্রতিষ্ঠিত । এবং আহ্লুল জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যারা রাসূল (সঃ) এর অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীনগণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ।"[১৮৬]

- সাদরুশ শরিয়া আল্লামা উবাউদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) লিখেছেন-

أهل السنة و الجماعة هم الذين طريقهم طريقة الرسول و أصحابه دون أهل البدع

"যাদের তরীকা হল, রাসূল (সঃ) এবং সাহাবীদের তরীকা, তারাই হল আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত । এবং তারা কোন বিদআতী সম্প্রদায় নয়"[১৮৭]

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106)

সেদিন (কিয়ামতের দিন) কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো । বস্তুত: যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার

---

185 কিতাবুস সুন্নাহ, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৪৫৯৭, হাদীসটি হাসান,

১৮৬ শরহুল আক্বিদাতিত ত্বহাবীয়া, পৃষ্ঠা-৪৪

১৮৭ আত-তাউযীহ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮

পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর" ।

আলাম্ম ইবনে কাসীর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন-

تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسودّ وجوه أهل البِدْعَة والفرقة

"অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং বিদআতী ও দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে। (আহলুল বিদআ ওয়াল ফুরকা) ।
[তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ.১, পৃষ্ঠা-৪২০]

- আলাম্মা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন,

والبدعة مقرونة بالفُرقة، كما أن السُنَّة مقرونة بالجماعة، فيُقال :أهل السُنَّة والجماعة، كما يُقال: أهل البدعة والفُرقة[188]

"বিদআত শব্দটি 'ফুরকা' (বিচ্ছিন্নতাবাদ) এর সাথে সম্পর্কিত এবং সুন্নাত শব্দটি জামাত (বৃহত্তম) দলের সাথে সম্পর্কিত। যেমন বলা হয়ে থাকে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত এবং বলা হয়, আহলুল বিদআত ওয়াল ফুরকা"

রাসূল (সঃ) যে ভ্রান্ত বাহাত্তর দলের কথা হাদীসে উলেখ করেছেন তাদের পরিবচয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হল–

- আলাম্মা শাতবী (রহঃ) বলেছেন,

"وقال جماعة من العلماء: أصول البدع أربعة، وسائر الثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا، وهم: الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة[189]

---

[১৮৮] الاستقامة ج1، ص.42
[১৮৯] الاعتصام ج2، ص.220

"উলামাদের বড় একটি দল বলেছেন, বিদআত ও ভ্রান্তির মূল উৎস হল চারটি। এবং অবশিষ্ট বাহাত্তর দল এ চারটি থেকে সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে। বিভ্রান্ত চারটি দল হল, "খারেজী, রাফেযী, কাদেরিয়া, মুরজিয়া"

- আলামা কুরতুবী (রঃ) এর নিকট ভ্রান্ত বাহাত্তর দলঃ

তেহাত্তর দলে বিভক্তির বিষয়টি আলামা কুরতুবী (রহঃ) তাফসীরে কুরতুবীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং তিনি তৎকালীন যামানা পর্যন্ত আবির্ভূত ছয়টি দলকে ভ্রান্ত বলে উলেখ করেছেন। এ ছয়টি দলের প্রত্যেকটি দল আবার বারটি দলে বিভক্ত, অতএব মোট বাহাত্তরটি দল হল। উলেখিত ছয় দল হল, ১.হারুরিয়া ২.কাদারিয়্যা ৩.জাহমিয়া ৪.মুরজিয়া ৫. রাফেজা ৬. জাবরিয়া। [তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪১]

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট ফেরকাঃ

তাকদীর	**জাবরিয়াঃ** জাবরিয়া সম্প্রদায় তাকদীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। তাদের আক্বীদা হল, বান্দা কিছুই করতে পারে না। বান্দা কোন কাজ স্বেচ্ছায় করতে অবম। তার নিজস্ব কোন কার্যকরী ইচ্ছাশক্তি নেই	আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদাঃ এক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। আমাদের আক্বীদা হল- বান্দার ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু এটি আলাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আলাহ বলেছেন- وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ "আলাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন ইচ্ছা করতে পারো না।" আমাদের আক্বীদা হল, বান্দা কাজ করে, কিন্তু বান্দা কাজের স্রষ্টা নয়। আমাদের এবং আমাদের সকল কাজের স্রষ্টা হলেন একমাত্র আলাহ তায়ালা। আলাহ তায়ালা বলেছেন- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. " তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর, তার সবকিছু আলাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন"	ক্বাদেরীয়াঃ ক্বাদেরীয়া সাম্প্রদায়ের আক্বীদা হল, বান্দা তার নিজের কাজের স্রষ্টা নিজেই। বান্দার কাজের উপর আলাহর কোন ক্ষমতা নেই। আলাহ বান্দাকে হেদায়েতও দিতে পারেন না আবার গোমরাহও করতে পারেন না।
ঈমান ও দ্বীন	হারুরিয়াঃ হারুরিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা হল, কেউ কবিরা গোনাহ করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার রক্ত ও মাল হালাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ। আর মু'তাযেলাদের আক্বীদা হল, কবিরা গোনাহ করলে মানুষ ইমান থেকে বের হয়ে যাবে, তবে কাফের হবে না। এরা ইমান ও কুফুরীর মাঝে আরেকটা স্তরের কল্পনা করে।	কবিরা গোনাহ করলেও বান্দা ইমানদার থাকবে। সে ইসলাম ও ইমান থেকে বের হবে না। তবে সে পরিপূর্ণ মু'মিন থাকবে না।	মুরজিয়া এবং জাহমিয়াঃ এদের আক্বীদা হল, কেউ কবিরা গোনাহ করলেও সে পরিপূর্ণ মু'মিন থাকবে। এবং সে কখনও জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হবে না। ইমান থাকা অবস্থায় কোন গোনাহ করলে কিছু হয় না। তাদের মতে আমল না করলেও শুধু মনে মনে বিশ্বাস করাটা যতেষ্ঠ।

হযরত আলী (রাঃ)	খারেজী ও নাসেবী সম্প্রদায়ঃ নাসেবী সম্প্রদায় হযরত আলী (রাঃ) কে ফাসেক বলে এবং খারেজী সম্প্রদায় হযরত আলী (রাঃ) কাফের বলে।	আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হল, হযরত আলী (রাঃ) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত চার খলিফার চতুর্থ খলিফা। মর্যাদাগত অবস্থানে অপর তিন খলিফা তাঁর চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। তবে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তিনি নবীদের মত নিষ্পাপ নন।	বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়ারা বিশ্বাস করে তিনি নবীদের মত নিষ্পাপ, এবং তিনি রাসূল (সঃ) ব্যতীত অন্যান্য সকল নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। সাবইয়া সম্প্রদায় হযরত আলীকে খোদা মনে করে।

খাতেমাতুল মুহাক্কিকীন, আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) বলেছেন-

أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة و الماتريدية

“আক্বিদার ক্ষেত্রে আশআরী এবং মাতুরীদী আক্বিদা হল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত”
[রদ্দুল মুহতার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫২]

যুবাইদি (রহঃ) বলেন-

إذا أطلق السنة والجماعة فالمراد به الأشاعرة و الماتريدية

“যখন সাধারণভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলা হয়, তখন আশআরী এবং মাতুরীদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়”
[ইতহাফুস সাদাতিল মুতাকায়্যিন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬]

অর্থাৎ আক্বিদার ক্ষেত্রে আশআরী এবং মাতুরীদী আক্বিদাই হল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।
আমল তথা ফিকহের ক্ষেত্রে চার মাযহাব হল, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত। বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি (রহঃ) বলেছেন-

مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم من أهل السنة و الجماعة

“চার ইমাম এবং অন্য ইমামদের মাযহাব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত”
[উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৭]
মিশকাত শরীফের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেছেন-

مذهب الحنفية من جملة أهل السنة و الجماعة

“হানাফী মাযহাব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত”
[মিরকাতুল মাফাতেহ, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩২১]

এটি সর্বজন বিদিত যে, কোন মাযহাবই ভ্রান্ত বাহাত্তর দলের অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু ডাঃ জাকির নায়েক কিভাবে যে, এই ধ্রুব সত্য বিষয়টিকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করেন, তা আমাদের নিকট অস্পষ্ট।

তিনি অবলীলায় সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করেছেন। হক্ব ও বাতিলকে একাকার করে দিয়েছেন। অথচ পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হল,

وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করো না” [সূরা বাকারা, আয়াত নং ৪২]
ডাঃ জাকির নায়েক যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী না হন, তবে তিনি কোন আক্বীদায় বিশ্বাসী, সেটা আমাদের নিকট অস্পষ্ট।

বাহাত্তর দল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-
The Prophet had said that there would be 73 sects.
Some may argue by quoting the Hadith of our beloved Prophet, from Sunan Abu Dawood Hadith No. 4579. In this Hadith the Prophet (pbuh) is reported to have said, “My community will split up into seventy-three sects.”

This hadith reports that the prophet predicted the emergence of seventy-three sects. He did not say that Muslims should be active in dividing themselves into sects. The Glorious Qur’an commands us not to create sects. Those who follow the teachings of the Qur’an and Sahih Hadith, and do not create sects are the people who are on the true path.

According to Tirmidhi Hadith No. 171, the prophet (pbuh) is reported to have said, “My Ummah will be fragmented into seventy three sects, and all of them will be in Hell fire except one sect.” The companions asked Allah’s messenger which group that would be. Where upon he replied, “It is the one to which I and my companions belong”.

The Glorious Qur’an mentions in several verses, “Obey Allah and obey His Messenger”. A true Muslim should only follow the Glorious Qur’an and the Sahih Hadith.

“আমাদের নবীজী (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে তেহাত্তর দল হবে। কেউ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বিতর্ক করতে পারে। হাদীস নং৪৫৭৯। এ হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মত তেহাত্তর দলে অন্তর্ভূক্ত হবে। এই হাদীসে রাসূল (সঃ) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তেহাত্তর দল হবে। তিনি একথা বলেন নি যে, মুসলমানদেরকে সক্রিয় হয়ে, তেহাত্তর দল সৃষ্টি করতে হবে। কুরআনে দলাদলি সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে এবং যারা দলাদলি সৃষ্টি করে না, তারা সঠিকপথের উপর রয়েছে। তিরমিযি শরীফের ১৭১নং হাদীস অনুযায়ী, নবী কারীম (সঃ) বলেছেন, “আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে নিপতিত হবে, মাত্র একদল ব্যতীত।

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দলটি জান্নাতে যাবে? তখন রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন,

"It is the one to which I and my companions belong".

"আমি এবং আমার সাহাবাদের পথে যারা চলবে, সেই দল"
কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অনুসরণ কর।" একজন সত্যিকারের মুসলমান শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে পারেন।"[১৯০]

এখানে ডাঃ জাকির নায়েক চার মাযহাবসহ সালাফী, আহলে হাদীস সবগুলোকে তেহাত্তর দলের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। অথচ তিনি এতটুকু খেয়াল করেন নি যে, মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে, অবশিষ্ট বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। এখন প্রশ্ন হল, পৃথিবীর সব মানুষ কি জাহান্নামে যাবে? পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করে থাকে। আর কিছু লোক আছে, যারা সালাফী। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। কেউ আহলে হাদীস, কোথাও লা-মাযহাবী। সুতরাং সবাই যদি বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দল কোনটি? ডাঃ জাকির নায়েক? তিনি কি একাই জান্নাতে যেতে চান? সারা পৃথিবীর সবাইকে জাহান্নামী বানিয়ে তিনি একাই জান্নাতে যেতে চান?

দীর্ঘ ১২-১৩ শত বৎসর সারা পৃথিবীর সব মানুষ চার মাযহাব অনুসরণ করেছে। তবে তারাও কি জাহান্নামী? যেহেতু জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে "মুসলমান" বাদে যে কোন লেবেল লাগালেই সেটা দলাদলির অন্তর্ভূক্ত এবং এরা তেহাত্তর দলের অন্ত র্ভূক্ত হবে, অতএব তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বার তেরশ' বৎসরের সকল মুসলমান জাহান্নামী।

---

১৯০ http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199

দ্বিতীয় প্রসঙ্গঃ

বিজ্ঞ পাঠক! ডাঃ জাকির নায়েক তিরমিযি শরীফের একটি হাদীস উলেখ করেছেন। হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের তেহাত্তর দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল মাত্র জান্নাতে যাবে। বাকি বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেছেন, জান্নাতী দল কোনটি। রাসূল (সঃ) উত্তর দিয়েছেন,

"It is the one to which I and my companions belong".

যে দলটি আমি এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হাদীসের এ বক্তব্যের সাথে এবং ডাঃ জাকির নায়েকের নিচের বক্তব্যটি একটু মিলিয়ে দেখুন!

Those who follow the teachings of the Qur'an and Sahih Hadith, and do not create sects are the people who are on the true path.

"যারা শুধু কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুসরণ করে এবং কোন বিভক্তি সৃষ্টি করে না, তারা হল সত্য পথপ্রাপ্ত।"

রাসূল (সঃ) বলেছেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হল, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসরণ করবে। অথচ ডাক্তার জাকির নায়েক সাহাবীদের আদর্শ বাদ দিয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের সার্টিফিকেট তাদেরকে দিয়েছেন যারা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুসরণ করবে। এখানে তিনি সাহাবীদের অনুসরণের বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন কেন? হুজুর (সঃ) যেখানে বলেছেন, যে দলটি আমার এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর চলবে। এখানে ডাঃ জাকির নায়েক বলছেন, শুধু কুরআন ও সহীহ্ মানলেই "ট্রু মুসলিম" হয়ে যাবে। রাসূল (সঃ) তো তা বলেননি। তিনি বলেছেন, আমার আদর্শ তথা কুরআন ও সুন্নাহ এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর যারা চলবে। তিনি এখানে সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

ডাঃ জাকির নায়েক শুধু কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুসরণ করতে বলেছেন। অথচ আলাহ্ তায়ালা সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলেছেন,

"তোমরা আলাহ্র অনুসরণ কর, অনুসরণ করো আলাহ্র রাসূলের এবং তোমাদর মধ্যে যারা "উলুল আমর" তথা আলেম বা শাসক রয়েছেন, তাদের অনুসরণ করো। কুরআনে তো শুধু একথা বলা হয়নি যে,

A true Muslim should only follow the Glorious Qur’an and the Sahih Hadith.

“সত্যিকার মুসলিম শুধু (only) কুরআনও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করবে।”

ডাঃ জাকির নায়েক কুরআনের এ আয়াতের ক্ষেত্রেও নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আয়াতের প্রথম অংশ উলেখ্ব করেছেন, কিন্তু আয়াতের যে অংশে শাসক বা আলেমগণের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে, সেটি এড়িয়ে গেছেন। আমরা এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

রাসূল (সঃ) কি হানাফী, শাফেয়ী..ছিলেন?

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন,

when we ask the muslim what are you? Some says I am hanafi, some says I am shafi, some say I am hanboli, some say I am a salafi. “What was the prophet (sallallahu alihi wasallam)? Was the prophet hanafi? Was he Shafa’i? was he Maleki? was he Hanboli? What was he?

wKš‘ Avgiv hLb †Kvb gymwjg‡K wR‡Ám Kwi Zzwg †K? †KD DËi †`q, Avwg nvbvdx, †KD e‡j kv‡dqx, †KD e‡j gv‡jKx Avevi ‡KD e‡j nv¤^jx| ‡KD e‡j mvjvdx| Zvn‡j bexRx Kx wQ‡jb? wZwb wK nvbvdx wQ‡jb, wZwb wK kv‡dqx wQ‡jb, bv wK wZwb gv‡jKx ev nv¤^jx wQ‡jb? Avm‡j wZwb Kx wQ‡jb?[191]

এক.

দুঃখজনক ব্যাপার হল, ডাক্তার জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন । তিনি প্রশ্ন করেছেন, রাসূল কী ছিলেন? হানাফী? শাফেয়ী?....

আমাদের প্রশ্ন হল, ডাক্তার জাকির নায়েক যদি কুরআন ও হাদীসের আলোকে কোন মাসআলার সমাধান প্রদান করেন, কেউ যদি তার কথা অনুযায়ী আমল করে, তবে একথা বলা কি ন্যায় সঙ্গত হবে যে, রাসূল (সঃ) কী ছিলেন? রাসূল কি জাকির নায়েক পন্থী ছিলেন? সামান্য বুদ্ধি আছে, এমন কেউ এধরণের হাস্যকর প্রশ্ন করবে না । অথচ ডাক্তার জাকির নায়েকের মত একজন বিদ্বান ব্যক্তি এধরণের একটি প্রশ্ন করলেন ।

১৯১

http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199

ডাক্তার জাকির নায়েক কি রাসূলের (সঃ) এর অনুসারী, না রাসূল (সঃ) ডাক্তার জাকির নায়েকের অনুসারী? ইমাম আবু হানীফা কি রাসূলের অনুসারী হবে না কি রাসূল (সঃ) ইমাম আবু হানীফার অনুসারী হবে? কোনটি হবে? উম্মত নবীর অনুসারী হয়, না কি নবী উম্মতের অনুসারী হয়? ডাক্তার জাকির নায়েক কি এই সাধারণ কথাটা বোঝেন না?

ইমামগণ রাসূলের (সঃ) অনুসারী ছিলেন কি না? এটি যথার্থ প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু রাসূল (সঃ) ইমামদের অনুসারী ছিলেন কি না, এটি কোন স্তরের প্রশ্ন? কেউ কি এ কথা বলতে পারবে যে, রাসূল (সঃ) উমরের অনুসারী ছিলেন না কি আবু বকরের? প্রশ্ন হতে পারে, আবু বকর ও উমর কি রাসূল (সঃ) এর অনুসারী ছিলেন কি না। ডাক্তার জাকির নায়েকের মত একজন বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ধরণের অযৌক্তিক- হাস্যকর প্রশ্ন দুঃখজনক।

দুই.

ডাক্তার জাকির নায়েক যদি প্রশ্ন করতে চান যে, ইমামগণ রাসূল (সঃ) এর অনুসারী ছিলেন কি না? তবে আমরা বলব, ইমামগণ শতভাগ রাসূল (সঃ) এর অনুসারী ছিলেন। রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি তারা কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা তাদের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়। এসম্পর্কে ইমামগণের কয়েকটি উক্তি উলেখ করা হল-

ইমাম আবু হানাফী (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন,

لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث. فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا.[192]

"মানুষ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে অবস্থান করবে, যতদিন তাদের মাঝে এমন লোক থাকবে, যারা হাদীস অন্বেষণ করবে। আর যখন তারা হাদীস ব্যতীত ইলম অন্বেষণ করবে, তারা বিশৃংখল হয়ে পড়বে"

[মিযানুল কুবরা, আলামা শা'রানী (রহঃ), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫]

---

[১৯২] ميزان الكبري،للعلمة الشعراني رحمه الله تعالي

إياكم و القول في دين الله بالرأي، وعليكم بإتباع السنة فمن خرج عنها ضل.[193]

আলাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে মনগড়া কথা থেকে বেঁচে থাকো! তোমাদের জন্য সুন্নাহের অনুসরণ আবশ্যক। যে ব্যক্তি সুন্নাহের অনুসরণ থেক বের হল, সে ভ্রষ্ট হয়ে গেল।

ইমাম মালেক (রহঃ) এর বক্তব্যঃ
ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন,

السنن سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق[১৯৪]

"সুন্নাহ হল নূহ আ. এর জাহাজের মত। যে তাতে আরোহণ করল, সে নাজাত পেল, আর যে তা থেকে পিছিয়ে থাকল, সে ডুবে গেল।"

- ইমাম মালেক (রহঃ) আরও বলেছেন,

ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم

"রাসুল (সঃ) এর পরে তাঁর কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথা যেমন গ্রহণও করা যায়, আবার তা পরিত্যাগও করা যায়"[১৯৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন,

فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي

আমি যদি এমন কোন কথা বা এমন কোন মূলনীতি প্রদান করি, যেটি রাসূলের হাদীসের বিপরীত হয়, তখন রাসূল (সঃ) যা বলবেন, সেটিই আমার বক্তব্য।"[১৯৬]
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন,

১৯৩

[১৯৪] للحافظ السوطي رحمه الله تعالي من خاتمة ((مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة))

[১৯৫] ابن عبد البر في الجامع 91/2

[১৯৬] تاريخ دمشق لابن عساكر 15/1 /3

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت

আমার কিতাবে যদি রাসূলের সুন্নতের খেলাফ কোন কথা পাও তবে তোমরা সুন্নাহের উপর আমল করো, এবং আমি যা বলেছি, সেটি ত্যাগ করো ।[১৯৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেছেন,

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة

“যে রাসূল (সঃ) এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের মুখে নিপতিত”[198]

রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে যারা এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তাদের বক্তব্যকে ভ্রান্ত ও ইসলাম বহির্ভূত প্রমাণের চেষ্টা করা, কতটা গর্হিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং চারও ইমাম যে রাসূল (সঃ) এর শতভাগ অনুসারী ছিলেন, সেব্যপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বরং সর্বযুগের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, চার ইমামই শতভাগ ইসলামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন

---

[১৯৭]النووي في المجموع 63/1

[১৯৮]ابن الجوزي في المناقب ص 182(আল-মানাকেব, ইবনুল জাওযী (রহঃ), পৃষ্ঠা-১৮২)

“তুমি কে” প্রশ্নের উত্তর

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-

When one asks a Muslim, “who are you?” the common answer is either ‘I am a Hanafi or Shafi or Maliki or Hanbali. Some call themselves ‘Ahle-Hadith’.

“যখন কোন মুসলমানকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি কে? সাধারণ উত্তর হল, আমি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী অথবা হাম্বলী। কেউ কেউ নিজেকে আহলে হাদীস বলে।”[১৯৯]

আমরা এখানে ডাঃ জাকির এ বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করব।

বাস্তব জীবনে আমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তাহলে এর উত্তর আমরা কী দিয়ে থাকি?

এ বিষয়ে মৌলিক কথা হল, এ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে।

- কোন অমুসলিম যদি কোন মুসলিমকে প্রশ্ন করে, “তুমি কে” তখন এর উত্তর হবে, “আমি মুসলিম”।
- আবার অপরিচিত কোন মুসলিম যদি অপর মুসলিমকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তার উত্তর হবে “আমি অমুকের ছেলে অমুক”
- একদেশের লোক যদি কোন বিদেশীকে প্রশ্ন করে, “তুমি কে” তখন উত্তর হবে, আমি বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি।
- আবার একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দু’ব্যক্তি যদি একে অপরকে প্রশ্ন করে, তুমি কে? তখন এর উত্তর হবে, আমি গুজরাটী, আমি লাহোরী, আমি পাঞ্জাবী।
- আবার কোন ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তুমি কে? তখন সে বলবে সে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রেণীর ছাত্র।

এভাবে বাস্তব জীবনে মানুষ তুমি কে প্রশ্নের উত্তর স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী দিয়ে থাকে। অতএব, কোন অমুসলিমের “তুমি কে” প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলিম

---

[১৯৯] http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199

বলবে " আমি মুসলিম" । এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কখনও " আমি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী...ইত্যাদি বলে না । ডাঃ জাকির নায়েক কিভাবে এ বিষয়টির অবতারণা করলেন আমাদের বোধগম্য নয় ।

তবে "তুমি কে" এ প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলিম কখন নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস ইত্যাদি বলে থাকে? স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ধরুণ! দু'জন ব্যক্তি পাশাপাশি নামায আদায় করল, একজন নামাযে জোরে জোরে আমীন বলল, আরেকজন আস্তে আমীন বলল । এখন নামায শেষে একে অপরকে যদি প্রশ্ন করে "তুমি কে" তখন এর উত্তর হবে, আমি হানাফী, আরেকজন হয়ত বলবে আমি শাফেয়ী বা আহলে হাদীস... । আবার কেউ যদি স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট করে জিজ্ঞেস করে, what is your madhb (তোমারা মাযহাব কী) অথবা what madhab do you follow? (তুমি কোন মাযহাবের অনুসারী) তখন এর উত্তর হতে পারে, আমি হানাফী, শাফেয়ী ...আহলে হাদীস ইত্যাদি । কিন্তু সাধারণভাবে কারও 'তুমি কে' প্রশ্নের উত্তরে হানাফী, শাফেয়ী হিসেবে পরিচয় দানের বিষয়টি একেবারেই অযৌক্তিক । সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েকের পক্ষে এ ধরণের বিষয়ের অবতারণা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয় ।

হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব

প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, “ইযা সাহ্হাল হাদীস ফাহুয়া মাযহাবী” অর্থাৎ হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব। একথা উলেখ করে ডাক্তার জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীস ও সালাফীগণ যুক্তি দিয়ে থাকেন, মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে না, কেননা ইমামগণ সহীহ হাদীস অনুসরণের কথা বলেছেন।

ডাক্তার জাকির নায়েক একটু আগে বেড়ে বলেছেন,
That’s the reason I say I am a hundred percent Hamboli, if Hamboli means the person who follows the teaching of Imam Ahmad Ibn Hambal, I am 100% Hamboli. Other people are 70%, 80%. So in these teachings, if you say, following the teachings of Imam Abu Hanifa, may Allah’s Mercy be on him, makes you a Hanafi, I am a ‘Pakka’ Hanafi, 100% Hanafi, if following the teachings of Imam Malek makes you a Maleki, I am 100% Maleki. If following the teachings of Imam Shafi, makes you a Shafi, I am 100% Shafi. If following the teachings of Imam Ahmad Ibn Hambol makes you a hamboli, I am a 100% ‘Sau fi Sad’ Hamboli. Because all these four great Aimmas said, if you find any of my fatwa that goes against Allah and his Rasul, throw my Fatwa on the wall.

“আমি বলি, আমি শতভাগ হাম্বলী। যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের নাম হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী। অন্যরা সত্তর ভাগ, কেউ আশি ভাগ, আমি একশ’ ভাগ হাম্বলী। যদি তুমি বলো, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অনুসরণ করলে কেউ হানাফী হয়ে যায়, তবে আমি একশ’ ভাগ হানাফী। ইমাম মালেক (রহঃ) এর অনুসরণের কারণে কেউ যদি মালেকী হয়, তবে আমি শতভাগ মালেকী। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর অনুসরণে কারণে কেউ যদি শাফেয়ী হয়, তবে আমি একশ’ ভাগ শাফেয়ী। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অনুসরণের কারণে কেউ যদি হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী। কেননা চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমার ফতোয়া যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) বিরোধী হয়, তবে আমার ফতোয়া দেয়ালে ছুঁড়ে মার”[২০০]

---

[২০০] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

এক.

আমরা জানি যে, প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব ।

বিবেচনার বিষয় হল, ইমামগণ যদি একথা নাও বলতেন, তবুও কি সকলের উপর রাসূলের (সঃ) এর সহীহ হাদীস অনুসরণ করা জরুরি নয়? কোন মু'মিন কি এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে, আমি রাসূল (সঃ) এর সহীহ হাদীস পেলেও সেটা মানব না?

আমরা ডাঃ জাকির নায়েককে প্রশ্ন করব, কুরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে? কেউ যদি কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করে, নিঃসন্দেহে সে মুসলমান থাকবে না ।

আমাদের কথা হল, কুরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কি কুরআনের সকল আয়াতের উপর আমল করে দেখাতে পারবেন? কারও জন্য কি কুরআনের সকল আয়াতের উপর আমল করা বৈধ?

সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হল, কুরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের সমস্ত আয়াতের উপর আমল করা বৈধ নয় । কেউ যদি কুরআনের সমস্ত আয়াতের উপর আমল করতে চায়, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।

আমরা সকলেই অবগত ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদপান বৈধ ছিল । পবিত্র কুরআনে এ বৈধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

অর্থাৎ তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । আপনি তাদেরকে বলুন, এতে মানুষের কল্যাণ ও বড় গোনাহ রয়েছে । আর এর গোনাহ তার কল্যাণের চেয়ে বড় । [সূরা বাকারা, আয়াত নং ২১৯]

তিরমিযি শরীফের হাদীসে রয়েছে- এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আয়াতটি হযরত উমর (রাঃ) এর সম্মুখে পাঠ করা হলে তিনি দু'য়া করলেন,

اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيان شفاء

"হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করুন" অতঃপর পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না"
এ আয়াতে শুধু নামাযের পূর্বে মদ খাওয়া অবৈধ করা হয়েছে।
এ আয়াত হযরত উমরের সামনে তেলাওয়াত করা হলে, তিনি পূর্বের ন্যায় দু'আ করলেন, হে আল্লাহ মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বিধান দান করুন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদার ৯০ও ৯১ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ পাক বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

অর্থঃ (৯০) হে মু'মিনগন! এই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শর সমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পর মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্বরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?
এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) বললেন,

انتهينا، انتهينا

"আমরা এ সমস্ত জিনিস থেকে বিরত হলাম, বিরত হলাম"[২০১]
[তিরমিযি, হাদীস নং ৩০৪৯]

---

[২০১] سنن أبي داود برقم (3670) وسنن الترمذي برقم (3049) وسنن النسائي (286/8).

এখন কেউ যদি বলে, সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং এ আয়াতে তো মদ হারাম একথা বলা হয়নি। মাতাল অবস্থায় নামায না পড়লেই আয়াতের উপর আমল হয়ে যাবে। সুতরাং নামায ব্যতীত অন্য সময়ে মদ পান করা বৈধ হবে।

সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত, সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত, এগুলো কি সহীহ নয়? এগুলো কি কুরআনের আয়াত নয়? এ দু' আয়াতের আলোকে কি ডাক্তার জাকির নায়েক মদ খাওয়া হালাল বলতে পারবেন? আর তিনি যদি হালাল বলেন, তবে তিনি মুসলমান থাকবেন? অথচ কুরআন সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, কোন কিছু সহীহ হলেই সেটি আমল যোগ্য নয়। চাই তা কুরআন হোক কিংবা হাদীস। কুরআনে যেমন নাসেখ-মানসুখ রয়েছে, রাসূল (সঃ) এর হাদীসেও নাসেখ-মানসুখ রয়েছে। আর এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, মানসুখের (রহিত) উপর আমল করা নিষিদ্ধ এবং নাসেখের (রহিতকারী বিধান) উপর আমল করা আবশ্যক। এছাড়াও হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির উপর আমল করা হয় না। সুনির্দিষ্ট কারণে হাদীস পরিত্যাগ সত্ত্বেও অনেকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পেরে, নিজের অজ্ঞতাকে ইমামদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কালজয়ী উক্তি-

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه .

"প্রত্যেকের অবগত হওয়া জরুরি যে, মুসলিম উম্মাহের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত ইমামদের কোন ইমামই স্বেচ্ছায় রাসূলের কোন সুন্নতের বিরোধিতা করেননি। সুন্নতটি ছোট থেকে ছোট হোক কিংবা বড় থেকে বড়। কেননা তারা সন্দেহাতীত ও নিশ্চিতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ জরুরি এবং রাসূলের কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথাই যেমন গ্রহণ করা যায় আবার প্রত্যাখ্যানও করা যায়। কিন্তু তাদের কারও কাছ থেকে যদি এমন বক্তব্য পাওয়া যায়, যা কোন

সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, তবে বুঝতে হবে তার কাছে অবশ্যই যথার্থ কোন প্রমাণ বা ওজর রয়েছে, যার কারণে তিনি সহীহ হাদীসটি গ্রহণ করেননি ।”[২০২]

কিন্তু বর্তমান যুগের স্বশিক্ষিত তথাকথিত মুজতাহিদগণের অবস্থা কী? তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আলামা আব্দুল গাফফার হিমসি (রহঃ) লিখেছেন-

لأنا نري في زماننا كثيرا ممن ينسب إلي العلم مغترا في نفسه ، يظن أنه فوق الثريا و هو في حضيض الأسفل، فربما يطالع كتابا من الكتب الستة–مثلا–فيري فيه حديثا مخالفا لمذهب أبي حنيفة فيقول: إضربوا مذهب أبي حنيفة علي عرض الحائط ، و خذوا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الحديث منسوخا أو معارضا بما هو أقوي منه سندا، أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به ، و هو لا يعلم بذلك , فلو فوض لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطلقا: لضلوا في كثير من المسائل، وأضلوا من أثاهم من سائل

বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করে ধোঁকায় পতিত রয়েছে। সে মনে করে যে, সে (ইলমের দিক থেকে) ছুরাইয়্যা তারকার উপরে রয়েছে, অথচ বাস্তবতা হল, তার অবস্থান পাতালের তলদেশে। উদাহরণস্বরুপ, এরা সেহাহ্ সেত্তা থেকে কোন একটি হাদীসের কিতাব পড়ে এবং সেখানে কোথাও যদি তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাবের বিপরীত কোন হাদীস পায়, তবে তারা বলে, “আবু হানিফার মাযহাব দেওয়ালে ছুঁড়ে মার, আর রাসূলের হাদীস গ্রহণ করো। অথচ হাদিসটির বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা উক্ত হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী বর্ণনার অন্য কোন হাদীস রয়েছে, অথবা এজাতীয় সুনিশ্চিত কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির আমল পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ সে এর কোনটিই জানে না। এ শ্রেণীর লোকদের হাতে যদি সাধারণভাবে হাদীস অনুসরণের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তারা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি তাদের নিকট যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকেও পথচ্যুত করবে”[২০৩]

ডাক্তার জাকির নায়েক যে দাবী করেছেন, আমি শতভাগ হানাফী, শতভাগ মালেকী, শতভাগ শাফেয়ী, শতভাগ হাম্বলী এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা তাঁর এ বক্তব্য

---

[২০২] রাফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্টা-

[২০৩]দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম, পৃষ্ঠা-১৫

মূলতঃ ইমামদের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মাযহাব সমূহকে খেল-তামাশার বস্তু বানানরই নামান্তর। কারণ আমরা সকলেই জানি যে, একই সাথে চারও মাযহাব অনুসরণ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ডাঃ জাকির নায়েকের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, একমাত্র তিনিই হয়ত সহীহ হাদীস মানতে আগ্রহী। ইমামগণ কি সহীহ হাদীস মানতেন না? কিংবা তাদের অনুসারী কেউ কি সহীহ হাদীস মানে না?

বিষয়টি এমন যেন চৌদ্দশ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিল না, চৌদ্দশ' বছর পরে ডাক্তার জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীসগণ শুধু সহীহ হাদীস পড়ছেন। চৌদ্দশ' বছরের কেউ হয়ত বোখারী পড়েননি, একমাত্র এরাই চৌদ্দশ' বছর পরে এসে বোখারী পড়ছে। যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম যারা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তারা সকলেই সত্তর ভাগ মাযহাবী ছিলেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একশ' ভাগ মাযহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন; তাও আবার একই সাথে চার মাযহাবের একশ' ভাগ অনুসারী।

বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হয়ত সহীহ জানতেন না বা সহীহ হাদীস মানতেন না, এজন্য ডাঃ জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে তারা হলেন, সত্তর ভাগ বা আশি ভাগ মাযহাবী। আমরা সকলেই জানি, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, উসুলবিদ, দঐতিহাসিক প্রায় সকলেই দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ কোন একটা মাযহাব অনুসরণ করেছেন। ডাঃ জাকির নায়েকের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা সকলেই সত্তরভাগ সহীহ হাদীস মানতেন, ইসলামের দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর পরে, ডাঃ জাকির নায়েক দাবী করলেন যে, তিনি একশ' ভাগ সহীহ হাদীস মানেন!

এসম্পর্কে আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেছেন-

ولا تكن حاكما علي جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت إلي مقام لم يصلوه.

“মুমিনদের সকল বিষয়ে তুমি বিচারক সেজো না! তোমার ভাবখানা এমন যে, তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি, তোমার কাছে এমন এলম পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌঁছেনি।”[২০৪]

যারা ইমামদের এসমস্ত কথার অপব্যাবহার করেন, তাদের জন্য আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নিম্নোক্ত উক্তিটি মনে রাখা দরকার-

ومن ظن بأبى حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অথবা মুসলমানদের অন্য কোন ইমামদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে, তারা ক্বিয়াস কিংবা অন্য কোন কারণে সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তবে সে তাদের উপর ভ্রান্ত বিষয় আরোপ করল এবং নিজের ধারণা অথবা প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে তাদের উপর মিথ্যারোপ করল” [মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৩০৪]

সার কথা হল, প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, “হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব” এর অর্থ হল, হাদীসটি আমল যোগ্য হতে হবে। কেননা হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমল যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে সমস্ত মুহাদ্দিস, সমস্ত মুফাসসির, সমস্ত ফকীহ একমত যে, সকল সহীহ হাদীস আমল যোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) লিখেছেন,

أما الأئمة و فقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث إذا كان معمولا به عند الصحابة و من بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق علي تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه علي علم أنه لا يعمل به

“ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোন একটি হাদীস সহীহ হলে, তার উপর তখনই আমল করেন, যখন কোন সাহাবী, তাবেয়ী, অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোন একটি দল থেকে হাদীসটির উপর আমলের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে হাদীসের উপর আমল না করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তার উপর আমল করা জায়েয নেই; কেননা তার উপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তারা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন।”[২০৫]

---

[২০৪] রিসালাতুন ফিল খুরুজি আনিল মাযাহিবিল আরবায়া, আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ), পৃষ্ঠা-২২
[২০৫] প্রাগুক্ত

এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা হল, ইমামগণের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মানুষের মাঝে মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো নিতান্তই দুঃখজনক। প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটি আমার মাযহাব' তাদের এ বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হল,

إذا صلح الحديث للعمل به فهو مذهبي

"অর্থাৎ "হাদীসটি যখন আমল যোগ্য হবে, তখন সেটি আমার মাযহাব হবে"

কিন্তু বর্তমানে আহলে হাদীস বা সালাফীরা এ সমস্ত বক্তব্য উলেখ করে, মানুষের মাঝে মাযহাবের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মাযহাবের বক্তব্যের বিরোধী কোন হাদীস পেলে, সেসম্পর্কে কোন ইলম হাসিল না করেই, মাযহাব এবং মাযহাবের ইমামদের সম্পর্কে বিষোদগার শুরু কওে; অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে, উক্ত হাদীস পরিত্যাগের যথাযোগ্য কারণ রয়েছে।

বর্তমানে যারা সহীহ হাদীস অনুসরণের নামে নতুন নতুন মাযহাবের অবতারণার চেষ্টা করছে, তাদের অধিকাংশ মাসআলা এমন যে, তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরের মুসলিম উম্মাহ একমত। যেমন, এরা বলে বীর্য পাক, এদের অনেকে বলে তা খাওয়া বৈধ, গান-বাদ্য জায়েয, জুমুআর খুতবা যে কোন ভাষায় দেয়া জায়েয, কাযা নামায বলতে কিছু নেই, অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লে কোন সওয়াব হবে না, তারাবী বিশ রাকাত নয়, আট রাকাত ইত্যাদি।

কুরআন অনুসরণ করতে গিয়ে যেমন মদকে হালাল করা যাবে না, তেমনি সহীহ হাদীসের অনুসরণের কথা বলে রহিত হাদীস দিয়ে গান-বাদ্য, বেপর্দা ইত্যাদিকে জায়েয বলা যাবে না। এগুলো মূলতঃ সহীহ হাদীসের অনুসরণ নয়, হাদীস অনুসরণের ছদ্মাবরণে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা।

"হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব" এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্যঃ

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আলামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,

ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه أطلع عليه و رده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا[206]

---

[২০৬] فتح الباري لإبن حجر ২২৩/২ (ফাতহুল বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩)

“ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর উক্ত বক্তব্যের তখনই আমল করা যাবে, যখন এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হবে যে, তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তিনি হাদীসটির উপর আমল করেন নি কিংবা হাদীসটির কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে উক্ত বক্তব্যের আমল করা যাবে না।”

১. আলাম্মা ইবনে হামদান (রহঃ) লিখেছেন,

و ليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتي ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك و يعرف به، و قد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ لما بينه

“প্রত্যেক ফকীহের জন্য এই অনুমতি নেয় যে, বাহ্যিক হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর আমল করবে, যতক্ষণ না সে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করবে যে, এ হাদীসটির সাংঘর্ষিক কোন দলিল আছে কি না, অথবা হাদিসটির বিধান রহিত কি না। এ ব্যাপারে সে যদি জ্ঞান না রাখে, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনেক হাদীসের উপর ইচ্ছা করেই আমল করেননি, কেননা তাঁর নিকট সে সমস্ত হাদীসের বিধান রহিত ছিল (মানসুখ)।”[২০৭]

قال النووي في " شرح المهذب " (104/1) : هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال : هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره ، وإنما هذا فيمن له رتبة الإجتهاد في المذهب ، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته ، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه ، وماأشبهها ، وهذا شرط صعب قل من يتصف به ، وإنما اشترطوا ماذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك ، قال الشيخ أبو عمرو – هو الإمام ابن الصلاح – : ليس العمل بظاهر ماقاله الشافعي بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث . أهـ

ইমাম নববী (রহঃ) “শরহুল মুহাজ্জাব”এ লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যে বলেছেন “হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব” এর অর্থ এই নয় যে, যে

---

[২০৭] صفة الفتوي إبن حمدان-৩৮

কেউ সহীহ্ হাদীস দেখলেই বলবে যে, এটি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মাযহাব এবং বাহ্যিক হাদীসের উপর আমল করবে। বরং এটিই তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। এর জন্য শর্ত হল, তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে, শাফেয়ী (রহঃ) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হননি অথবা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর সকল কিতাব অধ্যয়ন করা হবে এবং তাঁর নিকট থেকে যারা ইলম শিক্ষা করেছে, তাদের সব কিতাব মুতায়ালা করতে হবে। এটি একটি কঠিন শর্ত, যা অল্প সংখ্যক লোকই অর্জন করতে পারে। ফকীহগণ পূর্বোক্ত শর্তগুলো একারণে আরোপ করেছেন যে, কোন একটি হাদীস ত্রুটিযুক্ত, রহিত, সুনির্দিষ্ট অথবা হাদীসটির ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার কারনে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনেক সহীহ হাদীসের উপর আমল করেননি অথচ তিনি এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং এর জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর নিকট সুনির্দিষ্ট দলিল ছিল। শায়খ আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যা বলেছেন, তার বাহ্যিকের উপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকীহ হাদীসকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর আমল করতে পারবে না”

মূলতঃ রাসূলের হাদীস বর্ণনার দিক থেকে সহীহ হলেই সেটি আমল যোগ্য নয়। সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে দেখতে হবে, এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন হাদীস বা কুরআনের কোন নির্দেশনা আছে কি না। হাদীসটির বিধান রহিত কি না, ইত্যাদি। একজন সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বড় বড় আলেমদের পক্ষেও এ বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা কঠিন। যারা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন, তারাই কেবল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

শরীয়তের বিষয়ে যারা কোন জ্ঞান রাখে না, অথবা জ্ঞান থাকলেও যেটা ইজতেহাদের জন্য যথেষ্ঠ নয়, তারা সহীহ হাদীস পেলেই সেটা নিয়ে খুব মাতামাতি করে। অনেকে হয়ত এতটুকু জানে না, সহীহ হাদীস কাকে বলে, কখন সহীহ হাদীসের উপর আমল করা যায় এবং কখন সহীহ হাদীসের উপর আমল করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ একটি ঘটনা র্বণনা করেছেন–
শায়খ আব্দুল গাফফার (রহঃ) "দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম" নামক একটি কিতাব রচনা করেন । এ কিতাব রচনার মূল কারণ ছিল, শামের তরাবুলুস শহরের এক লোক হোম্‌স শহরে আসে এবং শায়খকে বলে যে, আমাদের ওখানে একজন লোক রয়েছে, যার বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না, সে কাফের ।

তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে তার কথার যুক্তি দেখাল যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না, আর যার নামায সহীহ হল না, সে কেমন যেন নামায পড়ল না । আর যে নামায পড়ল না, সে কাফের"

তখন শায়খ আব্দুল গাফফার (রহঃ) এক বৈঠকে, দু'ঘন্টার মাঝে উক্ত কিতাব রচনা করে তরাবুলুস শহরের ঐ লোককে দিয়ে দিলেন ।"

এজন্যই হয়ত ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম লায়স বিন সা'য়াদ (রহঃ) এর ছাত্র, আবু মুহাম্মাদ আব্দলাহ বিন ওহাব (রহঃ) বলেছেন,

الحديث مضلة إلا للعلماء[২০৮]

"আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হল ভ্রান্তির কারণ"

ইমাম আবু যায়েদ কাইরাওয়ানী (রহঃ) লিখেছেন,

قال الإمام إبن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (قال إبن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء) يريد: أن غيرهم قد يحمل شيئا علي ظاهره و له تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفي عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء، مما لا يقوم به إلا من استبحر و تفقه)[209]

---

[২০৮] ترتيب المدارك١/٩٦ للإمام القاضي عياض رحمه الله (তারতীবুল মাদারেক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৬)

[২০৯] الجامع-ص-١١٨ (আল-জামে, পৃষ্ঠা-১১৮)

“আলামা ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হল, ভ্রান্তির কারণ। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা হয়ত হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করবে, অথচ অন্য কোন হাদীস দ্বারা এর ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথবা অন্যদের নিকট হাদীসের দলিল অস্পষ্ট থাকবে, অথবা হাদীসটি মূলতঃ আমলযোগ্য নয়, যার সুস্পষ্ট কোন কারণ রয়েছে, যা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না”

আমাদের সমাজে দেখা যায়, শরীয়তের বিষয়ে যাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা কোন এক ইমামের এধরণের উক্তি মুখস্থ করে নিজেও যেমন ধোঁকায় পড়ে এবং অন্যকেও ধোঁকায় ফেলে। একথা বললে, অনেকেই হয়ত বলবেন, নবীজীর হাদীসের উপর একজন আমল করছে আর তার ব্যাপারে ভ্রান্ত হওয়ার ফয়সালা দেয়া হবে?

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন,

و هنا تثور ثائرة أدعياء الدعوة إلي العمل فيقولون: هل يجوز لكم أن تحكموا بالضلال علي من يعمل بالسنة و يفتي الناس بها؟!

فنقول : نعم إذا لم يكن أهلا لهذا المقام، فحكمنا عليه بالضلال لا لعمله بالسنة، معاذ الله بل لتجرئه علي ما ليس أهلا له[২১০]

“আমাদের সমাজে কিছু দায়ী রয়েছে, যারা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করবেন, আপনারা এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন, যে রাসূলের সুন্নাহের উপর আমল করার নির্দেশ দিচ্ছে এবং সুন্নাহের আলোকে মানুষকে ফতোয়া দিচ্ছে?

আমরা বলব, যেহেতু সে এ কাজের যোগ্য নয়, এজন্য তাকে আমরা তার ভ্রান্তির ব্যাপারে ফয়সালা দিচ্ছি, সে সুন্নাহের উপর আমল করছে এ কারণে নয়। বরং সে যে বিষয়ের যোগ্য নয়, সে বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্য।”

---

[২১০] أثر الحديث الشريف في إختلاف الأيمة الفقهاء-ص-৫৭ (আসরুল হাদিসিশ শরীফ ফি ইখতিলাফিল আইম্মাতিল ফুকাহা, পৃষ্ঠা-৫৭)

ইমামগণ হয়ত হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না

ডাঃ জাকির নায়েক চার মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তার মাঝে উলেখযোগ্য একটি অভিযোগ হল, চার ইমামের যুগে হাদীসের সংকলন চলছিল, এজন্য হয়ত তাদের নিকট সংশিষ্ট হাদীসটি পৌঁছেনি।

এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-
"চার ইমামের যুগে হাদীসের সংকলন চলছিল। সুতরাং সম্ভবত হয়ত হাদীসটি ইমামের নিকট পৌঁছেনি। তিনি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন।"

The process of compilation of the Hadith was going on[211]

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, এক ব্যক্তির পক্ষে রাসূলের (সঃ) এর সমস্ত হাদীস সংগ্রহ করা কিংবা সেগুলো আয়ত্ব করা অসম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন,
مَنْ إعتقد أَنَّ كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأيمة، أو إماما معيناً: فهو مخطيء خطأ فاحشا قبيحا[২১২]

"যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, সমস্ত সহীহ হাদীস সকল ইমামের নিকট পৌঁছেছে কিংবা কোন একজন ইমামের নিকট পৌঁছেছে, তবে সে সুস্পষ্ট ও নিকৃষ্টজনক ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে।"

আলামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন,
غير لايق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا و اتقانا، حتي ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال : من إدعي أن السنة إجتمعت كلها عند رجل واحد: فسق ، ومن قال : إن شيئا منها فات الأمة : فسق[২১৩]

---

[২১১] Stickly Following a Madhab _ Dr Zakir Naik _ part - 1 - of - 2 - YouTube_1
[২১২] রাফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৭
[২১৩] আন্-নুকাতুল ওফিয়্যা, পৃষ্ঠা-২৬

“কোন ইমামকে এ বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করা অনুচিৎ যে, তিনি সমস্ত হাদীস মুখস্থ ও আয়ত্ত্ব করেছেন। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দাবী করল যে, রাসূলের সমস্ত সুন্নাহ কোন এক ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত হয়েছে, সে ফাসেক হয়ে গেল, আর যে ব্যক্তি এ দাবী করল যে, সুন্নাহের কিছু অংশ উম্মতের নিকট পৌঁছে নি সেও ফাসেক হয়ে গেল”

এ সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহের পক্ষে সমস্ত হাদীস মুখস্থ বা আয়ত্ত্ব করা সম্ভব ছিল না। এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার।

এখন বিষয়টি যদি এমন হয় যে, হয়ত হাদীসটি সংশিষ্ট মাযহাবের ইমামের নিকট পৌঁছেনি, তবে আমরা কিভাবে সে মাযহাব অনুসরণ করতে পারি?

এ প্রশ্নের সমাধান হল, ইজতেহাদের জন্য রাসূল (সঃ) এর সমস্ত হাদীস মুখস্থ কিংবা আয়ত্ত্বে থাকা শর্ত নয়। বরং ইজতেহাদের জন্য যে পরিমাণ হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, প্রত্যেক ইমামই সে পরিমাণ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন,

ولا يقولن به قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا! لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلي الله عليه و سلم أو فعله فيما يتعلق با الأحكام : فليس في الأمة علي هذا مجتهد ، وإنما غاية العالم : أن يعلم جمهور ذلك و معظمه، بحيث لا يخفي عليه إلا القليل من التفصيل[214]

“কারও পক্ষে এ দাবী করার কোন সুযোগ নেই যে, যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর সমস্ত হাদীস এবং হুকুমের সাথে সংশিষ্ট সমস্ত আমল সম্পর্কে অবগত না হবে, সে ইজতেহাদ করতে পারবে না। কেননা যদি ইজতেহাদের জন্য এ শর্ত করা হয়, তবে উম্মতে মুসলিমার মাঝে একজনও মুজতাহিদ পাওয়া সম্ভব নয়। বরং মুজতাহিদ আলেমের উদ্দেশ্য থাকবে, সে হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান অর্জন করবে যে, খুব নগন্য সংখ্যক বিষয় ব্যতীত অধিকাংশই তার নিকট সুস্পষ্ট থাকবে”

---

[২১৪] রাফউল মালাম আন-আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৯

আর পৃথিবীর সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, চারও ইমাম ইজতেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ।
চারও মাযহাবের কিতাব সমূহে সামান্য কিছু বিষয় ব্যতীত অধিকাংশ বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান বিদ্যমান রয়েছে ।

যেমন আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহঃ) লিখেছেন একদা আল্লামা ইবনে খোজাইমা (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল,
هل تعرف سنة لرسول الله صلي الله عليه وسلم من الحلال و الحرام لم يودعها الشافعي رحمه الله كتابه؟ قال: لا

অর্থাৎ আল্লামা ইবনে খোজাইমা (রহঃ) কে জিজ্ঞে করা হয়েছিল যে, আপনি কি হালাল-হারাম বিষয়ক এমন কোন সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত আছেন, যা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাঁর কিতাবে উলেখ করেন নি । তিনি উত্তর দিলেন, না”

অর্থাৎ সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ কিংবা তাঁর ছাত্রগণ সুস্পষ্ট সমাধান দিয়ে গেছেন ।

কিন্তু এ বিষয়টিকে মাযহাবের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাটা অবান্তর । অথচ বর্তমানে দেখা যায়, অধিকাংশ লা-মাযহাবী বা সালাফী কোন একটি হাদীসকে কোন ইমামের বক্তব্যের বিপরীতে পাওয়া মাত্রই এই রায় দিয়ে দেন যে, হয়ত তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না । যেমন ডাঃ জাকির নায়েক “নামাযে আমীন জোরে বলার হাদীসগুলো সম্পর্কে বলেছেন, হয়ত ইমাম আবু হানীফা হাদীসগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন না । কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, এ বিষয়টি এতটা প্রসিদ্ধ যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর সময়ে রীতিমত তর্ক-বিতর্কও হয়েছে ।

সুতরাং যে কোন হাদীস পেলেই একথা বলা নিতান্ত বোকামী যে, May the Hadith did not reach the Imam (হয়ত হাদীসটি ইমামের নিকট হাদীসটি পৌছেনি) । কেননা সুনিশ্চিতভাবে অবগত না হয়ে তাঁর সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য করা তাঁর উপর মিথ্যা আরোপের নামান্তর ।

তবে কোন হাদীস প্রসঙ্গে যদি ইমাম বলে থাকেন যে, এ সম্পর্কে আমি কোন হাদীস জানি না, সেক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, তিনি এ সম্পর্কে কোন হাদীস জানেন না। কিন্তু ইমামের পক্ষ থেকে যদি সংশিষ্ট বিষয়ে এ ধরণের কোন উক্তি না পাওয়া যায়, তবে ইমামের সমস্ত কিতাব এবং তাঁর নিকট থেকে যারা ইলম হাসিল করেছে, তাদের কিতাবগুলো খুঁজে দেখতে হবে, এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম অবগত ছিলেন কি না। যদি সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে এ কথা বলা বিশুদ্ধ যে, ইমাম হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যে কোন হাদীস নিজের মতের স্বপক্ষে হলেই সেটা গ্রহণ করে এ কথা বলা যে, হয়ত ইমাম হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, নিতান্ত মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ বলেছেন, অনেককে দেখা যায়, তারা বলে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) "লা সালাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব" হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর "মুসনাদে" হাদীসটি কয়েকবার উলেখ করেছেন।
সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে অবগত না হয়ে এ দাবী করা যে, ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, ইমামের প্রতি সুস্পষ্ট মিথ্যা আরোপের নামান্তর।
এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়াামাহ লিখেছেন,

أن النافي عن إمام إطلاعه علي هذا الحديث، إنما يرجم بالغيب ، و يتقول علي إمام من أئمة المسلمين بغير علم و لا حجة و لا برهان فهل قال له هذا الإمام : إني لم أطلع علي هذا الحديث؟!

অর্থাৎ' ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না' এ কথার প্রবক্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে না জেনে, অনুমান করে বলে থাকে। এবং বড় বড় ইমামাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বানিয়ে বানিয়ে বলে থাকে। **তাকে কি ইমাম একথা বলেছেন যে, আমি এ হাদীসটি সম্পর্কে অবগত নই।"** সুতরাং যে কারও পক্ষে যে কোন হাদীস সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া এ কথা বলা আদৌ বৈধ নয় যে, ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।[২১৫]
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন-

---

[২১৫] আসরুল হাদীসিশ শরীফ, পৃষ্ঠা-১৬৬

الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية

হাদীসের কিতাব সমূহ সংকলনের পূর্বে যারা ছিলেন, তারা পরবর্তীদের তুলনায় রাসূল (সঃ) সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা অসংখ্য হাদীস এমন রয়েছে যে, সেটি তাদের নিকট বিশুদ্ধ ও সহীহ সূত্রে পৌঁছেছে, যা পরবর্তীতে আমাদের নিকট অস্পষ্ট, অজ্ঞাত কিংবা বিচ্ছিন্ন সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। অথবা হয়ত হাদীসটি আমাদের নিকট একেবারে পৌঁছে নি। সুতরাং তাদের কিতাব ছিল, তাদের অন্তর, যাতে সংকলিত হাদীসের কিতাবের তুলনায় বহুগুণ বেশি হাদীস সংরক্ষিত ছিল। এবং এটি এমন একটি বাস্তবতা, যার ব্যাপারে কেউই সন্দেহ পোষণ করবে না”[২১৬]

শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন-

ولو زعم زاعم أنه تتبع كل التتبع جميع كتب الإمام، فلم يجد فيها هذا الحديث بعينه: لما ساغ له أن ينفي عنه علمه به، ألا تري لو فتشت عن حديث صحيح في كتابي البخاري و مسلم، فلم تجده فيهما، لا يجوز لك أن تنفي عنهما علمها به و تقول: هذا حديث صحيح لم يعرفه الإمامان العظيمان: البخاري و مسلم؟؟ فما أعظم علمك إذا؟! و أي إمام أنت!!

“কেউ যদি মনে করে যে, সে ইমামের সমস্ত কিতাব পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করেছে এবং সে সংশিষ্ট হাদীসটি ইমামের কোন কিতাবে পায় নি, তবে কি সে এ সিদ্ধান্ত দিতে পারবে যে, ইমাম হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? যেমন, তুমি কোন একটি সহীহ হাদীস সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম শরীফে অনুন্ধান করলে, অথচ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমে পেলে না, তখন তোমার জন্য তাদের হাদীসটি সম্পর্কে অবগত না হওয়ার ফয়সালা দেয়া জায়েয নয় এবং এ কথা বলা আদৌ বৈধ নয় যে, এই হাদীসটি সহীহ! অথচ বিখ্যাত দু'মুহাদ্দিস তথা বোখারী (রহঃ) ও মুসলিম দু'জনের একজনও হাদীসটি সম্পর্কে জানেন না। তোমার বক্তব্য যদি এমন হয়, তবে তুমিই বা কত বড় বিদ্বান ! আর কোন ইমাম...![২১৭]

---

[২১৬] রাফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৮

[২১৭] আসরুল হাদীসিশ শরীফ, পৃষ্ঠা-১৬৬

কোন মাযহাব সঠিক?

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-
"একইভাবে বলা যায়, কে সঠিক অথবা কোন মাযহাব সঠিক? হানাফী না কি শাফেয়ী? একই সাথে দু'টি বিপরীত বিষয় কখনও সমান হতে পারে? উত্তর হল, না।[২১৮]

ডাঃ জাকির নায়েক এখানে চার মাযহাবের কোনটি সঠিক অথবা কোনটি অধিক সঠিক, সেটা বের করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের চেক করে দেখতে হবে, কোনটি সঠিক।

ডাঃ সাহেব বলেছেন, "আমাদের" চেক করে দেখতে হবে। তিনি এখানে কাদেরকে চেক করার কথা বলেছেন? আমাদের বলতে ডাঃ জাকির নায়েক কাদেরকে বুঝিয়েছেন? তিনি নিজে না কি তার শ্রোতা বা দর্শকরা?

১. ডাঃ জাকির নায়েকের লেকচারে তো অনেক অমুসলিমও থাকে, তারা চেক করে দেখবে যে, চার মাযহাবের কোনটি সঠিক? চার মাযহাবের কোন মাযহাবে কি কি ভুল আছে?
২. আর যদি ধরে নেই যে, জাকির নায়েকের ঐ লেকচারে কোন অমুসলিম ছিল না, সব মুসলমান ছিল, এখন তিনি যখন তার মুসলমান শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন,

We have to check…

"আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে.."
এখানে ডাঃ জাকির নায়েক কাদেরকে দায়িত্ব দিলেন? তিনি কি তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, যারা ফেকাহশাস্ত্র তো দূরে থাক, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন ধারণনা রাখে না।

শরীয়তের বিষয়ে যারা অজ্ঞ, যাদের ইসলাম ও ইসলামের ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কে একাডেমিক জ্ঞান তো দূরে থাক, মৌলিক কোন জ্ঞানই নেই, তাদেরকে তিনি এমন

---

[২১৮] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, পার্ট-১, মিনিট-১৮
http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

ব্যক্তিদের ভুল ধরার দায়িত্ব দিচ্ছেন, যারা ঐ বিষয়ে ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ । আমরা এ দাবী করছি না যে, তারা কোন ভুল করেন নি কিংবা তাদের ভুল ছিল না, তারা ভুল করতে পারেন, সেটা ধরাও অন্যায় না, কিন্তু যে কারও ভুল যে কেউ ধরতে পারবে? যার কোন ধারণা নেই, তাকে ঐ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারীদের ভুল ধরার জন্য বিচারকের আসনে বসিয়ে দেয়া কি সমীচিন? বিষয়টি এমন যে, কেউ সাইন্সের স'টাও জানে না, তাকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, তুমি আইনস্টাইনের ভুল বের করো । তুমি নিউটনের ভুল বের করো । তাদের ভুল করাটা অসম্ভব নয়, কিন্তু যাকে ভুল বের করতে দেয়া হলো, তাকে এ দায়িত্ব দেয়াটা যে গুরুতর অন্যায় এ কথা প্রত্যেক বিবেকবানই স্বীকার করতে বাধ্য ।

কেউ হয়ত বলতে পারে, ভুল বের করবেন, ডাঃ জাকির নায়েক, আর শ্রোতারা সেটা গ্রহণ করবে । আমাদের নিকট এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ডাঃ জাকির নায়েক তাকলীদের ঘোর বিরোধী । শরীয়তের কোন বিষয়ে কারও অনুসরণ করা যাবে না । এখন ডাঃ জাকির যদি কোন সিদ্ধান্ত দেন, তবে শ্রোতারা সেটা মানতে যাবে কেন?

ইমাম আবু হানিফার দেয়া ফতোয়া আর মাসআলা গ্রহণ করতে যদি সমস্যা থাকে, তবে মানুষ জাকির নায়েকের দেয়া ফতোয়া আর মাসআলা কোন যুক্তিতে গ্রহণ করবে? ইমাম শাফেয়ীর মত যুগশ্রেষ্ঠ আলেমের দেয়া মাসআলার উপর আমল করতে যদি সমস্যা থাকে তবে ডাক্তার জাকির নায়েকের কথা মানুষ গ্রহণ করবে কেন? এখানে কি ব্যক্তির অনুসরণ হল না?

জাকির নায়েক যদি ভুল বের করেন, তবে সেটা তিনি তার লেকচারে বলবেন কেন? কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, ইসলামে কারও মতামত গ্রহন করা যাবে না । এখন যদি মাযহাবে ভুল বের করতেই হয়, তবে শ্রোতাদের প্রত্যেকেই গবেষণা করে ভুল বের করবে এবং একজনের গবেষণা আরেকজন অনুসরণ করতে পারবে না । কারণ এক্ষেত্রেও একজন অপরজনকে তাকলীদ করা হবে ।

সাইন্টিস্টরা ভুল করেন না, তা নয় । সবাই ভুল করেন । তবে সাইন্টিস্টদের ভুল ধরতে কি পলিটিশিয়ানরা যাবেন? না কি ইকোনমিস্টরা? এ বিষয়টি জ্ঞানের সকল শাখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন

প্রত্যেক ইমামই তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা আমার অনুসরণ করো না। ডাঃ জাকির নায়েক মাযহাবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করছেন, তন্মধ্যে উলেখযোগ্য একটি অভিযোগ হল, প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং আমরা কেন তাদের অনুসরণ করব? এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম ইমামদের বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করব এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে বেশ কিছু উক্তি বর্ণিত আছে, যেখানে তিনি তাঁর কথা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه

- "কারও জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে আমরা কোথা থেকে সেটি গ্রহণ করেছি, সে সম্পর্কে অবগত হবে"[২১৯]
- তিনি আরও বলেন,

ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي

"হে ইয়াকুব! তোমার ধ্বংস হোক! আমার নিকট থেকে যা শোনো, তাই লিপিবদ্ধ করো না, কেননা আমি আজ যে মতটা পছন্দ করি, কাল তা ত্যাগ করি। কাল এক মত গ্রহণ করি, পরশু সেটিও ত্যাগ করি। আমি যদি কখনও এমন কথা বলি যা, আলাহ ও আলাহর রাসূলের বিপরীত হয়, তবে আমার কথা পরিত্যাগ করো।[২২০]

---

[২১৯] (ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " 293/6

[২২০] الفلاني في الإيقاظ ص 50

ইমাম মালেক (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

- এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন,

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

“নিশ্চয় আমি একজন মানুষ, আমি ভুলও করি আবার সঠিকও করি। সুতরাং তোমরা আমার মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে! আমার যে মতটি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, সেটি গ্রহণ করো এবং যেটি কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীত, তা পরিত্যাগ করো।[২২১]

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ প্রসঙ্গে বলেন,

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد

আমার কিতাবে যদি রাসূলের সুন্নতের খেলাফ কোন কথা পাও, তবে তোমরা সুন্নাহের উপর আমল করো এবং আমি যা বলেছি, সেটি ত্যাগ করো।[২২২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) ইমামদের তাকলীদ প্রসঙ্গে বলেন,

لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا

---

[২২১] (ابن عبد البر في الجامع 32/2)

[২২২] النووي في المجموع 63/1

তোমরা আমার অনুসরণ করো না এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এদেরও অনুসরণ করো না। তারা যেখান থেকে গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে গ্রহণ করো[223]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন,

لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير

"তোমার দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না, রাসূল (সঃ) এবং তার সাহাবীগণ যা নিয়ে এসেছেন, সেগুলো গ্রহণ করো। অতঃপর তাবেয়ীগণের অনুসরণ করো, তবে এব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন"

যুক্তির দাবী হল, প্রত্যেক ইমাম যেহেতু তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং তাদেরকে অনুসরণ করা কিভাবে বৈধ হয়? আর বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তাদের নিষেধ সত্ত্বেও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কেন তাদের অনুসরণ করে! দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ কেন ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করলো? অথচ স্বয়ং ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন!

প্রথমতঃ লক্ষ করার বিষয় হল, ইমামগণ যদি তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ নাও করতেন, কিংবা যদি ধরে নেই যে, পৃথিবীতে কোন মাযহাব নেই, তবে কি কারও পক্ষে ইজতেহাদের যোগ্যতা অর্জন না করে মাসআলা দেয়া জায়েয হবে? কারও পক্ষে কি কুরআন ও হাদীসের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন না করে ফতোয়া দেয়া বৈধ হবে?

পৃথিবীর সব উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, "শরীয়তের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া জায়েয নেই।

---

[২২৩] 302/2 ابن القيم في إعلام الموقعين (ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০২)

আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) "ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন" এ বিষয়ে আলাদা একটা পরিচ্ছেদ তৈরি করেছে এবং এর শিরোনাম দিয়েছেন,

تحريم القول على الله بغير علم

"আলাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা হারাম"

এ শিরোনামের অধীনে শরীয়তের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে ফতোয়া বা মাসআলা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এ শিরোনামের অধীনে লিখেছেন,

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ.... وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه

"আলাহ তায়ালা ফতোয়া ও বিচারের ক্ষেত্রে না জেনে কোন কথা বলাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। এবং একে বড় বড় কবিরা গোনাহের অন্তর্ভূক্ত করেছেন বরং একে কবিরা গোনাহের প্রথম স্তরে রেখেছেন।

আলাহ তায়ালা বলেছেন,
"আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আলাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আলাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।"

এখন কারও জন্য যদি যথেষ্ঠ যোগ্যতা অর্জন না করে ফতোয়া দেয়া জায়েয না হয়, তবে একজন সাধারণ মানুষ যে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে পারে না, সে কী করবে?

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন,

"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح"

"যদি কারও নিকট রাসূল (সঃ) এর লিখিত হাদীসের কিতাবসমূহ থাকে এবং সাহাবা, তাবেয়ী, তাবেয়ীনদের মতপার্থক্য যদি তার জানা থাকে, তবে তার জন্য যে কোন একটাকে গ্রহণ করে তার উপর আমল করা কিংবা তার দ্বারা বিচার করা জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, কোনটি গ্রহণ করবে? অতঃপর সে সঠিকটার উপর আমল করবে ।
[ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,

"لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة"

"কুরআন ও সুন্নহের ইলম ব্যতীত কারও জন্য ফতোয়া বা মাসআলা দেয়া জায়েয নেই ।"
[ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫]

"ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي"

"যে ফতোয়া দিবে তার জন্য পূর্ববর্তীদের কথা অবগত না হয়ে ফতোয়া দেয়া উচিৎ নয় ।"

সুতরাং এ সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, প্রত্যেকেই ফতোয়া বা মাসআলা দিতে পারবে না । বরং এর জন্য যারা যোগ্য, একমাত্র তারাই ফতোয়া দিবে । সুতরাং ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্য থেকে এ উদ্দেশ্য নেয়া যে, তারা যোগ্য-অযোগ্য প্রত্যেককে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা রের করতে বলেছেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এটি তাদের কথার অপব্যাখ্যার নামান্ত র ।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) একদিকে বলছেন যে, চার লক্ষ্য হাদীস মুখস্থ না করে এবং উলামাদের বক্তব্য ও মতবিরোধ সম্পর্কে অবগত না হয়ে কেউ

মাসআলা দিতে পারবে না, অন্যদিকে তিনি কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন, সুতরাং এ বিষয় দু'টির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করলেই তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রত্যেক ইমামের নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এ সমস্ত শর্ত কারও মাঝে বিদ্যমান না থাকলে তার জন্য শরীয়তের বিষয়ে মাসআলা দেয়া বৈধ নয়। অতএব, ইমাম আহমাদ ইবনে (রহঃ) যখন মাসআলা দেয়ার জন্য ইজতেহাদের যোগ্য হওয়ার শর্ত দিয়েছেন, সুতরাং তিনি কখনও ইজতেহাদের অযোগ্য লোককে একথা বলতে পারেন না যে, 'ইমামদের অনুসরণ করো না।'

সুতরাং এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে ইমামগণ কাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন এবং তাদেরকে কী নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমামগণ কাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ নির্দেশ প্রদান করেছেনঃ
ইমামগণ যে তাঁদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এ নিষেধাজ্ঞা কাদের জন্য প্রযোজ্য, সেটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের এমন ছাত্রদেরকে তাঁরা এ নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইজতেহাদের যোগ্য। এবং প্রত্যেকেই সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করার যোগ্য ছিলেন।

একজন মুজতাহিদ কখনই আরেক মুজতাহিদকে একথা বলতে পারেন না যে, 'তুমি আমার অনুসরণ করো'। যেমন একজন সাইন্টিস্ট আরেকজন সাইন্টিস্টকে বলতে পারেন না যে, তুমি আমার গবেষণার উপর নির্ভর করো। বরং প্রত্যেকেই নিজস্ব গবেষণার আলোকে সিদ্ধান্ত দিবে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন এবং কী বলেছেন। ইমামগণ তাদের ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরাও গবেষণা করো। শুধুমাত্র আমার কথার উপর নির্ভর করো না। সুতরাং যারা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে পারে না অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করাটা নিতান্তই বোকামী।

قال ابو داود: قلت لأحمد: " الأوزاعي اتبع أم مالكا؟ قال: " لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء!! ما جاء عن النبي فخذ به"

যেমন ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি ইমাম মালেককে অনুসরণ করবো না কি ইমাম আওযায়ীকে?
ইমাম আহমাদ (রহঃ) উত্তর দিলেন,

"لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء!! ما جاء عن النبي فخذ به"

“দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না। হুজুর (সঃ) থেকে যা কিছু এসেছে, সেগুলি গ্রহণ করো”
[ই’লামুল মুওয়াক্বিয়ীন, আলামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০০]

এখানে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইমাম আবু দাউদকে বলেছেন, তুমি তাদের অনুসরণ করো না। ইমাম আবু দাউদের মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিসকে নিষেধ করেছেন। এমন নয় যে, যাদের শরীয়তের বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই, কিংবা যাদের জ্ঞান সীমিত, তাদের জন্য এ কথা বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মুযানী (রহঃ) কে বলেছেন,
قال الشافعي للمزني: " يا إبراهيم، لا تقلدني في كل ما اقول!! وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين."
“হে ইবরাহিম! আমার প্রত্যেকটি কথার উপর আমল করো না। বরং সে ব্যাপারে তুমিও চিন্তা করো। কেননা এটি দ্বীন।
[আল-মাল মাদখাল লিদিরাসাতিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, আহমাদ শাফেয়ী, পৃষ্ঠা-১০৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমামগণ কাদেরকে কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের সময়ে কেউ যদি ইমাম মুযানি (রহঃ) যে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, তার তিন ভাগের একভাগও অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য হয়ত একথা মেনে নেয়া সম্ভব যে, সে ইমামদের তাকলীদ করবে না। কিন্তু অযোগ্য লোকদের জন্য এবিষয়টি কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়।

ইমামগণ কী বলেছেনঃ

ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে যে নিষেধ করেছেন, তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ হল,

وخذ من حيث أخذوا

“তারা যেমন সরাসরি কুআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে মাসআল গ্রহণ করো ।”

এ নির্দেশ তাদেরকেই প্রদান করা হয়েছে, যারা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ ।

মূল বিবেচনার বিষয় এটিই । ইমামগণ শুধু তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেননি, সাথে সাথে এও বলেছেন, তোমরা কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করো ।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের মুখে এধরণের কথা কখনও শোভা পায় না যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন । ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফকে নিষেধ করেছেন, যিনি একজন বিখ্যাত মুজতাহিদ ছিলেন । তিনি আমাদের মত অজ্ঞ-মূর্খদেরকে বলেননি যে, আমাদের অনুসরণ করো না । তাদের উদ্দেশ্য যদি সেটিই হত, তবে তারা জীবনেও কখনও কোন ফতোয়া দিতেন না । কেননা, অনুসরণের বিষয় আসে পরে । ইমাম ফতোয়া না দিলে, মানুষ অনুসরণই করতে পারত না । ইমামগণ সর্ব-সাধারণ সকলকে যদি সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলতেন তবে তাদের নিকট কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এলে বলে দিতেন, “কুরআন ও হাদীস দেখে নাও” ।

কিন্তু বাস্তবতা হল, তারা সাধারণ মানুষের জন্য গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উলামাদের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করতেন । কেননা এ ব্যাপারে সকল যুগের সকল উলামা একমত যে, শরীয়তের বিষয়ে অনুমান করে কোন মাসআলা দেয়া জায়েয নেই ।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ নির্দেশনা নয়। বরং এ ব্যাপারে উলামায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য অন্যের অনুসরণ করা জরুরি।

কিন্তু আমাদের সমাজে একশ্রেণীর অজ্ঞ লোক রয়েছে, যারা নিজেদেরকে শরীয়তের বিষয়ে অনেক বড় জ্ঞানী মনে করে, তারা নিজেদেরকে মহা জ্ঞানী মনে করলেও তারা যে জানে না কিংবা খুব কম জানে, সেটিও তারা জানে না।
এ সম্পর্কে শেখ সা'দী (রহঃ) বলেছেন-

خواجہ پندارد کہ حاصلے اوست   حاصلے خواجہ بجز پندارد نیست

"অর্থাৎ খাজা ধারণা করেছে যে, তার অনেক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার এই ধারণাটুকু ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় নি।"
এ বিষয়ে প্রত্যেকের সুস্পষ্ট ধারণা রাখা উচিৎ যে, ইমামগণ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ সমস্ত কথা বলেননি, যারা ইজতেহাদের যোগ্য নয়। অথচ বর্তমান সময়ে দু'একটি হাদীস পড়ে, হাদীসের দু'একটি কিতাব পড়ে, মুজতাহিদ হওয়ার দাবী করে বলেন যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমামগণ সেসমস্ত লোককে কিভাবে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দিবেন, যারা কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের কাতারে। কেউ যদি ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যকে অসৎ উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োগ করতে চায়, তবে সে নিঃসন্দেহে ইমামের উপর মিথ্যারোপ করল।
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর নিম্নের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে-

আল্লামা মাইমুনী (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) আমাকে বলেছেন,

يا أبا الحسن ! إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيه إمام

"হে আবুল হাসান! যে মাসআলায় তোমার কোন ইমাম নেই, সে মাসআলায় সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাক।[২২৪]

---

২২৪ মানাকেবে আহমাদ, আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ), পৃষ্ঠা-১৭৮

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে-

من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ

"যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে কথা বলল, যে বিষয়ে তার কোন ইমাম নেই, তবে আমি তার ভুল করার ব্যাপারে ভয় করছি"[২২৫]
[আল-ফুরু, আলামা ইবনে মুফলিহ্ (রহঃ), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮০]

إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق

হযরত আছরম (রহঃ) বলেন-ইমাম মালেক (রহঃ) পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত ইলমকেই ইলম বলতেন"[২২৬]
[আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২]
এ সমস্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাঁর এক ছাত্রকে বলছেন, কারও অনুসরণ করে না, সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো, আরেকজনকে বলছেন, কোন ইমামের অনুসরণ ব্যতীত কোন মাসআলা প্রদান করো না। তবে কি তিনি স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন? কখনও নয়। বরং তিনি যে ইজতেহাদের যোগ্য, যে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে সক্ষম তাকে বলেছেন, তুমি কাউকে অনুসরণ করো না, সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো। অথচ বর্তমান সময়ে মাসআলা বের করা তো দূরে থাক, শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে যার অবস্থান পাতালে, সে নিজেকে মনে করে যে, সে ছুরাইয়্যা তারকার উপর রয়েছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) এর নিচের উক্তিটি লক্ষ্য করুন!

عن خلف بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتيا حتي سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، سألت ربيعة و سألت يحي بن سعيد، فأمراني بذلك فقلت له: يا أبا عبد الله! فلو نهوك؟ قال : كنت أنتهي ، لا ينبغي لرجل أن يري نفسه أهلا لشيئ حتي يسأل من هو أعلم منه

- খালাফ ইবনে উমর (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি-

---

[২২৫] الآداب الشرعية لابن مفلح ২ / ৬৩ ، والفروع لابن مفلح ৬ / ৩৮০ :
[২২৬] الآداب الشرعية ২ / ৬২

"আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেইনি, যতক্ষণ না আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তারা আমার অবস্থানকে সঠিক বলেন কি না। আমি রবীয়া (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করতাম। তারা আমাকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিতেন।

খালাফ ইবনে আমর (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি তারা আপনাকে নিষেধ করতেন? ইমাম মালেক (রহঃ) উত্তর দিলেন, 'তবে আমি ফতোয়া থেকে বিরত থাকতাম'। কারও জন্য কোন বিষয়ে নিজেকে যোগ্য মনে করা উচিৎ নয়, যতক্ষণ না সে তার চেয়ে যোগ্য কাউকে জিজ্ঞেস করে"

[আল-হিলইয়া, আলামা আবু নুয়াইম (রহঃ), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৬]

- এবিষয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে, ইমামগণ যাদেরকে বলেছেন, তোমরা অনুসরণ করো না, তারা ইমামগণের এ সমস্ত নির্দেশ থেকে কী বুঝেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) কে বলেছেন-

لا تكتب كل ما تسمع مني

"তুমি আমার নিকট থেকে যা শ্রবণ করো, যাচাই-বাছাই না করে তা লিপিবদ্ধ করো না।"

ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) এ নির্দেশের কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাসআলা লেখা বাদ দিয়েছেন? ইমাম আবু দাউদকে (রহঃ) কে ইমাম আহমাদ (রহঃ) কারও অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, ইমাম আবু দাউদ কী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব ছেড়ে দিয়েছেন?

এভাবে ইমামগণ যাদেরকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কেউ যদি সংশিষ্ট ইমামের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, তবে আমরা কেন ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে থাকি? এবং কেন মানুষকে মাযহাব বিদ্বেষী করতে এধরণের উক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকি?

এক্ষেত্রে আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে, সেগুলো উলেখ করে লিখেছেন-

فإن أنت قبلت هذه النصيحة و سلكت الطريقة الصحيحة، فلتكن همتك: حفظ ألفاظ الكتاب و السنة، ثم الوقوف علي معانيها بما قال سلف الأمة و أئمتها، ثم حفظ كلام الصحابة و التابعين و فتاويهم و كلام أئمة الأمصارو معرفة كلام الإمام أحمد و ضبطه بحروفه و معانيه و الأجتهاد علي فهمه و معرفته، و أنت إذا بلغت من هذه الغاية فلا تظن أنك قد بلغت النهاية، و إنما أنت طالب متعلم من جملة الطلبة المتعلمين و لو كنت بعد معرفة ما عرفت موجودا في زمن الإمام أحمد، ما كنت حينئذ معدودا من جملة الطالبين. فإن حدثتك نفسك بعد ذلك أنك قد إنتهيت أو وصلت ما وصل إليه السلف فبأس ما رأيت

"তুমি যদি আমার নসীহত গ্রহণ করে থাক এবং সঠিক পথের অনুসন্ধানী হয়ে থাক, তবে তোমার লক্ষ্য থাকবে- তুমি কুরআন ও সুন্নাহের সমস্ত বিষয় মুখস্থ ও আয়ত্ব করবে, অতঃপর পূর্ববর্তীগণ ও ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অবগত হবে, অতঃপর তুমি সাহাবী, তাবেয়ীনদের বক্তব্য ও তাদের ফতোয়াসমূহ মুখস্থ করবে এবং বিভিন্ন শহরের উলামায়ে কেরামের যেসমস্ত বক্তব্য রয়েছে, সেগুলোও মুখস্থ করবে। সাথে সাথে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর বক্তব্য মুখস্থ করবে, তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করবে এবং তার মর্ম উদঘাটনে তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তুমি এ সমস্ত কিছু করার পরে মনে করো না যে, তুমি শেষ স্তরে পৌঁছে গেছ, বরং তুমি তখনও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। তুমি এসব কিছু অর্জনের পরও যদি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর যুগে থাকতে, তবে তুমি তাঁর ছাত্র হওয়ার যোগ্য হতে না। **উপরোক্ত বিষয়ের ইলম অর্জনের পরে যদি তোমার অন্ত রে এ ধারণার সৃষ্টি হয়, তুমি ইলমের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছ, কিংবা পূর্ববর্তীগণ যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, সে স্তরে পৌঁছে গেছ, তবে তুমি বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা পোষণকারী"**[২২৭]

- ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) তাঁর নিজের সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

---

[২২৭] রিসালাতুন ফিল খুরুযি আনিল মাযাহিবিল আরবাআ', পৃষ্ঠা-১৫

كما هو حال أهل الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوي كثيرمنهم الوصول إلي الغايات و الإنتهاء إلي النهايات و أكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات

"অর্থাৎ বর্তমান সময় কিংবা পূর্বের কয়েক যুগ থেকে কিছু লোক দাবী করে থাকে যে, তারা শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হয়েছে, অথচ বাস্তবতা হল, তাদের অধিকাংশ এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতে পারে নি।"[২২৮]

তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছেন ,

إياك و إياك: أن تترك حفظ هذه العلوم المشار إليها و ضبط اااالنصوص و الآثار المعمول عليها ، ثم تشتغل بكثير الخصام و الجدال، و كثرة القيل و القال و ترجيح بعض الأقوال علي بعض الأقوال مما إستحسنه عقلك.... ولا تكن حاكما علي جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت إلي مقام لم يصلوه.

"সাবধান! সাবধান! পূর্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে এবং কুরআন ও সুন্নাহের নস ও আমলে মুতাওয়ারিছা (শ্রেষ্ঠ তিন যুগ থেকে প্রচলিত আমল) সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে (অর্থাৎ মুজতাহিদ না হয়ে) তুমি তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক। আর বেঁচে থাক দ্বীনের ব্যাপারে অমূলক প্রশ্ন ও মন্তব্য থেকে। এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী এক ইমামের বক্তব্যকে আরেক ইমামের বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দেয়া থেকে।" "মুমিনদের সকল দলের ব্যাপারে তুমি বিচারক সেজো না! তোমার ভাবখানা এমন যে, তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি, তোমার কাছে এমন এলম পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌঁছেনি।

আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) এর এ উপদেশ সকলের হৃদয়ে গেঁথে নেয়া উচিৎ। আলামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) এর জন্ম ৭৩৬ হি: এবং মৃত্যু ৭৯৫ হি: অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সাত শ' বছর পূর্বে তিনি একথাটি বলেছেন। অতএব, আমাদের সময়ের এ সমস্ত স্বশিক্ষিত এবং তথাকথিত মুজতাহিদ ইমামদের সম্পর্কে তাদের মন্তব্য কী হত?

আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন,

---

২২৮ প্রাগুক্ত

وقد قال بعض الناس : أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ، ونصف متفقه ، ونصف متطبب ، ونصف نحوي ، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد الأبدان ، وهذا يفسد اللسان) [229]

“দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে, আধা বক্তা, আধা ফকীহ, আধা ডাক্তার এবং আধা ভাষাবিদ। এদের একজন (আধা বক্তা) দ্বীনকে ধ্বংস করে, অপরজন (আধা ফকীহ) দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে। আধা ডাক্তার মানুষের শরীরকে নিঃশেষ করে। আর আধা ভাষাবিদ ভাষাকে বিনষ্ট করে।”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৮]

আমাদের সমাজে শরীয়তের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ শিশু। অনেকেই এখনও ক্লাস ওয়ানে ওঠারও যোগ্যতা অর্জন করেনি। অথচ ভাবখানা এমন যে উক্ত বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন। তারা ডক্টরেট করেন এক বিষয়ে আর সিদ্ধান্ত দেন আরেক বিষয়ে। সারাজীবন ইঞ্জিয়ার থেকে প্রিসক্রিপশন দিতে গেলে যা হয় আর কি!

এজন্যই হয়ত রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেছেন,

الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور أمَّهاتهم[২৩০]

“মায়ের কোলে যেমন শিশু, তেমনি আলেমদের কোলে সাধারণ মানুষ”
[শরহু ইবনু আবিল ঈয, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫]

মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন,

ذهب العلماء فلم يبق إلاَّ المتكلِّمون ، والمجتهد فيكم كاللاعب فيمن كان قبلكم

“আলেমগণ গত হয়েছেন, এখন শুধু বক্তারা রয়ে গেছে, আর তোমাদের মাঝে যারা ‘মুজতাহিদ’ রয়েছে, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তারা তামাশাকারী।[২৩১]

---

[২২৯] [مجموع الفتاوى৫/১১৮.]

[২৩০] شرح ابن أبي العز للطحاوية১/১০৫.

[২৩১] أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم/৬৬

এক মিলিয়ন হাদীস এক ডিস্কে পাওয়া যায়

ডাঃ জাকির নায়েক মাযহাব না মানার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, তার মধ্যে উলেখযোগ্য একটি যুক্তি হল, বর্তমান সময় বিজ্ঞান ও টেকনোলজির যুগ। যে কোন তথ্য খুব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। এসম্পর্কে তিনি বলেছেন,

"বর্তমান যুগ হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। ইমামদের সময় একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য শত শত, হাজার হাজার কিলোমিটার সফর করতে হতো। কেননা তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ততটা উন্নত ছিল না। বর্তমান যুগ হল, ই-মেইলের যুগ, ফ্যাক্সের যুগ। সেকেণ্ডের মধ্যে এখান থেকে আমেরিকায় যে কোন তথ্য পাঠান সম্ভব।"

ডাঃ জাকির নায়েক পরবর্তীতে বলেছেন,
Today if you want to have all the Sahih Hadith, you can have on a disk, the complete bukhary we can have on a disk, Bukhary,Muslim, in IRF on million Hadith on one disk. Classified, Sahih, Zaif, Mauzu.

"বর্তমান সময়ে তুমি যদি সমস্ত সহীহ্ হাদীস সংগ্রহ করতে চাও, তবে তা একটি ডিস্কে পাওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ বোখারী এক ডিস্কে পাওয়া যায়। একইভাবে, বোখারী, মুসলিম। আই.আর.এফ এ একটি ডিস্কে এক মিলিওন হাদীস রয়েছে। যেগুলোর শ্রেণীবিভাগ করা রয়েছে-সহীহ্, যয়ীফ, মওযু। সুতরাং ইমামদের যুগের তুলনায় বর্তমান সময়ে হাদীস সংগ্রহ করা খুবই সহজ"[২৩২]

ডাঃ জাকির নায়েকের এ বক্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত যে, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে খুব সহজে অবগত হওয়া সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর কোন বিষয়ের জ্ঞানের জন্য কি ঐ বিষয়ের সব পুস্তকাদি তার নিকট থাকাটাই যথেষ্ঠ? ডাঃ জাকির নায়েক নিজে একজন ডাক্তার, তিনি কি কখনও এ বিষয়কে যথেষ্ঠ মনে করবেন যে, একলোক বাজার থেকে কয়েক শ' বিখ্যাত মেডিকেলের বই কিনে পড়লে সে ডাক্তার হয়ে যাবে? অন্যকে প্রিসক্রিপশন দিতে পারবে? আর এ ধরণের ডাক্তারের মাধ্যমে রোগির রোগ নিরাময় হবে না কি মৃত্যুর কারণ হবে?

---

[২৩২] ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

পৃথিবীর কোন বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জনের জন্য যদি সংশিষ্ট বিষয়ের দু'একটি বই পড়া যথেষ্ঠ না হয়, তবে ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞানের জন্য শুধু হাদীসের কিতাবকেই যথেষ্ঠ মনে করা হয় কেন?
এক মিলিয়ন কেন, কারও নিকট যদি দশ মিলিয়ন হাদীসও থাকে, তবুও কি তার জন্য কিতাব পাঠ করে হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব?

এ সম্পর্কে আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন,
لو فرض إنحصار حديث رسول الله صلي الله عليه و سلم فيها اي في الدواوين: فليس كل ما في الكتاب يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد ، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة و هو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم با لسنة بكثير... فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين ، و هذا أمر لا يشك فيه من علم القضية
যদি ধরে নেয়া হয় যে, রাসূল (সঃ) এর সমস্ত হাদীসের কিতাব সমূহে সংকলন করা হয়েছে এবং রাসূল (সঃ) এর হাদীস এর মাঝেই সীমাবদ্ধ, তবে কোন আলেম হাদীসের কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, এটি সম্ভব নয়। আর কারও পক্ষে এটি ঘটেও না। বরং কারও নিকট সংকলিত অনেক হাদীসের কিতাব থাকতে পারে, কিন্তু সে এ সমস্ত কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় না। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কিতাব সংকলনের পূর্বে যারা ছিলেন, তারা সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাদের কিতাব ছিল, তাদের অন্তর, যাতে সংরক্ষিত ছিল, এ সমস্ত সংকলিত কিতাব থেকে কয়েকগুণ বেশি হাদীস। আর এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে এমন কেউই বিষয়টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না"[২৩৩]

আলামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এ বক্তব্য থেকে এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকে না যে, হাদীসের বিষয়ে কিতাব সমূহ সংকলিত হওয়ার পূর্বে এক এক মুহাদ্দিস ও ফকীহ সংকলিত হাদীসের কিতাব সমূহের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হাদীস জানতেন।
যেমন-

১. আলামা ইবনুস সালাহ থেকে বর্ণিত,

---

[২৩৩] রাফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃষ্ঠা-১৮

وقال ابن الصلاح رحمه الله - : " وقد قال البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح ،

"ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন, আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস জানি এবং সহীহ নয় এমন দুই লক্ষ হাদীস জানি ।

[মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা-১০]

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন ।

৩. ইমাম মুসলিম (রহঃ) তিন লক্ষ্য হাদীস থেকে মুসলিম শরীফ লিপিবদ্ধ করেছেন ।

৪. ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে আবু দাউদ শরীফ রচনা করেছেন ।

৫. ইমাম আবু যুরআ' (রহঃ) সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন ।

ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য হাফেযে হাদীসের জন্ম হয়েছে । আমরা জানি হাফেযে হাদীস বলা হয়, সেই মুহাদ্দিসকে যিনি ন্যূনতম এক লক্ষ হাদীস সনদ ও মতন সহ হিফয করেছেন এবং সেটি আয়ত্বে রেখেছেন ।

"তাযকিরাতুল হুফফায" নামক কিতাবে হাফেযে হাদীসদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এ সমস্ত মুহাদ্দিস লক্ষ-লক্ষ হাদীস মুখস্থ করা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবী করেননি, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, বর্তমান সময়ে যারা বিশুদ্ধভাবে একটি হাদীস পাঠ করার যোগ্যতা রাখে না, তারাও মুজতাহিদ ইমাম হওয়ার দাবী করে ফতোয়া প্রদান করে থাকে । আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাজত করুন!

এ প্রসঙ্গে খতীবে বাগদাদী (রহঃ) " আল-ফকীহ ও য়াল মুতাফাক্কিহ" নামক কিতাবে লেখেছেন,

قيل لبعض الحكماء : إن فلانا جمع كتبا كثيرة! فقال : هل فهمه علي قدر كتبه؟ قيل : لا، قال فما صنع شئا، ما تصنع البهيمة بالعلم.[234]

কোন এক বিজ্ঞজনকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে । তিনি তাকে বললেন, তার বুঝ কি তার সংগৃহীত কিতাবের সমান? লোকটি উত্তর দিল,

---

[২৩৪] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৫৮

না । তখন তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই করেনি । চুতষ্পদ জন্তু ইলেম দিয়ে কী করবে!

অর্থাৎ বুঝ অর্জন না করে, কিতাব সংগ্রহ করা আর একটি জন্তুর নিকট অনেক কিতাব থাকা সমান ।

সুতরাং কিতাব সংগ্রহের নাম ইলম নয় । কারও নিকট অধিক হাদীস থাকার কারণে সে যদি বড় হালেম হয়ে যেত, তবে যার নিকট এক ডিস্কের মধ্যে সমস্ত হাদীসের কিতাব রয়েছে, সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম হয়ে যেত । চলিশ্র টাকার একটা ডিস্ক সংগ্রহ করা, আর ইলমের পিছে চলিশ্র বৎসর সাধনা করা এক জিনিস নয় । সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে একথা বলা যথেষ্ঠ নয় যে, আমার নিকট এক মিলিয়ন হাদীসের একটি ডিস্ক আছে, সুতরাং কাউকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা নেই । বিষয়টি যদি এমনই হত, তবে পৃথিবীর যে কেউ ডিস্ক সংগ্রহ করবে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেম হয়ে যাবে ।

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনে মুইন (রহঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল,
কেউ যদি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফতওয়া দিতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না । পুনরায় প্রশ্ন করা হল, দু'লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে কি ফতোয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না । পুনরায় প্রশ্ন করা হল, যদি তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, না । চার লক্ষ? তিনি বললেন, না? । যদি পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, আশা করা যায় ।

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) এ উক্তি বর্ণনা করে বলেছেন, পাঁচ লক্ষ হাদীস শুধু মুখস্থ করাটাই উদ্দেশ্য নয় । বরং প্রত্যেকটি হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং সে সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যক । তিনি লিখেছেন,

وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره-يحي بن معين-دون معرفته به و نظره فيه، و إتقانه له، فإن العلم هو الفهم و الدراية و ليس با لإكثار و التوسع في الرواية

“কারও পক্ষে নিজেকে ফতোয়ার আসনে সমাসীন করার জন্য ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) যে পরিমাণ হাদীসের কথা বলেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং তীক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন ব্যতীত তা সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ঠ নয় । কেননা ইলম হল, প্রকৃত বুঝ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের নাম । অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার নাম ইলম নয়”
[আল-জামে, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৪]

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে শুধু হাদীস সংগ্রহ করাটা ইসলামের উদ্দেশ্য নয় । আর কেউ যদি অনেক হাদীস সংগ্রহ করেও, তবুও কি সে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের উপর আমর করতে সক্ষম হবে? ইজতেহাদের অন্যান্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেগুলো অর্জন করা আবশ্যক নয় কি?

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সঃ) বলেছেন,

إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتَّى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهَّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُّوا وأضلُّوا

“আলাহ্ তায়ালা ইল্মকে তার বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেবেন না । বরং তিনি আলেমদেরকে উঠানোর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন । এমনকি একসময় কোন আলেমই অবশিষ্ট থাকবে না । মানুষ তখন অজ্ঞ-মুর্খ লোকদের নিকট প্রশ্ন করবে, তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া দিবে । ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে ।[২৩৫]
[বোখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৮৭৭,১০০ মুসলিম হাদীস নং২৬৭৩]
এ হাদীসে রাসূল (সঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় উলেখ করেছেন যে, ইলমের অস্তিত্ব নির্ভর করে উলামাদের অস্তিত্বের উপর । আলেম এবং ইলম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত । সুতরাং ইলমকে টেকনোলজির অনুগামী মনে করা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

- ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রহঃ) বলেছেন,

---

[২৩৫] أخرجه البخاري١/١٩٥،١٩٤ في كتاب العلم ، ومسلم واللفظ له٤/٢٥٨.

يظن الغمر ان الكتب تهدي ... اخا جهل لادراك

العلوم و لا يدري الجهول بان فيها ...غوامض حيرت عقل

الفهيم

ا ذا رمت العلوم بغير شيخ...ضللت عن الصراط المستقيم

"মূর্খ, অনভিজ্ঞ লোক মনে করে থাকে যে, কিতাব তাকে ইলম অর্জনে পথ প্রদর্শন করবে।
কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না যে, তাতে এমন দুর্বোধ্য বিষয় থাকে যে, তীক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
যদি তুমি উস্তাদ ব্যতীত ইলম অর্জন করো, তুমি সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে"[২৩৬]

হাফেযে হাদীস আবু বকর খতীবে বাগদাদী (রহঃ) বলেন,

فلابد من تعلم امور الدين من عارف ثقه اخذ عن ثقه وهكذا الي ..لا يؤخذ العلم الا من افواه العلماء الصحابه فالذي ياخذ الحديث من الكتب يسمي صحافيا. والذي ياخذ القرأن من المصحف يسمي مصحفيا ولا يسمي قارئا.

"আলেমদের থেকে শ্রবণ ব্যতীত ইলম শিক্ষা করা যায় না। সুতরাং ইলম অর্জনের পথে এমন একজন বিশ্বস্ত আলেম থেকে ইলম অর্জন করতে হবে, যিনি আরেকজন সিকা (বিশ্বস্ত) আলেম থেকে ইলম অর্জন করেছেন, এভাবে সাহাবীদের পর্যন্ত ইলমের ধারা পৌঁছে যাবে। যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে, হাদীস গ্রহণ করে তাকে "সাহাফী" বলা হয়। (তাকে মুহাদ্দিস বলা হয় না)। আর যে ব্যক্তি মাসহাফ থেকে কুরআন গ্রহণ করে তাকে "মাসহাফী" বলা হয়, তাকে ক্বারী বলা হয় না।"

---

[২৩৬] حاشيه الطالب ابن حمدوم علي شرح بحرق علي لامية الافعال

কামালুদ্দিন শামানী এর বিখ্যাত কবিতা-

من يأخذ العلم عن شيخ مشافهةً *** يكن من الزيف والتصحيف في حرمٍ

ومن يكن آخذاً للعلم من صحف *** فعلمه عند أهل العلم كالعدم

“যে ব্যক্তি তাঁর শায়েখের নিকট থেকে সরাসরি ইলম শিক্ষা করে, সে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র থাকে ।
আর যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ইলম অর্জন করে, আলেমদের নিকট তার ইলম কোন ইলমই নয়”

আলাম্মা শাওকানী (রহঃ) লিখেছেন,

إنَّ إنصاف الرجل لا يتمُّ حتَّى يأخذ كلَّ فنٍّ عن أهله كائناً ما كان

“কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়–নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে ।”

আলাম্মা শাওকানী (রহঃ) আরও বলেছেন,

وأمَّا إذا أخذ العلم عن غير أهله، ورجَّح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها ، فإنَّه يخبط ويخلط

“আলেম যদি অযোগ্য লোকের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের সংশিষ্ট শাখায় পারদর্শী নয় এমন লোকের বক্তব্যকে সে প্রাধান্য দেয়, তবে সে অনুমান নির্ভর এবং অবিমৃশ্যকারী ।”[২৩৭] [আদাবুত তলাব ও মুনতাহাল আরাব, পৃষ্ঠা-৭৬]
আলাম্মা সাখাবী (রহঃ) লিখিত “আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরারু” নামক কিতাবে রয়েছে,

"من دخل في العلم وحده؛ خرج وحدَه "

“যে ব্যক্তি একাকী ইলমের পথে প্রবেশ করল, সে একাকী সেখান থেকে বের হয়ে গেল”[২৩৮] [আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮]

---

২৩৭ [أدب الطلب ومنتهى الأرب/৭৬]

২৩৮ [58/1) الجواهر والدرر للسخاوي

সালফে সালেহীনের বিখ্যাত উক্তি হল-

من أعظم البلية تشيخ الصحيفة

“কিতাবকে নিজের উস্তাদ বানান বড় বড় মুসীবতের অন্যতম”
[আলামা ইবনে জামাআ রহ. তাযকিরাতুস সামে’ পৃষ্ঠা-৮৭]
আবু যুরআ (রহঃ) বলেন,

لا يفتي الناس صحفي , ولا يقرئهم مصحفي

“বই পড়ে কেউ ফতোয়া দিবে না এবং কুরআন পড়ে কেউ ক্বারী হবে না ।”
[আল- ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃষ্ঠা-১৯৪]

- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলন,

من تفقه من بطون الكتب ضيَّع الأحكام[239]

“যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ফকীহ হলো, সে শরীয়তের হুকুমকে জলাঞ্জলি দিল”
[তাযকিরাতুস সামে, ওয়াল মুতাকালিম, পৃষ্ঠা-৮৩]

---

[২৩৯] [تذكرة السامع والمتكلم/৮৩

আলাহ্‌ ও আলাহ্‌র রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ করো

ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন-
The Qur'an further says,
"Obey Allah, and obey the Messenger" [Al-Qur'an 4:59]
All the Muslims should follow the Qur'an and authentic Ahadith and ensure that they are not divided among themselves

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা -
"তোমরা আলাহ্‌ ও আলাহ্‌র রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ করো ।প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করা উচিৎ। এবং এটি নিশ্চিত করা উচিৎ যে, তারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত নয় ।"[২৪০]

এখানে ডাঃ জাকির নায়েক আয়াতের শেষ অংশ এড়িয়ে গেছেন, এ আয়াতে আলাহ্‌ এবং আলাহ্‌র রাসূল (সঃ) এর অনুসরণের পাশাপাশি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে ।

ডাঃ জাকির নায়েক আরও বলেছেন-
A true Muslim should only follow the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith.

"একজন সত্যিকারের মুসলমান শুধু (only) কুরআনও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করবে ।"[২৪১]

সম্পূর্ণ আয়াত ও তার ব্যাখ্যা নিচে প্রদান করা হল,
আলাহ্‌ তায়ালা সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

[২৪০] http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199
[২৪১] http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আলাহর নির্দেশ মান্য কর, মান্য কর রাসূলের নির্দেশ এবং তোমাদের মধ্যে যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী (আলেম বা বিচারক) রয়েছে তাদের । তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আলাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর; যদি তোমরা আলাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক । আর এটাই কল্যাণকর আর পরিণতির দিক থেকে উত্তম ।"

এ আয়াতে আলাহ ও আলাহর রাসূলের অনুসরণের পাশাপাশি উলুল আমরের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে । সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয় হল, এখানে উলুল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ যে বিষয়গুলি উলেখ করেছেন, তার সার-সংক্ষেপ হল,

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত জাবের (রাঃ) বলেন,

هم الفقهاء والعلماء الذين يعلِّمون الناس معالِمَ دينهم

এখানে 'উলুল আমর' হল, ফকীহ ও আলেমগণ; যারা মানুষকে তাদের দ্বীনি বিষয় শিক্ষা দান করেন ।

একই মত দিয়েছেন, তাবেয়ী হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহিদ, জাহ্হাক প্রমুখ মুফাসসিরগণ । তাঁদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে তাঁরা সূরা নিসার ৮৩ নং আয়াত উলেখ করেছেন,

ولو رَدُّوُه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ منهم

"যদি তারা আলাহর রাসূল এবং উলুল আমরের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করত, তাহলে তাদের মধ্যে যারা গবেষণার যোগ্য, তারা তা গবেষণা করে নিরূপণ করতে সক্ষম হত ।"

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, উলুল আমর হল, আমীর ও শাসকগণ । বিভিন্ন হাদীসে আমীর ও শাসকদের অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । তবে শর্ত হল, তাদের আদেশ শরীয়তের বৈধ সীমার মধ্যে থাকতে হবে । এখন তারা যদি কোন অবৈধ বিষয়ে কোন আদেশ করেন, তাহলে তাদের সে আদেশ মান্য করা বৈধ নয় ।

[তাফসীরে তবারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫০, মা'আলিমুত তানজীল, আল্লামা বাগাবী (রহঃ), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২৬]

৩. সংশিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন-

وأبوالعالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه: "أولو الأمر هم العلماء" وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل: "هم الأمراء" وهو الرواية الثانية عن أحمد.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তার এক বর্ণনায়,
হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত হাসান বসরী (রহঃ), আবুল আলিয়া, হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এর এক বর্ণনায়, উলুল আমর হল, আলেমগণ। এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর একটি মত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) অপর এক বর্ণনায়, যায়েদ ইবনে আসলাম , সুদ্দী, মুকাতেল (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনদের অভিমত হল, উলুল আমর হল, আমীর ও শাসকগণ। এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অপর এক অভিমত।
[ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০]

এ আয়াতটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর তাৎপর্য ব্যাপক। এ আয়াতকে অবলম্বন করে একশ্রেণীর মানুষ 'ইজমা' অস্বীকার করে। অথচ এটি শরীয়তের একটি অকাট্য প্রমাণ। আরেক শ্রেণী এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণ পেশ করে কিয়াস অস্বীকার করে। সুতরাং আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে জরুরী।

আমরা সকলেই অবগত যে, ইসলামী শরীয়তের বিধি–বিধানের জন্য চারটি দলিল বা প্রমাণ রয়েছে। যথাঃ-
১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. ইজমা
৪. কিয়াস
অনেকেই এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য না বোঝার কারণে মনে করেন, শেষোক্ত দুটি বিষয় এ আয়াতের বক্তব্য দ্বারা অসার প্রমাণিত হয়। কেননা এখানে মূলতঃ আল্লাহ

ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এবং কোন বিষয়ে মতপার্থক্য ও মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে বিষয়টি প্রত্যর্পণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ দুটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় যেমন ইজমা ও কিয়াস মানার আবশ্যকতা বা সুযোগ কোথায়?

কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল, এ আয়াতে মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত চারটি বিষয়ই অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। জগৎ বিখ্যাত ওলী, দার্শনিক ও মুফাসসির, আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে কাবীরে" (তাফসীরে রাযী) এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, সে আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হল-
আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ কর। এখানে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ কি আল্লাহর অনুসরণ নয়? তবে পৃথকভাবে এখানে আল্লাহর অনুসরণ করার কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য কী? এখানে পৃথকভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ, এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী তাফসীরে রাযী (তাফসীরে কাবীর) এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন,

الفائدة في ذلك بيان الدلالتين ، فالكتاب يدل على أمر الله ، ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة ، والسنة تدل على أمر الرسول ، ثم نعلم منه أمر الله لا محالة ، فثبت بما ذكرنا أن قوله : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة.

এখানে দু'টি বিষয় পৃথকভাবে উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্য হল, দু'টি বিষয়ের প্রত্যেকটি যে একটি অপরটির জন্য প্রমাণ, সেটি উল্লেখ করা। সুতরাং কিতাবুল্লাহ বা কোরআন আল্লাহর আদেশের জন্য প্রমাণ এবং কুরআন থেকে রাসূল (সঃ) এর অনুসরণের আবশ্যকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার সুন্নাহ আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর অনুসরণের জন্য প্রমাণ। আর সুন্নাহ থেকে আল্লাহর অনুসরণের বিষয়টি আমরা জানতে পারি। সুতরাং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ কর, এ আদেশ কিতাব ও সুন্নাহ উভয়টি অনুসরণের আবশ্যকতা প্রমাণ করে।
[তাফসীরে রাযী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১০৭]
আয়াতের পরবর্তী অংশ হল, তোমরা উলুল আমরের অনুসরণ কর।

এ অংশটি ‘ইজমার’ জন্য দলিল। কারণ আল্লাহ তায়ালা এখানে ‘সুদৃঢ়ভাবে উলুল আমরের অনুসণের কথা বলেছেন। আর যে বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অকাট্যভাবে পালনের নির্দেশ প্রদান করেন তা অবশ্যই সব ধরণের ভুল ক্রুটির উর্ধ্বে হতে হবে। কেননা কোন বিষয়ে যদি ভুল-ক্রুটি স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভুল-ক্রুটি অনুসণের আদেশ অসম্ভব। কেননা গোনাহ বা ভুলের অনুসরণ শরীয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যেহেতু এখানে অকাট্যভাবে উলুল আমরের অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং এটিই প্রমাণ করে, উলুল আমরের অনুসরণের বিষয়টি অবশ্যই ভুল-ক্রুটি মুক্ত হতে হবে।

এখন বিবেচনার বিষয় হল, উলুল আমর কি সামগ্রিকভাবে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ না কি পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক মুসলিম বা তাদের কিছু অংশ। স্পষ্টতঃ উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা তাদের প্রত্যেকের সঠিক অবস্থানে থাকা এবং সে সম্পর্কে আমাদের অবগত হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব।

অতএব, উম্মতের সেই অংশটিই উদ্দেশ্য হবে, যারা শরীয়তের বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান দিতে সক্ষম (আহলুল হলি-ওয়াল আক্দ) এবং তাদের ঐকমত্য হওয়াটা প্রমাণ করে যে, বিষয়টি সঠিক। আর এভাবে শরীয়তের বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেম ও ফকীহদের ইজমায় শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, মুফাসসিরগণ এ আয়াতে ইসলামী শাসক ও আমীরদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ প্রমুখ মুফাসসিরগণ উলুল আমর দ্বারা আলেম ও ফকীহদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং এখানে তারা তাদের ইজমার বিষয়টি উলেখ করেন নি।

এ প্রশ্নের উত্তর হল, উপর্যুক্ত তাফসীরের সাথে ইজমার কোন বৈপরিত্ব নেই। তাদের এ বক্তব্য ইজমার বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করে। কেননা উলুল আমর দ্বারা যদি ইসলামী আমীর, কাযী, শাসক বা খলিফা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দেখতে হবে তারা কুরআন ও হাদীস থেকে সমাধান দেয়ার যোগ্য কি না। যদি যোগ্য হয়, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন, তবে হয়ত তারা একে অপরের সাথে ঐকমত্য পোষণ

করবেন, না হয় ভিন্নমত পোষণ করবেন। যদি তারা একে অপরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন, তবে তা-ই ইজমা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং ইসলামী শাসকগণ যারা কুরআন ও হাদীসের বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, তাদের কোন বিষয় একমত হওয়াটা ইজমার অন্তর্ভূক্ত। আর যদি তারা একমত না হন, তা হলে তার বিধান আয়াতের শেষাংশে উলেখ করা হয়েছে। আবার শাসক যদি ইসলামী বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও ইজতেহাদের যোগ্যতা না রাখেন যেমন, পরবর্তী যুগের অধিকাংশ শাসক, তবে তারা সে সমস্ত ফকীহের উপর নির্ভরশীল হবেন, যারা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন। অতএব, উলুল আমর দ্বারা মুসলিম উম্মাহের উলামায়ে কেরামের ইজমা উদ্দেশ্য হবে। আর কিভাবে ঐ সমস্ত শাসক উদ্দেশ্য হবে, যারা দ্বীনের বিষয়ে ন্যুনতম কোন জ্ঞান রাখে না। সুতরাং ফকীহ ও আলেমদের ঐকমত্য এখানে উদ্দেশ্য হবে, কেননা তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতের বিধানটি আয়াতের শেষাংশেই বলা হয়েছে।

আলামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) বলেছেন, অধিকাংশ শাসক ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী নয় এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে ফাসেক- ফাজের হয়ে থাকে। এজন্য এ আয়াতে উলুল আমর দ্বারা শরীয়তের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমগণ উদ্দেশ্য হবে। তিনি লিখেছেন,

فكان حمل الآية على الاجماع أولى ، لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد وهو قوله : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الامْرِ} فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق

“রাসূলের অনুসরণের নির্দেশর সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু উলুল আমরের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং উলুল আমর দ্বারা এখানে উম্মতের ইজমা উদ্দেশ্য নেয়া উত্তম। কেননা অধিকাংশ শাসক (বর্তমানে) ফাসেক-ফাজের হয়ে থাকে।[২৪২]

২৪২ [প্রাগুক্ত]

ধর্মীয় বিষয়ে শাসকদের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلماء ، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء ، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى

"নিশ্চয় আমীর ও শাসকদের আমল আলেমদের ফতোয়ার উপর নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আলেমগণ হলেন, আমীরদের আমীর, শাসকদের শাসক। সুতরাং উলুল আমর শব্দটি দ্বারা দ্বীনের বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেম উদ্দেশ্য নেয়া শ্রেয়।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন-

وأولوا الأمر هم العلماء والأمراء، فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعتهم

"উপরোক্ত আয়াতে উলুল আমর হল, আলেমগণ। যখন তাঁরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সঃ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী কোন আদেশ দিবেন, তখন তাঁদের অনুসরণ ওয়াজিব।
[আল-জওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসীহ, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৮]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) আমীর ও শাসকদের অনুসরণের বিষয়ে লিখেছেন,

والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء

"চূড়ান্ত কথা হল, আমীর ও শাসকদের অনুসরণ তখনই বৈধ হবে, যখন তারা শরীয়তের ইলম অনুযায়ী ফয়সালা দিবেন। সুতরাং তাদের অনুসরণের বিষয়টি আলেমদের অনুসরণের অনুগামী ও নির্ভরশীল। কেননা অনুসরণ কেবলমাত্র বৈধ ও শরীয়তের ইলম নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে পারে। সুতরাং আলেমদের অনুসরণ যেমন রাসূলের অনুসরণের অনুগামী, তেমনি আমীরদের অনুসরণ আলেমদের অনুসরণের অনুগামী।"
[ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন, পৃষ্ঠা-১০]

অতএব উলুল আমর শব্দটি দ্বারা শাসক বা উলামা যেটিই উদ্দেশ্য নেয়া হোক, শরীয়তের বিষয়ে তাদের ঐকমত্য পোষণ তাদের স্বতন্ত্র মতামত থেকে শক্তিশালী

হবে। সুতরাং এখানে উলুল আমর দ্বারা শরীয়তের বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারীদের ইজমা উদ্দেশ্য হবে।

আলাহ ও আলাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণঃ

আয়াতের শেষাংশে আলাহ তায়ালা বলেছেন,

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত হও, তবে তা আলাহ ও আলাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পন কর।"

আয়াতের এ অংশ প্রমাণ করে যে, কিয়াস শরীয়তের একটি অকাট্য হুজ্জত বা দলিল। কেননা আলাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা যদি মতানৈক্য কর" এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে,

১. তোমরা যদি এমন বিষয়ে মতানৈক্য কর, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বিদ্যমান রয়েছে।
২. অথবা বিষয়টি এমন যে, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা উপরোক্ত তিন উৎসের কোনটিতে নেই।

প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য নেয়া সঠিক হবে না, কেননা কোন বিষয়ের যদি কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের মাঝে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই অনুসরণ করতে হবে। এটি তখন "তোমরা আলাহ, আলাহর রাসূল এবং উলুল আমরের অনুসরণ কর" এ নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত হবে। এবং এ বিষয়ে মতানৈক্য করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। যেমন, সালাত, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং প্রথম অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য নেয়া বিশুদ্ধ নয়।

আর দ্বিতীয় অর্থটি হল, তোমরা যদি এমন বিষয়ে মতানৈক্য কর, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ এবং 'ইজমা' তে পাওয়া না যায়, তার বিধান হল, মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়ের সমাধান আলাহ ও আলাহর রাসূলের নিকট সমর্পণ করা।
মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় আলাহ ও আলাহর রাসূলের দিকে সমর্পণ কর, এর অর্থ অনেকে মনে করে যে, " তোমরা কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করো"। যেমনটি ডাঃ জাকির বা অপরাপর আহলে হাদীসগণ মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থ

তা নয়। কেননা আমরা পূর্বেই উলেখ করেছি, কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা যদি কুরআন ও সুন্নাহে পাওয়া যায় তাহলে প্রথমতঃ সেটাই মানা ফরয। এবং কেউ তাতে দ্বিমত পোষণ করবে না। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয় যে, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআনও সুন্নাহে নেই, কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুটি স্পষ্ট বিধান পরস্পর সংঘর্ষপূর্ণ হয়, তবে এক্ষেত্রে মতানৈক্য হওয়াটা স্বাভাবিক।

আর এ মতানৈক্য কোন নিন্দনীয় বিষয় নয়। কেননা আলাহ তায়ালা বলছেন, হে মুমিনগণ তোমরা যদি মতানৈক্য কর, অর্থাৎ এ মতানৈক্য যদি অবৈধ বা হারাম হত (যেমনটি ডাঃ জাকির নায়ক মনে করে থাকেন) তাহলে সরাসরি মতানৈক্য করতেই নিষেধ করা হত। কিন্তু আয়াতের বাচনভঙ্গী এটাই প্রমাণ করে যে, যে সমস্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা (নস) নেই, সে বিষয়ে তোমাদের মতানৈক্য লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এখন যদি তোমরা কখনও মতাক্যৈ লিপ্ত হয়ে পড়ো তাহলে,

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

'বিষয়টিকে আলাহ ও আলাহর রাসূলের দিকে সমর্পণ কর'

আয়াতের এ অংশের তাফসীর নিম্নে উলেখ করা হল-
তাফসীরে বাগাবীতে ইমাম বাগাবী (রহঃ) লিখেছেন,

{ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول } أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا وبعد وفاته إلى سُنّته، والرُّد إلى الكتاب والسنة واجبٌ إن وُجد فيهما، فإن لم يُوجد فسبيله الاجتهاد.

"...আলাহ ও আলাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর" অর্থাৎ আলাহর কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের কাছে বিষয়টি অর্পণ কর, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন। আর রাসূলের অবর্তমানে তাঁর সুন্নাতে বিষয়টির সমাধান অন্বেষণ কর। বিষয়টি যদি কুরআন ও সুন্নাহে বিদ্যমান থাকে, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা অপরিহার্য। আর যদি কুরআন ও সুন্নাহে বিষয়টির সমাধান না পাওয়া যায়, তাহলে এর সমাধানের পথ হল, ইজতেহাদ।"

- তাফসীরে বায়যাবীতে ইমাম বায়যাবী (রহঃ) লিখেছেন,

فردوه (فراجعوا فيه) إلى الله (إلى كتابه) والرسول (بالسؤال عنه في زمانه والمراجعة إلى سنته بعده واستدل به منكرو القياس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس

" বিষয়টি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাছে সমর্পণ কর, এর অর্থ হল, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের দিকে বিষয়টি সমর্পণ কর, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন; বিবাদমান বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর এবং তার মৃত্যুর পরে তার সুন্নতের মাঝে এর সমাধান অনুসন্ধান কর ।

এ আয়াতের দ্বারা কিয়াস অস্বীকার কারীরা প্রমাণ পেশ করে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা মুখতালাফ বা মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়কে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে সমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং এখানে কিয়াসের কোন সুযোগ থাকে না । এর উত্তর হল, বিবাদপূর্ণ বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যর্পণের পদ্ধতি হল, তামসীল ও বেনা তথা সাদৃশ্যপূর্ণ দু'টি বিষয়ের একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা, যার অপর নাম হল কিয়াস । আর এখানে যে কিয়াস উদ্দেশ্য, তার শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায়, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের নির্দেশ দেয়ার পর আবার বিবাদপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করার দ্বারা । কেননা এ নির্দেশ প্রমাণ করে যে, শরীয়তের বিধি-বিধান তিন প্রকার । যথা–

১. কুরআন দ্বারা প্রমাণিত (মুসবাত বিল কিতাব)
২. সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত (মুসবাত বিস সুন্নাহ)
৩. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কিয়াসের মাধ্যমে উৎসারিত বিধান "

[তাফসীরে বায়যাবী, পৃষ্ঠা-২০৬][২৪৩]

- আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) লিখেছেন,

---

২৪৩ দারুল ফিকর, বয়রুত থেকে প্রকাশিত ।

...أن المراد : فان تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والاجماع ، واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله : {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة. فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له ، وذلك هو القياس ، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس.

"(আয়াতের এ অংশের উদ্দেশ্য হবে).. যদি তোমরা এমন বিষয়ে মতানৈক্য কর যার বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বিদ্যমান নেই । সুতরাং 'আলাহ ও আলাহর রাসূলের কাছে সমর্পণ কর' এ আদেশ দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট বিধান উদ্দেশ্য হবে না । বরং উদ্দেশ্য হবে, 'তোমরা মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়টিকে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে তুলনা করো । আর একেই কিয়াস বলে । সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আয়াতটি কিয়াসের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছে ।"[২৪৪]

- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) "আহকামুল কুরআনে" উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

ومن تنازع ممن بعد عن رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم إلى قضاء رسول الله فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما

"রাসূল (সঃ) এর অবর্তমানে কেউ যদি কোন বিষয়ে মতাক্যৈ লিপ্ত হয়, তবে বিষয়টিকে সে আলাহর ফয়সালার দিকে সপর্দ করবে । অতঃপর তাঁর রাসূলের (সঃ) ফয়সালা গ্রহণ করবে । মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের সমাধান যদি কুরআন ও সুন্নাহের কোনটিতে না থাকে, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে কিয়াস করে সমাধান করবে ।"

সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েকের জন্য এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণের বিষয়টি প্রমাণ করা এবং আয়াতের পরবর্তী অংশ উলেখ না করা বাস্তবতার পরিপন্থী ।[২৪৫]

ইসলামে আলেম ও ফকীহদের অনুসরণের গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন

---

[২৪৪] তাফসীরে রাযী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১০৭

[২৪৫] এ আয়াতে যে তাফসীর এখানে উলেখ করা হয়েছে, এটি আলামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) লিখিত তাফসীরে রাযী থেকে নেয়া হয়েছে ।

আন রাবিক্ষল আলামীন” এ আলাদা একটা পরিচ্ছেদ তৈরি করেছেন। পরিচ্ছেদের শিরোনাম হল, المنزلة العظمى لفقهاء الإسلام (ইসলামের ফকীহদের গৌরবময় অবস্থান)। তিনি লিখেছেন,

فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} ذلك خير وأحسن تأويلا قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري

“ইসলামের ফকীহগণ এবং যাদের ফতোয়াসমূহ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পরিচিত; যারা শরীয়তের বিধি-বিধান ইস্তেম্বাতের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত। যারা হালাল-হারাম নির্ণয়ের নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠে তাদের অবস্থান আসমানের তারকার ন্যায়; অন্ধকারে পথহারা ব্যক্তি তার দ্বারা সঠিক পথের দিশা পায়। তাদের প্রতি মানুষের প্রয়োজন মানুষের খাদ্য ও পানীয়র প্রতি যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তারচেয়ে বেশি। বাপ-দাদা ও মায়েদের অনুসরণের চেয়ে তাদের অনুসরণ অধিক আবশ্যকতার দাবী রাখে।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে মান্য কর, আর মান্য কর আল্লাহর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর রয়েছে তাদের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতাক্যৈলিপ্ত হও, তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে তা প্রত্যর্পণ কর; যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো
[ই’লামুল মুয়াক্কিয়ীন, পৃষ্ঠা-৯]

শুধু কুরআন ও
সহীহ হাদীস অনুসরণের বাস্তবতা

মাযহাবের প্রসঙ্গে ডাঃ জাকির নায়েকের সমস্ত লেকচারের সার বিষয় হল, শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ । কথাটি বাহ্যিকভাবে খুবই যুক্তিসঙ্গত । এবং কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না । অনেকের কাছে বিষয়টি এজন্য গ্রহণযোগ্য মনে হবে যে, তিনি শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করতে বলেছেন । কিন্তু এখানে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হল, ডাঃ জাকির নায়েক একজন কিভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করবে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নি । শুধু ডাঃ জাকির নায়েক কেন, কোন আহলে হাদীস বা সালাফীই এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন না ।

কারও জন্য এ কথা বলা যথেষ্ঠ নয় যে, তুমি কুরআন মানো! কারণ যদি মুল উদ্দেশ্য তাই হত, তাহলে যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠানর কী দরকার ছিল? কা'বা ঘরের উপর আল্লাহ তায়ালা কুরআন অবতীর্ণ করে এই ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ঠ ছিল যে, তোমরা কুরআন অনুসরণ করো! আল্লাহর কথা গ্রহণ করো! কিন্তু বিষয়টি এমন নয় । আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে উম্মতকে দ্বীন শিখিয়েছেন । নবী কারীম (সঃ) থেকে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের থেকে তাবেয়ীন দ্বীন শিখেছেন । আর দ্বীনের শিক্ষার এই ধারা অদ্যাবধি চলে এসেছে । অথচ একশ্রেণীর মানুষ মনে করে যে, তারা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করবে । কিন্তু কিভাবে যে কুরআনও সহীহ হাদীসের উপর আমল করবে, সেটা আর কেউ ব্যাখ্যা করে না । তারা কি কুরআনের অনুবাদ পড়ে কুরআন মানবে? বোখারীর অনুবাদ পড়ে সহীহ হাদীস মানবে? এ কথাটির বিশেষণ জরুরি ।

বিজ্ঞ পাঠক! আলোচনার শুরুতে আমরা একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, কারও জন্য কি কুরআনের মনগড়া, একেবারে নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়া জায়েয আছে কি না?

সাধারণভাবে আমরা এ প্রশ্নটা যদি কোন মুসলমানকে করি, সে ইসলাম ধর্ম বুঝুক চাই না বুঝুক, প্রত্যেকেই উত্তর দিবে যে, না, কুরআনে ব্যাপারে আমরা আমাদের মনগড়া কোন ব্যাখ্যা দিতে পারি না ।

কিন্তু একশ্রেণীর অতি-উৎসাহী লোক পাওয়া যাবে, যারা বলবে, "প্রত্যেকেরই কুরআন বোঝার অধিকার আছে, প্রত্যেকেরই কুরআন নিয়ে গবেষণা করার অধিকার আছে, অথচ আলেমগণ বিভিন্ন কথা বলে কুরআনের তাফসীর করতে নিষেধ করেন, কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে নিষেধ করেন। কেউ যদি নিজে কুরআন বোঝার যোগ্যতা রাখে, কুরআন নিয়ে গবেষণা করার অধিকার রাখে, তবে সেই কথাটা আরেকজনকে বোঝাতে বা বলতে দোষের কি? আলেমরা কুরআন হাদীসকে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। এজন্য কুরআনের তাফসীর করতে নিষেধ করে থাকেন ।"

প্রকৃতপক্ষে কুরআন নিয়ে গবেষণা করা এবং কুরআন বোঝার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। সে মুসলমান হোক কিংবা অমুসলিম। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তায়ালা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন। এব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (محمد 24)

১. তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে না, না কি তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং২৪)

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً

২. তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না! যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হত, তবে তারা তাতে অনেক বৈপরিত্ব খুঁজে পেত [সূরা নিসা-আয়াত নং ৮২]

সুতরাং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই কুরআন বোঝা ও গবেষণা করার অধিকার আছে। আর বাস্তব সত্য হল, কুরআন থেকে দূরে সরে আসার কারণেই আজ মুসলিম উম্মাহর এই করুণ পরিণতি ।

কুরআন বোঝা, গবেষণা করা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা দানের বিষয়টি একটু আলোচনা সাপেক্ষ।

আমরা জানি যে, ইহুদী, খ্রিষ্টান প্রত্যেক ধর্মের লোকের জন্য কুরআন বোঝার অধিকার আছে। মুসলিম বিশ্বে যে সমস্ত খ্রিষ্টান মিশনারী কাজ করে, তাদের সম্পর্কে যারা জানেন তাদের নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, তারা মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টবাদের দিকে আহব্বান করার সময় কুরআন থেকে প্রমাণ পেশ করে। কুরআন থেকে ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে।

তারা বলে, কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ) কে "কালিমাতুল্লাহ" বলা হয়েছে। আল্লাহর একটি সত্তাগত গুণ হল, সিফতে কালাম। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর সত্তার একটি অংশ বা সিফত। কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ) কে "রুহুল্লাহ" বা আল্লাহর রূহ বলা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর রুহ ছিলেন। আর হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এমন যেমন দেহ ও আত্মার সম্পর্ক। আর কুরআনে বলা হয়েছে, আমি ঈসা (আঃ) কে রুহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী করেছি। আর এর দ্বারা তারা ঐ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, রুহুল কুদুস হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর কবুতরের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। দেখুন! খোদা, কালেমা ও রুহুল কুদুস এ তিনটি মৌলিক উপাদানই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হল। অর্থাৎ যে কুরআন ত্রিত্ববাদের ঘোর বিরোধী, এই নতুন ব্যাখ্যার বদৌলতে স্বয়ং কুরআনের দ্বারাই এ অসার আক্বীদার প্রমাণ মিলে গেল। এখন শুধু থেকে গেল, কুরআনের ঐ আয়াত যাতে স্পষ্টভাবে ত্রিত্ববাদের কথা নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং যেহেতু ত্রিত্ববাদের আক্বীদা প্রমাণিত হয়ে গেল, তাহলে বলা যায়, এই আয়াতে প্রকৃত ত্রিত্ববাদের কথা নিষেধ করা হয়েছে। আর একথা খোদ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও স্বীকার করে যে, খোদা মূলতঃ তিন জন নয় বরং এ তিনটি মৌল উপাদানের সমন্বয়ে মূলতঃ একজনই। আর কুরআনে যে বলা হয়েছে, যারা মসীহ ইবনে মরিয়মকে আল্লাহ বলবে, তারা কাফের' এটা মূলতঃ মনোফেসি ফেরকার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। যেখানে যেখানে নাসারাদের জাহান্নামের আযাবের কথা বলে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ক্যাথলিক ফেরকা নয় বরং এর

দ্বারা মনোফেসি ফেরকাকে সম্বোধন করা হয়েছে। বাকী রইল একথা যে, কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে শূলিতে চড়ান হয়নি, এটাও ঠিক। খ্রিস্টানদের সাধারণ আক্বীদা হচ্ছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে নিহিত খোদায়ী মৌল উপাদান শূলিতে চড়ান হয় নি। শুধু পেট্রিপেশন ফেরকা এই আক্বীদা পোষণ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে নিহিত খোদায়ী মৌল উপাদানের সমষ্টিকে শূলিতে চড়ান হয়েছিল। কুরআনে এটাই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আর হযরত ঈসা (আঃ) এর শরীর সম্পর্কে কথা হল, কুরআনে তার গঠানাকৃতিকে ফাঁসিতে ঝুলানোর কথা অস্বীকার করা হয় নি।[২৪৬]

এই ধারাবাহিকতায় খ্রিষ্টধর্মের অন্যান্য বিষয়গুলিও তারা খুব সহজে কুরআনের দ্বারা ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করে থাকে।

আলামা মুফতী তাকী উসমানী "আসরে হাজের মে ইসলাম কেইসে নাফেয হোঁ" নামক কিতাবে পাকিস্তানে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,
"পাকিস্তানে 'ইসলামী গবেষণা পরিষদের মহাপরিচালক ড.ফজলুর রহমান তার লিখিত 'ইসলাম' গ্রন্থে অত্যন্ত জোরালোভাবে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তার মতে ইসলামে মৌলিকভাবে মূলতঃ তিন ওয়াক্তের নামায ফরয করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের শেষ বছরে আরও দু'ওয়াক্তের নামায সংযোজন করা হয়। এজন্য নামাযের রাকাতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ উলেখ করে তিনি বলেছেন, 'মোট কথা এই সত্যতা যে মৌলিকভাবে শুধু তিন ওয়াক্তের নামাযই ফরয ছিল, এর সাক্ষ্য ঐ ঘটনা দ্বারা দেয়া সম্ভব যে, এক বর্ণনায় উলেখ রয়েছে, রাসূল (সঃ) কোন কারণ ছাড়াই চার নামাযকে দু'ওয়াক্তের নামাযে জমা করেছিলেন। সুতরাং নববী যুগের পরে নামাযের সংখ্যা অত্যন্ত কঠোরভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়। আর সত্য কথা হল, মৌলিকভাবে নামায তিন ওয়াক্ত, হাদীসের স্রোতের টানে যা পাঁচ ওয়াক্তের বর্ণনায় তলিয়ে গেছে।"

---

[২৪৬] আধুনিক যুগে ইসলাম। পৃষ্ঠা-১৪১

অতঃপর আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব (দাঃ বাঃ) লিখেছেন,
"সংস্কারবাদীদেও তাফসীরের নমুনা দেখনু! সেখানে আপনি নতুন ব্যাখ্যার স্বরূপ দেখতে পাবেন। ওই লোকদের কাছে 'ওহী' হচ্ছে রাসূল (সঃ) এর কালাম, ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি। ইবলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পশুত্ব শক্তি। ইনসান দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সত্যলোক। মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তন্দ্রা, জিলতি ও কুফর। জিন্দা হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সম্মান ফিরে পাওয়া, হুশ ফিরে আসা বা ইসলাম গ্রহণ করা। পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করার অর্থ হল, লাঠির উপর ভর করে পাহাড়ে আরোহণ করা। এই তাফসীরের কথা মাথায় রেখে চিন্তা করুণ যে, খ্রিষ্টানদের ব্যাখ্যার সাথে এদের ব্যাখ্যার মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই' এ বিষয়ে আমি অতিরঞ্জিত কিছু বলেছি কি না?"[২৪৭]

মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত কাজী জাহান মিয়ার আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ সমকাল পর্ব-১। নিচে সমকাল পর্ব-১ থেকে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হল-
মেজর কাজী জাহান মিয়ার সমকাল পর্ব-১ এ লিখেছেন,
"ইয়াজুজ-মাজুজ কোন অতিপ্রাকৃতিক জীব নয়, সাধারণ মানুষ। যারা আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা আল্লাহর দুনিয়া হতে আল্লাহর আইনকে মুছে দিয়ে তাদের নিজস্ব আইন প্রচলন করে এবং সম্পদের একচ্ছত্র ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সাধারণ মানুষের রিযিক হরণ ও জন জীবন অশান্তি ও ক্ষতি সৃষ্টির কারণ হয় এবং পরিণামে ইসলামের মূলোৎপাটন যাদের কার্যক্রম ধাবিত হয়– কোরআনের পরিভাষায় তারাই ইয়াজুজ! **প্রচলিত ধারণায় পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ার ভয়ঙ্কর জীবদের তথা সত্য নয়– কল্পনাপ্রসূত! সিঙ্গার ফুৎকারে কিয়ামত হয়ে যাওয়া (ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে সংশি- আয়াত ১৮:৯৯) এর ধারণাও সত্য নয়। সুস্পষ্টভাবে এটি Globalization বা এক বিশ্বায়নের চিত্র।**"[২৪৮]

এখানে তিনি তাঁর বিকৃত, মনগড়া, কল্পনাপ্রসূত একটি ধারণাকে প্রমাণ করতে গিয়ে ইসলামে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সকল বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। এমনকি সিঙ্গা ফুৎকারে কিয়ামত হওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)
আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ এর প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হল,

---

[২৪৭] আধুনিক যুগে ইসলাম, মুফতী তাকী উসমানী, পৃষ্ঠা-১৪২
[২৪৮] পৃষ্ঠা-১৮

“এই সেই ফিইফা”
কাযী জাহান মিয়া তার বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে কুরআনের ১৭ নং সুরার ১০৪ নং আয়াতকে উপস্থাপন করেছেন। কুরআনের আয়াত ও তার অর্থ নিম্নে প্রদান করা হল-

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ **لَفِيْفاً**

অর্থঃ অতঃপর আমি বনী ইসরাইলকে বললাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর, এরপর যখন পরকালের প্রতিশ্রুতিকাল এসে পড়বে, তখন আমি সবাইকে একত্রিত করে উপস্থিত করবো।

আর কাযী জাহান মিয়াঁ এ আয়াতের অনুবাদ করেছেন,“অতঃপর আমি বনি ইসরাইলকে বলিলাম–পৃথিবীতে তোমরা বসবাস করিতে থাকে এবং যখন তোমাদের প্রতি আলাহর শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে তষন তিনি তোমাদের সকলকে “ফিইফা”– তে একত্রিত করিবেন। (১৭:১০৪)

পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, কোরআন প্রতিশ্রুত ফি-ই -ফা কি? (فِيْفاً) (fayafin) এর আভিধানিক অর্থ হলো অর্থ মরুভূমি। কিন্তু (فيفة) (faifa/faifan) শব্দটির আরো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেছেন F.Steingass-dangerous desert কিংবা dangerous plain. সুতরাং ১৭:১০৪ আয়াতে বনি ইসরাইলের একত্রিকরণের প্রতিশ্রুত বিষয়টি অবশ্যই একটি বিপজ্জনক একত্রিকরণ, যা মূলত ইসরাইল জাতির সর্বনাশের সঙ্গে জড়িত।”[২৪৯]

সুধি পাঠক! কুরআন ব্যখ্যার কারিশমা দেখুন! কাজী জাহান মিয়া কোন কুরআন পাঠ করেছেন আলাহ পাকই ভাল জানেন। আমরা জানি না, তার উপর নতুন কোন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কি না। আমরা যে কুরআন পাঠ করি এবং রাসুলের (সঃ) উপর যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে “লা ফি ফা” আছে। অথচ জাহান মিয়ার কুরআনে লাম নেই। তিনি এ নতুন কুরআন কোথায় পেলেন কে জানে? লাম বাদ দিয়ে “ফি-ইফা” নিয়ে কত কী না লিখেছেন।

---

[২৪৯] পৃষ্ঠা-১৯

সুধি পাঠক! পৃথিবীর সব কুরআনে লাফিফা আছে। আর আরবী ভাষায় 'লাফিফা' অর্থ হল, একত্র করা। মূল ধাতু হলো, ل – ف – ف (লাম-ফা-ফা)। আরবী জানা একটা শিশুও বুঝবে যে, ধাতুর মূল অবর ফেলে দিয়ে শব্দ-ই ঠিক থাকে না।

নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এধরণের গবেষক বুদ্ধিজীবিরা কত কিছুরই না আশ্রয় নিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে কুরআন তৈরি করেন। কুরআনের অর্থ তৈরি করেন। কখনও হাদীস অস্বীকার করেন। কুরআন অস্বীকার করে থাকেন।

কাজী জাহান মিয়া তার বইয়ে এয়াজুজ মা'জুজ সম্পর্কে লিখেছেন,
কাজী জাহান মিয়া আহমদ, তিরমিযী বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ইনশাআল্লাহ বলার বদৌলতে ইয়াজুজ–মাজুজ দেওয়াল ভাঙতে পারবে। এ সম্পর্কে কাজী জাহান মিয়া লিখেছেন,
"আহমেদ, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসের উদ্ধৃতিতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর রেয়ায়েত হতে বর্ণিত একটি হাদীস এ যুগে একটি বিস্ময় ও জিজ্ঞাসাবাদের সৃষ্টি করে। (এর পর তিনি হাদীসটি উলেখ করেছেন, অবশেষে তিনি লিখেছেন)
" এ হাদীস বা উদ্ধৃতিগুলো কি সত্য?"
এর সহজ উত্তর– না।" (নাউযুবিল্লাহ)[২৫০]
ইয়াজুজ মা'জুজের ব্যপারে তিনি একটা সূত্র দিয়েছেন,
বনি ইসরাইলের একত্রিকরণ ∝ ইয়াজুজ মা'জুজের দুনিয়া জোড়া নিয়ন্ত্রণ!
অর্থাৎ ইয়াজুজ-মা'জুজ= দুনিয়ার শীর্ষতম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যারা (রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায়, ব্যক্তি)

প্রচলিত তাফসীরসমূহের কতকে ইয়াজুজ–মাজুজ সম্পর্কে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, উঁচু উঁচু পাহাড় হতে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসবে একটি বিশেষ জীব যার লক্ষ্যবস্তু হবে মুসলমান। তারা এসে এক সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত পানি চুষে খেয়ে ফেলবে। কোরআন এমন সব ব্যাখ্যায় কোন দায়িত্ব বহন করে না।" একই পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে তিনি লিখেছেন, "অতএব গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার সাথে সংশিষ্ট জাতি সত্তাই হবে কোরআনের উপসর্গ অনুযায়ী ইয়াজুজ–মাজুজ।"[২৫১]

---

[২৫০] পৃষ্ঠা-৩৯

[251] আল–কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ সমকাল পর্ব–১, পৃষ্ঠা–৩৫

কাজী জাহান মিয়া লিখেছেন, বলা দরকার যে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইবনে খালদুন হতে প্রাপ্ত শিক্ষায় জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সুবিশাল অংশ একে একটি হযরত ঈসা (আঃ) বা তার পরবর্তী ঘটনা বলে মনে করেন। মূলতঃ এমন কতিপয় হাদীস আছে, যে সব হাদীস সমূহকে ভুল বোঝা হয়েছে এই কারণে যে, এখন থেকে মাত্র ১০ কিংবা ৫ বছর পূর্বেও ঐসব হাদীসের আবেদন সুস্পষ্ট ছিল না। কারণ হিসেবে ঘটনার সাদৃশ্যহীনতা এবং আকস্মিক বৈচিত্র এবং যুক্তিযুক্ততা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের অভাব। বর্তমানে বিবিধ ঘটনাসমূহ ঘটার কারণেই কেবল ঐ হাদীসগুলোর নিঁখুত সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। হাদীসসমূহ মূলত দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ ও শেষকালে খৃষ্টান-ইহুদী আক্রমণ ও মুসলমানদের নির্ঘাত-পরাজয় সংক্রান্ত"[২৫২]

প্রিয় পাঠক! এবার আসুন, আরেকজন বুদ্ধিজীবির কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। তিনি হলেন, ডক্টর মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশ। বইয়ের নাম হলো, "কুরআনের আলোকে সত্যের সন্ধান"। লেখক পরিচিতি দেওয়া আছে, প্রথম জীবনে শিক্ষকতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে, পরবর্তীতে পাট গবেষণাগারে গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন,
"ইবলিশ বা শয়তান এবং গন্ধম খাওয়া হল রূপক। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইবলিশকে সৃষ্টি করলে ইবলিশের কি করে ক্ষমতা হলো সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করার?......এর ব্যাখ্যায় পরবর্তীতে তিনি লিখেছেন," ইবলিশ বা শয়তান হলো, মানুষের দেহে বিভিন্ন প্রকারের হরমোন সৃষ্টি হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে যে "ইচ্ছা" সৃষ্টি হয়। এই ইচ্ছাটিকে যখন অন্যভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকেই বলা হয় ইবলিশ বা শয়তান। আদম (অর্থাৎ প্রথম পুরুষ) এবং হাওয়া (প্রথম নারী) যখন ছোট ছিল, তখন তাদের মধ্যে কোন সেক্স ছিল না। এরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সেক্স হরমোন সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক সংবিধান অনুযায়ী।"[২৫৩]

---

[252] আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ সমকাল পর্ব–১, পৃষ্ঠা-৩০

[253] কোরআনের আলোকে সত্যের সন্ধান, ড. মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশ, পৃষ্ঠা-২৭,২৮

তিনি অন্য জায়গায় লিখেছেন, “ফেরেস্তা এবং হুর পরীও রূপক। ফেরেস্তা হলো রেকর্ডিং এজেন্ট। কোরআনেই উলেখ আছে, আমরা যা করছি বা বলছি তা ফেরেস্ত া রেকর্ড করে রাখছে। কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ফেরেস্তার কাগজ কলম কোথায় এবং তারা কি সব ভাষাই জানে? প্রকৃত ঘটনা হল, ফেরেস্তা হলো, আলো ও বাতাস।”[২৫৪]

তিনি লিখেছেন,“ পরিবেশ নষ্টের মূল কারণ পৃথিবীতে মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের সীমাহীন অবক্ষয়, রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা এবং ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক মানুষের কাছে ধর্মগ্রন্থের মূল বাণী প্রচার না করে ও রূপকের অর্থ না বুঝে রূপককেই সত্য বলে প্রচার করা। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের ছুরা ইমরান আয়াত-৭ কতকবাণী সংবিধান, এটিই মূল কিতাব ও অপর অংশ রূপক। রূপক নিয়েই যত মতবিরোধ, ফেরেস্তাদের আবির্ভাব, হযরত মুছার নদী পার হওয়া ও ফেরাউনদের ডুবানো, হযরত ঈসার জন্ম, শবে-মেরাজ, আদমের গন্ধম খাওয়া, বেহেস্তে দোযখের বিবরণ, মৃত্যুর পর পুনরায় শরীর গঠন, (পুনঃজন্ম), কবরের যাওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ এবং আজাব। আত্মা ও রূহ সৃষ্টিকর্তার আদেশ হলে বৈধ অবৈধ বলি কেন? এবং তা নিয়ে এত হট্টগোল কেন?[২৫৫]

ডঃ মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশের বইটি পড়ে মনে হয়েছিল, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী হয়ে তিনি যদি মাটি নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে হয়ত এভাবে তার জীবনটা মাটি হয়ে যেত না।

বিজ্ঞ পাঠকের নিকট এখন আর খুব বেশি ব্যাখ্যা বিশেষণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আলাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন,“ কুরআন অনেককে পথ ভ্রষ্ট করে এবং কুরআনই অনেককে হেদায়েত প্রদান করে”। উপরে যাদের কথা উলেখ করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং কেউ সাধারণ শিক্ষিত নন; বরং একজন হলেন, পাকিস্তানে ইসলামী গবেষণা পরিষদের প্রধান ড.ফজলুর রহমান। মেজর কাজী জাহান মিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মাদ আলী খান মজলিশ। অথচ এদের প্রত্যেকেই যে, কুরআন নিয়ে গবেষণা

---

[254] কোরআনের আলোকে সত্যের সন্ধান, ড. মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশ, পৃষ্ঠা-৩১

[255] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪

করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের সমাজে অনেকে মনে করে থাকেন, কুরআন "বোঝার" জন্য একজন প্রফেসর হওয়াই যথেষ্ঠ। একজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি কেন কুরআন বুঝতে পারবেন না?

দেখুন! কুরআন "বোঝার" জন্য অশিক্ষিত হওয়াটাও যথেষ্ঠ। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও কুরআন বোঝার যোগ্যতা রাখে। আলাহ্ পাক প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কুরআন "বোঝার" যোগ্যতা দিয়েছেন, সে শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত। আমরা এখানে কুরআন বোঝার কথা বলেছি, কুরআনের তাফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা করার কথা বলিনি। আমরা সকলেই অবগত যে, রাসূল (সঃ) এর অনেক সাহাবী পড়া-লেখা জানতেন না, অনেক সাহাবী বেদুইন ছিলেন, কিন্তু তারা যেভাবে কুরআন বুঝেছেন, পৃথিবীতে এভাবে আর কেউ কুরআন বুঝতে পারবে না। আলাহ্ পাক তাদের বুঝ, তাদের ঈমান, তাদের আমলের প্রশংসা খোদ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় করেছেন।

কুরআনের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এর সাথে কোন যুগের কোন গ্রন্থ তুলনীয় তো দূরে থাক, তুলনীয় হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এটি সর্বস্তরের মানুষের জন্য হেদায়েত। সে শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত।

কিন্তু কুরআন বোঝার জন্য এর সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আপনার নিজের ধারণাপ্রসূত ভ্রান্ত মতবাদকে কুরআন ব্যাখ্যার নামে চালিয়ে দেয়াটা যে, কুরআন বোঝা নয় একথা একজন সাধারণ মানুষও বোঝে।

যাই হোক! জ্ঞানের কোন শাখায় এ ধরণের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই যে, নির্দিষ্ট কিছু লোক শিখতে পারবে, আর কেউ পারবে না। তবে যে কোন শাখায় তার মৌলিক জ্ঞান থাকা জরুরি। পৃথিবীতে যেহেতু কুরআনের শব্দে বা অবরে কেউ কোন পরিবর্তন করতে পারে না, এজন্য মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেকেই কুরআনের ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এবং অধিকাংশ মানুষ কুরআনের তাফসীরের পথ বেছে নেয় এবং বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। একদিকে অমুসলিমরা কুরআনের অপব্যাখ্যার নিত্য-নতুন পথ বের করে, অন্যদিকে

"ওরিয়েন্টালিস্ট" (প্রাচ্যবিদ) হিসেবে বুদ্ধিজীবিদের একটা শ্রেণী সর্বদা কুরআনের অপব্যাখ্যা প্রচার করতে থাকে।

এদের পরিচয়ের শুরুতে যেহেতু ডক্টর, ডাক্তার, ইঞ্জিয়ার, বিজ্ঞানী লেখা থাকে, অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবিও তাদের দেখান পথে অগ্রসর হয়ে ভ্রান্তির স্বীকার হয়। এবং মুসলমানদের মাঝেও ভ্রষ্টতার নিত্য-নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে।

এজন্য কুরআন বোঝা ও কুরআনের ব্যাখ্যাদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআনের উপর আমল করার জন্য কুরআন বোঝা শর্ত। আবার তাফসীর করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করল, সে যেন জাহান্নামে নিজের অবস্থান করে নিল। সুতরাং কুরআনের তাফসীর করার বিষয়টি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

ডাঃ জাকির নায়েক যে আমাদেরকে শুধু কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুসরণ করতে বলেন, তার স্বরূপ তো আমাদের নিকট স্পষ্ট। ডাঃ জাকির নায়েকের বাতলান এ পথে অগ্রসর হলে একজন সাধারণ মানুষের অবস্থা যে, ড. ফজলুর রহমান, আলী খান মজলিশ এদের মত হবে না, তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? বরং প্রমাণিত সত্য হল, যারাই ইসলামকে নিজের মত করে বোঝার চেষ্টা করেছে এবং পূর্ববর্তীদের অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করেছে, তারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে।

মুফতীর জন্য যে সমস্ত বিষয় আবশ্যক

সম্প্রতি ৯ নভেম্বর ২০০৪ সালে আম্মানে ইসলামী স্কোলারদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশের ২০০ স্বোলারের নিকট তিনটি বিষয়ে তাদের ফতোয়া বা মতামত চাওয়া হয়।[২৫৬] এ অধিবেশনে যে তিনটি প্রশ্ন করা হয়, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি হল,

من يجوز أن يعتبر مفتيا في الإسلام؟ وما هي المؤهلات الأساسية لمن يتصدى للفتوى وهداية الناس الى أحكام الشريعة الإسلامية وتعريفهم بها؟

অর্থাৎ ইসলামে কে মুফতী হতে পারবেন? এবং মৌলিক কি কি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে কেউ মানুষকে শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে নির্দেশনা ও ফতোয়া প্রদানে সক্ষম হবে?

এ প্রশ্ন প্রসঙ্গে জেদ্দাস্থ ও. আই. সি. এর ইসলামিক ফিকহ একাডেমী যে উত্তর প্রদান করেছে, সেটি নিচে উলেখ করা হল[২৫৭]–

وله مكانة عالية مهمة، فهو وارث علم النبي(ص)، وموقّع عن رب العالمين(عزوجل)، يبين أحكامه ويطبقها على أفعال الناس؛ لأنه يعتبر من أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم حيث قال جل شأنه: (فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون((2).

ولما كانت للمفتي هذه المكانة وتلك المنزلة اشترط العلماء فيمن يتعرض للإفتاء أن تتوافر فيه شروط المجتهد، وأن يتصف بصفات ويتخلق بآداب منها مايلي:

"ইসলামে মুফতীর গুরুত্ব অপরিসীম। সে হল রাসূল (সঃ) এর ইলমের উত্তরসূরী এবং আলাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি। সে আলাহর বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সেটিকে মানুষের অবস্থা ও কাজের জন্য আমলযোগ্য করে

256

The Amman Message (Arabic: رسالة عمان) is a statement which was issued on 9 November 2004 (27th of Ramadan 1425 AH) by King Abdullah II bin Al-Hussein of Jordan, calling for tolerance and unity in the Muslim world.[1] Subsequently, a three-point ruling was issued by 200 Islamic scholars from over 50 countries, focusing on issues of: defining who a Muslim is; excommunication from Islam (takfir), and; principles related to delivering religious edicts (fatāwa). http://en.wikipedia.org/wiki/Amman_Message

২৫৭ সম্পূর্ণ ফতোয়াটি নিম্নের ঠিকানায় পাওয়া যাবে-

http://ammanmessage.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=42

তোলে। মুফতীকে “আহলুয যিকির” এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যাদের নিকট জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-
“ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে”
“মুফতীর সুউচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে উলামায়ে কেরাম মুফতীর মাঝে মুজতাহিদের শর্তসমূহের উপস্থিতিকে অপরিহার্য করেছেন এবং তাঁর মাঝে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক-

এক.

أولاً: أن يكون مسلماً، مكلفاً، عدلاً، ثقة، مأموناً، ورعاً، تقياً، غير مبتدع في الدين، متنزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة: لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وخبر الفاسق لا يقبل.

“মুসলমান, মুকাল্লাফ (বালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া), ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত (সিকা), আমনতদার, পরহেযগার, মুত্তাকী হওয়া। এবং দ্বীনি বিষয়ে বিদআতী না হওয়া, পাপাচার ও অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ ফাসেক ও অসভ্য না হওয়া। কেননা কারও মাঝে যদি উল্লেখিত শর্তগুলো না থাকে, তবে কোনভাবেই তার কথা নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা ইসলামে ফাসেকের কোন বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়।”

দুই.

ثانياً: أن لا يكون متساهلا في فتواه، لأن من عرف بالتساهل فيها لم يجز أن يُستفتى، ولأن من واجب المفتي أن لا يدلي برأيه إلا بعد استيفاء الموضوع حقه من النظر والدرس. ورد في سنن الدارمي مرفوعا ، قال رسول الله(ص): «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار».

ফতোয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া এবং উদাসীন না হওয়া। কেননা যে ফতোয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া, তার জন্য ফতোয়া দেয়া জায়েয নয়। কেননা মুফতীর জন্য আবশ্যক হল যে, সে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ অধ্যয়ন ও সম্যক ধারণা লাভের পূর্বে কোন ফতোয়া প্রদানে অগ্রসর হবে না। রাসূল (সঃ) এর হাদীসে রয়েছে-
“তোমার মাঝে যে ফতোয়া প্রদানে সাহস দেখাল, সে যেন জাহান্নামের ব্যাপারে দুঃসাহস দেখাল”

তিন.

ثالثاً: أن يكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صريح القول، واضح العبارة، صحيح التصرف والاستنباط، فطنا مدركا لوقائع الأمور في شتى نواحي الحياة.

“প্রত্যুৎপন্ন ফকীহ হওয়া। সাথে সাথে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন সঠিক চিন্তা-ধারার অধিকারী এবং দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাষী হওয়া। মাসআলা আহরণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যথার্থ পদ্ধতি অনুসরণ করা। জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন ঘটনা গভীর ও তিক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা।”

رابعاً: أن يكون عارفا باللغة العربية، وموارد الكلام ومصادرها بما يمكنه من فهم مراد الله عزوجل ومراد رسوله(ص) في خطابيهما، فإن اللغة العربية هي الذريعة لمدارك الشريعة.

চার.

আরবী ভাষা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া। এবং আরবী ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র ও তার উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া; যেন আলাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর বক্তব্য ও বাচনশৈলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কেননা শরীয়তকে সঠিকভাবে আয়ত্ব করার মাধ্যম হল আরবী ভাষা।

পাঁচ.

خامساً: العلم بكتاب الله(ص) على الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام؛ من محكم، ومتشابه، وعموم، وخصوص ومجمل، ومفسر، وناسخ، ومنسوخ.

“পবিত্র কুরআনের উপর এই পরিমাণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা, যার মাধ্যমে কুরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান সমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অর্থাৎ কুরআনের মুহকাম, মোতাশাবেহ, আম, খাস, মুজমাল, মুফাসসার এবং নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।

ছয়.

سادساً: العلم بسنة رسول الله(ص) الثابتة من أقواله، وأفعاله، وطرق ورودها من التواتر والآحاد والصحة والفساد، وحال الرواة، من تعديل وتجريح.

“রাসূল (সঃ) এর প্রমাণিত সুন্নাহের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত বিষয় সমূহ, তাঁর কাজ ও বক্তব্য এবং এগুলো বর্ণনার পরম্পরা সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন হাদীসটি মুতাওয়াতির, কোনটি খবরে ওয়াহেদ, কোন সহীহ কিংবা যয়ীফ সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। সাথে সাথে বর্ণনাকারীদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।”

سابعا: معرفة مذاهب الفقهاء المتقدمين فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الأحكام ، ولا يفتي بخلاف ما أجمعوا عليه، ويجتهد رأيه فيما اختلفوا فيه.

"পূর্ববর্তী ফকীহগণের মাযহাব সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে তাদের মাঝে ইজমা হয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকা; যেন এর আলোকে সে ফতোয়া দিতে পারে এবং ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ের বিপরীত সে কোন ফতোয়া দিবে না এবং মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সে ইজতেহাদ করবে।"

আট.

ثامناً: معرفة القياس وطرق العلة والاجتهاد؛ ليرد الفروع الى اصولها، ويجد الطريق الى العلم بأحكام النوازل.

"ক্বিয়াস, ইলত ও ইজতেহাদের পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেন শাখাগত মাসআলা-মাসাইল ও উদ্ভুত সমস্যার ক্ষেত্রে মৌলিক উৎসের আলোকে এর সমাধান দিতে পারে।"

নয়.

تاسعاً: أن يكون متأدبا بالآداب التي رسمها الفقهاء لمن يمارس الإفتاء، ومنها : أن لا يفتي وهو في غضب أو خوف أو جوع أو شغل قلب أو مدافعة للأخبثين لئلا يخرج عن حالة الاعتدال وكمال التثبت، وأن يتحرى الحكم بما يرضي ربه، ويجعل نصب عينيه قوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتَّبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك((3).

"মুফতীর জন্য যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদব অর্জন আবশ্যক, সেগুলো অর্জন করা। অর্থাৎ

১. ক্রোধ, ভয়, ক্ষুধা, মানসিক চিন্তা, প্রাকৃতিক চাহিদা থাকা অবস্থায় সে কোন ফতোয়া প্রদান করবে না; যেন সে পূর্ণ স্থিরতা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে বিচ্যুত না হয়। এবং বিধি-বিধান আহরণে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাঁর দৃষ্টি থাকবে পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতের দিকে-

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتَّبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

" আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না" [সূরা মায়েদা, আয়াত নং৪৯]

وأن لا يفتي بالحيل المحرمة أو المكروهة، وأن لا يبتغي بفتواه مصالح دنيوية من جر مغنم أو دفع مغرم، وأن لا يحابي في فتواه فيفتي بالرخص من أراد نفعه.

২. হারাম বা মাকরূহ হিলার মাধ্যমে কোন ফতোয়া প্রদান না করা। মুফতী ফতোয়ার ক্ষেত্রে পার্থিব কোন কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।এবং এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করবে না অর্থাৎ কারও উপকারের লক্ষ্যে শিথিল বিষয়ের উপর ফতোয়া প্রদান করবে না।

وأن يكون متهيبا للإفتاء، لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا واضحا، أما فيما عدا ذلك فعليه أن يتثبت ويتريث حتى يتضح له وجه الجواب، فإن لم يتضح له الجواب وأفتى يكون قد أفتى بغير علم، والإفتاء بغير علم كذب على الله ورسوله وكبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: (قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون.ومن أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل: لا أدري.

"ফতোয়ার ব্যাপারে যারপর নাই সতর্ক হওয়া এবং কোন হুকুম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন না হওয়া পর্যন্ত কোন ফতোয়া প্রদান করবে না। নতুবা তার জন্য এ বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান ও স্থিরতা আবশ্যক যতক্ষণ না বিষয়টি তার নিকট বিষয় পূর্ণ বিকশিত না হয়। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই যদি সে ফতোয়া প্রদান করে, তবে সে অজ্ঞতাবশতঃ ফতোয়া দিল। আর অজ্ঞতাবশতঃ ফতোয়া প্রদান হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর উপর মিথ্যারোপ এবং এটি বড় বড় কবীরা গোনাহের অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-
"আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং **আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না**।"

এজন্য পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের থেকে এধরণের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে, যখন তাদের অজানা কোন বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখন তারা বলে দিয়েছেন-" আমি জানি না"

أن يكون دارسا للفقه دراسة واسعة، متسماً بالاعتدال والوسطية، متمرسا في فهم مسائل الفقه المذكورة في الكتب، ويكون ذا باع في دراسة قضايا الفقه الجزئية.

৩. ফিকহ শাস্ত্রে ব্যাপক ও দীর্ঘ অধ্যয়ন করা এবং মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্যের উপর অটল থাকা। ফিকহের কিতাবসমূহে লিখিত মাসআলা-মাসাইল অনুশীলন করা এবং শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের সমাধান প্রদানে সিদ্ধহস্ত হওয়া।

وأن يكون محيطاً بأكثر ما صدر من فتاوى وأحكام في موضوع فتواه، معتمداً على ما كتبه المحققون من الفقهاء والمفتين. وعليه أن يأخذ بما يترجح لديه من أحكام بالشروط المعتبرة في الاجتهاد الفقهي، بحسب الدليل دون الأخذ بالأقوال الضعيفة غير المعتبرة أو الشاذة.

৪. ফতোয়া প্রদান করার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত ফতোয়া সমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। এবং এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মুফতী এবং বিশেষক আলেমগণের লিখিত ফতোয়ার কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করা। ফিকহ শাস্ত্রে ইজতেহাদের শর্ত অনুযায়ী দলিলের আলোকে কোন মাসআলাকে প্রাধান্য দিয়ে সেটা গ্রহণ করা বৈধ হবে কিন্তু তার পক্ষে কোন দূর্বল কিংবা কোন বিরল বক্তব্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।

وأن يراعي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والفروق بين المسائل الجزئية، كما يراعي المآلات.أن يكون عارفاً بالكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية ومصطلحاتها، فهي مفاتيح لفهم النصوص الفقهية.

৫. মাকাসেদে শরইয়্যাহ তথা শরীয়তের চাহিদা ও উদ্দেশ্য, ফিকহের মূলনীতি সমূহ এবং বিভিন্ন মাসআলার মাঝে মৌলিক তারতম্যের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। ফিকহ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহ এবং ফিকহের পরিভাষা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। কেননা এগুলো হল, ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নের মূল চাবিকাঠি।

والحرص على الالتزام بهذا وتطبيقه في السير على المنهج الإلهي وحماية المؤمنين من الحرج والخطأ فيما يصدر عن غير المفتيين المتثبتين هو القصد الأساسي من كل هذه الشروط.

৬. উপরোক্ত বিষয়গুলি অর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা। এবং মানুষকে ভুল ও সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করা। আর এটি ফিকহের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞ পাঠক! বর্তমান সময়ে যারা স্বশিক্ষিত মুফতী রয়েছেন, তাদের ক'জনের মাঝে উলেখিত শর্ত সমূহের কতটি পাওয়া সম্ভব? অনেকের ক্ষেত্রে হয়ত একটিও পাওয়া যাবে না, তবুও তারা ইসলামের বিষয়ে অবলীলায় মতামত পেশ করে থাকেন! আলাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন!

ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন

ইসলামে ফেকাহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ আমল ফেকাহশাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্ম থেকে কবরে কাফন সহ যাবতীয় আমল ফিকহ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে। ঈবাদত ছাড়াও লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এক কথায় একজন মুসলমানের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়গুলো এমন যে, এ ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন ব্যতীত কোন মতামত দেয়া নিতান্তই বোকামী। আর যারা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তাদেরক্ষেত্রেও দেখা যায়, এ বিষয়ে কোন মতামত দিতে গেলে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। রাসূল (সঃ) বলেছেন,

من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتاً في جهنم ، ومن أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه

"যে ব্যক্তি এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি, তবে সে জাহান্নামে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করল। আর যাকে ইলম ব্যতীত ফতোয়া প্রদান করা হল, এর গোনাহ ফতোয়া প্রদান কারীর উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন বিষয়ে পরামর্শ দিল যার বিপরীত বিষয়ের মাঝে সে কল্যাণ দেখছে, তবে সে তার সাথে প্রতারণা করল"[২৫৮]
[মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকী শরীফ]

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে আবী লাইলা (রহঃ) বলেছেন,

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد (مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم احد يسأل عن حديث أو فتيا إلاّ ودّ ان أخاه كفاه ذلك.

---

[২৫৮] أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة τ 2 / 321 ، 365 ، وإسحاق في مسنده رقم (334) 1 / 341 ، والبخاري في الأدب المفرد رقم (259) 1 / 100 ، والحاكم رقم (349 – 350) 1 / 183 – 184 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (20140) 10 / 116 ، ورقم (20111) 10 / 112 ، وفي المدخل إلى السنن الكبرى رقم (789) ص 429 ، وأخرجه أبو داود بلفظ : (من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه) في كتاب العلم ، باب التوقي في الفتيا رقم (3657) 3 / 321 ، وابن ماجة في المقدمة ، باب اجتناب الرأي والقياس رقم (53) 1 / 20 – 21 ، والدارمي رقم (159) 1 / 69 ،

وفي لفظ آخر: كانت المسالة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر، ويردها الآخر حتى ترجع الى الذي سأل عنها أول مرة.

"তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রহঃ) বলেন, আমি এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) একশ বিশ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাদের কাউকে যখন কোন হাদীস বা ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হত, প্রত্যেকেই পছন্দ করতেন, তাঁর আরেকভাই এর উত্তর প্রদানে যথেষ্ঠ।

তিনি অন্য বর্ণনায় বলেছেন,
"তাদের নিকট যখন মাসআলা পেশ করা হত, তখন সে আরেকজনের কাছে সেটা পাঠাত, অতঃপর তিনি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন, এভাবে অবশেষে প্রথমে যার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার নিকট ফিরে আসত"[২৫৯]

হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রাঃ) কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা আছে কি না সেগুলো জিজ্ঞেস করতেন।[২৬০]
[আল-ইনসাফ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ), পৃষ্ঠা-১৮]

হযরত উমর (রাঃ) কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে, বদরী সাহাবীদেরকে একত্র করে তাদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান দিতেন।[২৬১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون"

"যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সকল বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে সে অবশ্যই পাগল"[২৬২]

---

[২৫৯] اتحاف السادة المتقين ১/ ২৭৯-২৮০

[২৬০] قواعد التحديث للقاسمي ص৩২৪ ، والإنصاف للدهلوي ص ১৮

[২৬১] قال أبو حصين الأسدي : (إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر) (261) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم (803) ص 434 ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 38 / 411 ، والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي رقم (3828) 19 / 401 – 419 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي رقم (182) 5 / 412 – 416 ، والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي رقم (269) 7 / 116 ،

[২৬২] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাবিক্ষর আলামিন, আলাম্মা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮
أخرجه الدارمي رقم (171) 1 / 73 ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم (798 – 799) ص432- 433 ، والطبراني في الكبير τ رقم (8923 – 8924) 9 / 18 ، والمقدسي في أطراف الغرائب رقم (3945) ص 167 ، وابن بطة في إبطال الحيل ص 65 – 66 ، وأبو يوسف في كتاب الآثار رقم (903

এটি হযরত আব্দুলাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।
আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেছেন,

الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم

"ফতোয়া প্রদান করতে উদ্দত হওয়াটা কম ইলমের কারণেও হতে পারে আবার অধিক ইলমের কারণেও হতে পারে। **অতএব যখন কারও ইলম কম থাকে, তখন তাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করা হয়, না জেনে সে সকল বিষয়ে সমাধান দেয়।**[২৬৩]

তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন সিরিন (রহঃ) বলেন-

لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول بلا علم

"অজ্ঞতাবশতঃ কথা বলার চেয়ে কোন ব্যক্তির জন্য মূর্খ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়"[২৬৪]
[আদাবুশ শরইয়্যাহ, আলামা ইবনু মুফলিহ্ (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা-৬৫]

আলামা ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন,

وعن ابن وهب قال : سمعت مالكاً يقول :وذكر قول القاسم : لأن يعيش الرجل جاهلاً خير له من أن يقول على الله مالا يعلم ، فقال مالك : هذا كلام ثقيل ثم ذكر مالك أبا بكر الصديق τ وما خصه الله به من الفضل وآتاه إياه قال مالك : يقول أبو بكر τ في ذلك الزمان : لا يدري ولا يقول هذا لا أدري قال : وسمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول : من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير

"অর্থাৎ আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি কাসেম (রহঃ) এর উক্তি উলেখ করেছেন- "আলাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাবশতঃ কোন কথা বলার চেয়ে কোন ব্যক্তির জন্য অজ্ঞ-মূর্খ থাকাটা অধিক শ্রেয়।" একথা উলেখ করে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, এটি অনেক ভারী কথা। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর ফযিলত ও বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে তাঁকে যে ইলম ও মর্যাদা

) ص 200، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم (2204 ، 2206 ، 2208) 2 / 123 – 1124 ، ورقم (1590) 2 / 843 ، ورقم (2213) 2 / 1125 ، وذكره النووي في آداب الفتوى ص 14 ، وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص 7 ، والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 75 ، وابن الصلاح في فتاواه ص 9 ، وابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 64 ، وابن قدامة في المغني 10 / 94 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 185 .

[২৬৩] ই'লামুল মুয়াক্বিয়ীন-১?/৩৫

[২৬৪] أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم (৮০৪) ص ৪৩৪ ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ٢ / ৬৫ ، وابن القيم في أعلام الموقعين ٢ / ১৮৫ .

দান করা হয়েছে, সেটি আলোচনা করলেন । অতঃপর বললেন, “হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময়ে তিনি বলতেন যে, “আমি জানি না” । কিন্তু বর্তমানে এরা কেউ বলে না যে, আমি জানি না ।”
ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, “বুদ্ধিমান আলেমের কর্তব্য হল সে যেন বলে দেয় যে, “আমি জানি না” । কেননা এর দ্বারা হয়ত তার জন্য উত্তম কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করা হবে”

আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন-

من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً.

“যে ব্যক্তি মানুষকে ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নায় হয়েও ফতোয়া প্রদান করল, সে গোনাহগার ও আলাহর অবাধ্য । এবং শাসকদের যারা তাকে তার এ কর্মের সমর্থন করবে তারাও গোনাহগার হবে”
[ই’লামুল মুয়াক্বিয়ীন, আলামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৬]

হযরত আবু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا"

“আমি সেই যুগে দেখেছি, যখন এক ব্যক্তি কোন একটা বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করতো, তখন একজন আরেকজনের নিকট প্রেরণ করত । অবশেষে লোকটি সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রঃ) এর মজলিশে এসে উপনীত হতো । ফতোয়া প্রদানে তাদের অপছন্দ থাকায় মানুষ তখন এটা করত, ।[২৬৫]

وعن مالك : قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له : ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له : أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال : لا ولكن أستفتي من لا علم له ، وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة : وبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেনে, আমাকে জনৈক ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে যে, সে হযরত রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রহঃ) এর নিকট

---

২৬৫ প্রাগুক্ত

গিয়ে দেখল যে, তিনি ক্রন্দন করছেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কি কারণে ক্রন্দন করছেন? আপনার উপর কি কোন মুসীবত আপতিত হয়েছে? রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান উত্তর দিলেন, আমি অযোগ্য লোকের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছি। "ইসলামের মাঝে মারাত্মক একটি জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি বলেন- বর্তমানে যারা ফতোয়া দেয়, তাদের কেউ কেউ চোরদের চেয়েও বেশি জেলে আবদ্ধ থাকার যোগ্য"[২৬৬]

রবিয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান মদীনার বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। এবং হাফেযে হাদীস ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মালেক (রহঃ) ফিকহ শিখেছেন।[২৬৭] তিনি ১৩৬ হি: সনে মৃত্যু বরণ করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় শতকে যদি তিনি একথা বলে থাকেন, তবে আমাদের সময়ের অজ্ঞ-মূর্খদের যুগে কী বলা হবে?

এপ্রসঙ্গে আহমাদ বিন হামদান হারানী রহ. [মৃত্যু-৬৯৫ হিঃ] লিখেছেন-

فكيف لو رأى ربيعة زماننا هذا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم ، فمن أقدم على ما ليس له أهلاً من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم ، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه هذا حكم دين الإسلام ،

"যদি রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান আমাদের এ সময়টি দেখতেন? তিনি যদি বর্তমান সময়ের অজ্ঞ লোকদের ফতোয়া প্রদানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন? নিজেদের অযোগ্যতা-অনভিজ্ঞতা, নিকৃষ্ট চারিত্রিক অবস্থা, অভ্যন্তরীণ কলুষতা, লৌকিকতা ও প্রশংসা-প্রিয়তা এবং পূর্ববর্তী গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত থাকা সত্ত্বেও তাদের নিকট অজ্ঞ লোকদের ভিড় তাদেরকে জরাগ্রস্ত করেছে, ফলে তারা তাদের গ্রহণীয়-বর্জণীয় সকল বিষয়

266: الموافقات للشاطبي 4 / 174 - 175 ، والاعتصام 2 / 173 ، صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني ص 11 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ي ص 85 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 20 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 207 ، والكواكب النيرات لمحمد بن أحمد أبو البركات الذهبي الشافعي المتوفى سنة 929 هـ ص 21.

২৬৭ أبو عثمان التيمي المدني، قال ابن حبان: ربيعة من فقهاء المدينة وحفاظهم، وعلمائهم بأيام الناس، وفصحائهم، وعنه أخذ مالك الفقه، توفي سنة (136هـ). وسير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حقَّق نصوصه، وخرَّج أحاديثه، وعلَّق عليه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 1414هـ/1994م، 6/89-96.

পরিত্যাগ করেছে; অথচ তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা নিবৃত্ত হয় না, তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা সতর্ক হয় না। সুতরাং কেউ ফতোয়া, বিচার কিংবা পাঠদানের যোগ্য না হয়েও যদি সে কাজে অগ্রসর হয়, তবে সে গোনাহগার হবে। এধরণের বিষয় যদি তার নিকট থেকে বারংবার প্রকাশ পেতে থাকে অথবা সে যদি এর উপর অটল থাকে, তবে সে ফাসেক হয়ে যাবে। এধরণের ব্যক্তির কোন কথা, ফতোয়া এবং কোন ফয়সালা গ্রহণ করা জায়েয নয়। এটি ইসলামের শাশ্বত বিধান।"[২৬৮]
[সিফাতুল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা-১১-১২]

আহমাদ ইবনে হামদান রহ. মৃত্যুবরণ করেছেন-৬৯৫ হি: সনে। অর্থাৎ এখন থেকে সাত শ' বছর পূর্বে তিনি একথাগুলো বলেছেন। সুতরাং বর্তমান যুগের যে কী করুণ অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহঃ) বলেন,

"قال حذيفة: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق متكلف" قال ابن سيرين: فأنا لست أحد هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا".

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, মানুষকে ফতোয়া প্রদান করে তিন ব্যক্তির কোন এক ব্যক্তি-

১. কুরআনের নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি।
২. ফতোয়া প্রদানে বাধ্য আমীর বা শাসক।
৩. অথবা নিরেট মূর্খ লোক।

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহঃ) বলেন, আমি প্রথম দু'শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নই। সুতরাং আমি তৃতীয় ব্যক্তি হতে চাই না।[২৬৯]

পূর্ববর্তী বুযুর্গদের স্বভাব ছিল, যখন তাদেরকে কোন ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হতো, তারা যদি এর সুস্পষ্ট উত্তর জানতেন, তখন তা বলে দিতেন। কিন্তু যদি এ বিষয়ে

---

[268] صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني المتوفى سنة 695هـ ص 11 - 12 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 85 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 20 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 207 .

[২৬৯] প্রাগুক্ত-৩৬

কোন উত্তর জানা না থাকত, সাথে সাথে বলে দিতেন, আমি জানি না। আর যদি একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরের সম্ভাবনা থাকত, তখন তারা বলতেন, এটি আমার নিকট পছন্দনীয়। আমার নিকট এটি ভাল মনে হয়। যেমন ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ফতোয়া প্রদান করলে অনেক সময় বলতেন,

إن نظنُّ إلاَّ ظنًّاً وما نحن بمستيقنين[270]

"আমি শুধু ধারণাই রাখি, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত নই"

১. হযরত আলী (রাঃ) বলেন,

وابردها على الكبد إذا سئل أحدكم عمَّا لا يعلم ، أن يقول : الله أعلم [تعظيم الفتيا لابن الجوزي/81

"আমার নিকট অধিক প্রশান্তিকর হল, তোমাদের নিকট কেউ যদি কোন প্রশ্ন করে, আর তোমরা সে সম্পর্কে না জেনে থাকো, তবে বলে দিবে, "আল্লাহই ভাল জানেন"
ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,

إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ، فما اتَّفق لي فيها رأي إلى الآن

"আমি প্রায় দশ বছর যাবৎ একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তা করছি, এখনও পর্যন্ত উক্ত মাসআলায় সমাধানে আসতে পারিনি।
তিনি আরও বলেন,

ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي

"অনেক সময় আমার নিকট মাসআলা পেশ করা হয়, আমি রাতের পর রাত সেগুলো নিয়ে গবেষণা করি।"[271]

এই হল, আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা। এটিকে বর্তমান অবস্থার সাথে একটু তুলনা করুন। টি.ভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন টকশোতে অবাধে ফতোয়ার ছড়াছড়ি। প্রত্যেকের নিজের মত মতো ফতোয়া দিচ্ছে। যার যা মনে চাচ্ছে, শরীয়তের বিষয়ে অবলীলায় তা বলে দিচ্ছে। শরীয়ত যেন লা-ওয়ারিস সম্পদ!

আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহঃ) উত্তম কথা বলেছেন-

لا تَحْسَبِ الفِقه تَمْراً أنْتَ آكِلُه *** لَنْ تَبْلُغِ الفِقْهَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَبْرَا

---

[২৭০] جامع بيان العلم وفضله২/১৪৬

[২৭১] ترتيب المدارك১/১৭৮.

“ফিকহ শাস্ত্রকে তুমি একটি খেজুর মনে করো না যে, তা মুখে পুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি কখনও ফিকহ অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি ধৈর্য্য ধারণ ও অধ্যবসায় গ্রহণ করবে।”

তিনি বলেছেন-

إذ لو كان الفقه يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسألة من مظانها لكان أسهل شيء ولما احتاج إلى التفقه على أستاذ ماهر وفكر ثاقب باهر.

لَو كَانَ هَذَا العِلمُ يُدركُ بالمنى مَا كُنْتَ تُبصِرُ فِي البَرِيّةِ جَاهِلا

“কেননা কিতাব দেখে মাসআলা প্রদানের যোগ্যতার নাম যদি ফিকহ হত, তবে এটি সর্বাধিক সহজ বিষয় হত এবং এর জন্য কোন দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উস্তাদের সংস্পর্শের প্রয়োজন হত না।” “এই ইলম যদি এমনিতেই অর্জিত হত, তবে তুমি পৃথিবীতে কোন অজ্ঞ লোক দেখতে পেতে না।”[২৭২]

বর্তমানে অনেককে দেখা যায়, প্রশ্ন করার পূর্বেই উত্তর প্রদানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শরীয়তের বিষয়ে তাদের এ ধরণের সবজান্তা ভাব কখনও কাম্য নয়। তাদের ভাবখানা এমন যে, তারা জানে না, এমন কোন বিষয় পৃথিবীতে নেই। অথচ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অবস্থা কী ছিল?

হযরত উকবা ইবনে মুসলিম (রহঃ) বলেন-

وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت عبد الله بن عمر τ أربعة وثلاثين شهراً فكثيراً ما كان يسأل فيقول : لا أدري ، ثم يلتفت إلي فيقول : تدري ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم

“আমি ৩৪ বছর হযরত আব্দুলাহ ইবনে উমর (রাঃ) সংস্পর্শে থেকেছি। তাকে যে প্রশ্ন করা হত, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বলতেন-“লা আদরি” (আমি জানি না)। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলতেন- “এরা আমাদের পিঠকে জাহান্নামের সেতু বানাতে চায়”[২৭৩]

---

[২৭২] [রসাইলু ইবনু আবিদীন, পৃষ্ঠা-৩১৬]

[২৭৩] (২৭৩) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم (১৫৮৫) ২ / ৮৪১ ، ورقم (১৬২৯) ২ / ৮৬৩ ، والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه ২ / ১৭২ ، وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين 8 / ২১৮، وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص ১০

[জামেউ বয়ানিল ইলমি ও ফাযলিহি, আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা-৮৪১]
তাবেয়ী হযরত আতা (রহঃ) বলেন-

أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد

“আমি এমন সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাদের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হলে, তারা সে বিষয়ে কোন কথা বলতে গিয়ে কাঁপতেন”[২৭৪]
[কোন ধরণের ত্রুটি হওয়ার ভয়ে কাঁপতেন]
[মুয়াফাকাত, আল্লামা শাতবী (রহঃ), খ.৪, পৃষ্ঠা-২৮৬]

হযরত সুফিয়ান সাউরী (রহঃ) বলেন-

أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بداً من أن يفتوا وقال : أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم

“আমি এমন ফকীহদেরকে পেয়েছি যারা মাসআলা ও ফতোয়া প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। নিতান্ত নিরূপায় হলে তারা ফতোয়া প্রদান করতেন। ফতোয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক জ্ঞাত সেই ব্যক্তি, যে চুপ থাকে, আর এক্ষেত্রে যে অধিক কথা বলে, সে হল চরম মূর্খ”[২৭৫]
[আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনে মুফলিহ (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা-৬৬]

হযরত আব্দুল মালিক বিন আবি সুলাইমান (রহঃ) বলেন-

سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال : لا أعلم ثم قال : ويل للذي يقول لما لا يعلم : إني أعلم

“হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) কে কোন একটা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন- “আমি জানি না”। অতঃপর তিনি বলেন- সে ধ্বংস হোক! যে জানে না অথচ বলে যে, আমি জানি”[২৭৬]

---

[274] صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 9 ، والموافقات للشاطبي 4 / 286 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 218 ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3 / 456 .

[২৭৫] انظر: صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 12 ، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 66 .

[২৭৬] أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم (811) ص 435 ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم (1568) 2 / 836 ، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية 2 / 65 ، وابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 186 .

ইমাম মালেক (রহঃ) কে কখনও পঞ্চাশটি প্রশ্ন করা হলে তিনি একটিরও উত্তর দিতেন না। তিনি বলতেন-

من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها

"যে ব্যক্তি কোন মাসআলার সমাধান দিল, উত্তর প্রদানের পূর্বে তার জন্য কর্তব্য হল, সে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং পরকালে তার কিভাবে মুক্তি হবে এটি চিন্তা করবে, অতঃপর তার উত্তর প্রদান করবে"[২৭৭]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন-

ذل وإهانة للعلم أن تجيب كل من سألك

"প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর প্রদান ইলমের প্রতি অবমাননা ও লাঞ্ছনা প্রদর্শন।"[২৭৮]

এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই যারপর নাই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং এভাবেই যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শরীয়তের বিষয়ে কারও জন্য যেমন সবজান্তা হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি ফতোয়া বা মাসআলা দেয়ার যোগ্য না হয়েও মাসআলা দেয়া জায়েয নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে মূর্খ লোকেরাই নিজেদেরকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করে থাকে। এদের সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য-

الجَاهِلُ لاَ يَعلَمُ رُتْبَةَ نَفْسِه ، فَكَيْفَ يَعْرِفُ رُتْبَةَ غَيْرِهِ

"মূর্খ লোকেরা নিজের অবস্থা সম্পর্কেই অবগত নয়, তবে তারা অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে কিভাবে অবগত হবে।"

অতএব, ফতোয়া বা মাসআলা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিৎ এবং এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিৎ যে, এটি আমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাজত করুন! আমীন।

---

277 آداب الفتوى للنووي ص 16 ، وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 8 ، وفتاوى ابن الصلاح ص 13 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 79 - 80 ، وأعلام الموقعين لابن القيم 4 / 218 ، والفتوى في الإسلام للقاسمي ص 45 .

২৭৮ الآداب الشرعية ٢ / ٦٢ ، ١١٥ ، والديباج المذهب لابن فرحون ١ / ٢٥.

শেষ কথা

আমরা এখানে সর্বশেষ বিষয় হিসেবে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ও.আই. সি.) এর জেদ্দাস্থ ইসলামিক ফিকহ একাডেমী কর্তৃক গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত উলেখক করব। এ বিষয়ে এটিই আমাদের চূড়ান্ত বক্তব্য, বরং এটি বর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা কর্তব্য-

إن اختلاف المذاهب الفكرية، القائم في البلاد الإسلامية نوعان :

)أ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية .

)ب) واختلاف في المذاهب الفقهية .

فأما الأول، وهو الاختلاف الاعتقادي، فهو في الواقع مصيبة، جَّرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، ويجب أن لا يكون، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة، الذي يمثل الفكر الإسلامي، النقي السليم في عهد الرسول ?وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ.«

এক.

মুসলিম উম্মাহের মাঝে প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক মতপার্থক্য দু’ ধরণের-

১. আক্বীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবিরোধ।
২. বিধি-বিধান তথা শাখাগত মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত মতবিরোধ।

প্রথমোক্ত বিষয় তথা আক্বীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবিরোধ মুসলিম উম্মাহের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি মহাবিপদ, যা মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এটি মুসলিম উম্মাহের ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে এবং মুসলিম উম্মাহকে বহুধাবিভক্ত করেছে। এটি একটি দুঃখজনক এবং যার পরনাই অনাকাঙ্খিত বিষয়। এ বিষয়ে মতবিরোধ না হওয়া আবশ্যক।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল থাকবে, যা নববী যুগ এবং খেরাফতে-রাশেদা যুগের নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইমলামী চিন্তার প্রতিচ্ছবি। খেলাফতে রাশেদার সুন্নাহ মূলতঃ রাসূল (সঃ) এর সুন্নাহ। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (সঃ) এর সুস্পষ্ট ঘোষণা-

“তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরার মত তা আঁকড়ে ধরো।

وأما الثاني، وهو اختلاف المذاهب الفقهية، في بعض المسائل، فله أسباب علمية، اقتضته، ولله – سبحانه – في ذلك حكمة بالغة: ومنها الرحمة بعباده، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة، وثروة فقهية تشريعية، تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما، أو في أمر ما، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شئون العبادة، أم في المعاملات، وشئون الأسرة، والقضاء والجنايات، على ضوء الأدلة الشرعية .

দুই.

দ্বিতীয় বিষয় হল, শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাব সমূহের মাঝে মতপার্থক্য, যার অনেক যুক্তিগ্রাহ্য ও শাস্ত্রীয় কারণ রয়েছে। এবিষয়ে মতপার্থক্যের মাঝে আলাহর নিগূঢ় তাৎপর্য ও রহস্য নিহিত আছে। যেমন বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা এবং শরীয়তের উৎস থেকে বিধি-বিধান সমূহ আহরণ করার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তাছাড়া এটি আলাহর পক্ষ থেকে বিরাট নেয়ামত এবং প্রয়োগিক ফিকহ ও আইন শাস্ত্রের মূল্যবান সম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রদান করেছে। ফলে সেটি নির্ধারিত একটি শরয়ী হুকুমের আওতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোন অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ নেই বরং যে কোন সময়ে কোন ইমামের কোন মাযহাব যদি সংকীর্ণতার কারণ হয়, তবে দলিলের আলোকে অন্য ইমামের মাযহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে; তা হতে পারে, ইবাদত, মুয়ামালা, পরিবার, বিচার কিংবা অপরাধ সংক্রান্ত ।

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة، ولا تناقضاً في ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي فالواقع أن هذا الاختلاف، لا يمكن أن لا يكون، لأن النصوص الأصلية، كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة، لأن النصوص محدودة، والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء – رحمهم الله تعالى– فلا بد من اللجوء إلى القياس، والنظر إلى علل الأحكام، وغرض الشارع، والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها في الوقائع، والنوازل المستجدة. وفي هذا تختلف فهوم العلماء، وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق، ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج .
فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي، الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه في الواقع نعمة، ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته، ثروة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية.

অতএব, আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরণের মাযহাবী মতপার্থক্য আমাদের দ্বীনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরোধীতাও নয়। এ ধরণের মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। এমন কোন জাতি পাওয়া যাবে না, যাদের আইন-ব্যবস্থায় এ ধরণের ইজতেহাদী মতপার্থক্য নেই।

অতএব, বাস্তব সত্য হল, এধরণের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন শরীয়তের উৎস সমূহ (নুসুস) বিবিধ অর্থের সম্ভাবনা রাখে, অন্যদিকে সকল সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশনা (নস) পাওয়া যায় না। কেননা শরীয়তের নির্দেশনা (নস) সীমাবদ্ধ, কিন্তু নিত্য-নতুন সমস্যার কোন সীমা-রেখা নেই।

অতএব, কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে হুকুমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যের আলোকে সেগুলোর সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে এবং উদ্ভাবিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে প্রয়াসী হতে হবে।

এক্ষেত্রেই মূলতঃ উলামায়ে কেরামের বুঝ ও চিন্তার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং সম্ভাব্য বিষয় সমূহের কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতভিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সমাধান আসে; অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য থাকে হক্ব ও সত্যের অনুসন্ধান। অতএব, এক্ষেত্রে যার ইজতেহাদ সঠিক হবে সে দু'টি সওয়াবের অধিকারী হবে এবং যার ইজতেহাদ ভুল হবে, সে একটি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এভাবেই শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং যে মতপার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের মাধ্যম, সেটি দোষের কারণ হবে কেন? বরং এটি তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি রহমত ও অনুগ্রহ; যা মুসলিম উম্মাহের জন্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

ولكن المضللين من الأجانب، الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا، ليوحوا إليهم ظلما وزوراً بأنه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما .ثانيا: وأما تلك الفئة الأخرى، التي تدعو

إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة، وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية، ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس، ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلا من هذه الدعوة المفرّقة التي لا حاجة إليها .وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কিছু মুসলমান তরুণ, বিশেষত যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামী জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে কিছু 'গুমরাহকারী' লোক তাদের সামনে ফিকহী মাসআলার এ জাতীয় মতপার্থক্যকে আক্বীদার মতভেদের মত করে তুলে ধরে; অথচ এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

দ্বিতীয়ত যে শ্রেণীর লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জন করার আহক্ষান করে এবং ফিকহের মাযহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে মানুষকে নতুন ইজতেহাদ ও মাযহাবের মাঝে আনতে চায়, তাদের কর্তব্য হল, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা। এর মাধ্যমে মূলতঃ তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে এবং মুসলিম উম্মাহের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন এজাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও গোমরাহীর পথ পরিহার করে ইসলামের শত্রুদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় ও অটুট করা।[২৭৯]

-------০০--০০ সমাপ্ত ০০--০০-------

[২৭৯] إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ২৪ صفر ১৪০৮هـ الموافق ১৭ أكتوبر ১৯৮৭م إلى يوم الأربعاء ২৮ صفر ১৪০৮هـ الموافق ২১ أكتوبر ১৯৮৭م، قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب
http://www.al-fath.net/artical.php?request=411

ডাঃ জাকির নায়েকের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়

বিষয়	সূত্র
টি.ভি চ্যানেলকে যাকাত দেয়া বৈধ। এবং পিস টি.ভি এর জন্য যাকাত গ্রহণ।	http://www.youtube.com/watch?v=Sq_vpfrnWwI
অনারবী ভাষায় খুতবা দেয়া বৈধ।	http://www.youtube.com/watch?v=jTB-v0- CPGg
তারাবীহ বিশ রাকাত নয়, আট রাকাত	http://www.youtube.com/watch?v=sMWEHN8SuCg
তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হবে।	http://www.youtube.com/watch?v=WEEOSmobuvM
ওযু বিহীন কুরআন স্পর্শ করা বৈধ	http://www.youtube.com/watch?v=xGBornAuY3Y
হুরুফে মুকাত্যায়াত তথা কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন অক্ষর রয়েছে, সেগুলো অর্থ প্রদান	http://www.youtube.com/watch?v=nd6lGJwa8Ts&feature=fvwrel
রাম-কৃষ্ণ নবী হতে পারেন।	http://www.youtube.com/watch?v=QnUOPNs3EFc&feature=related
মহিলা ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই	http://www.youtube.com/watch?v=q4R2JTvH9s8
বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাশে বসে খোলা-মেলা টকশো এবং সরাসরি ইসলামের পর্দার বিধান লঙ্ঘন।	http://www.youtube.com/watch?v=vOTPnQjmcc8
তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে অমূলক উক্তি[২৮০]	http://www.youtube.com/watch?v=aVpmTwyjDsY

[২৮০] এখানে ইউটিউবে যে ভিডিওটি আপলোড করা হয়েছে- সেটির শিরোনাম হল-
Dr Zakir Naik-Tablighi Jamaat Tariq Jameel The Great Grave Hunter. GUMRAH- Peace TV 2012 – YouTube
ডাঃ জাকির নায়েককে এক মহিলা প্রশ্ন করেছেন- “আমাদের এখানে ইসলামকে এক নতুন রূপ দেয়া হয়েছে। এটি তাবলীগী জামাত নামে প্রসিদ্ধ। এদের মাঝে এমন একটি কিতাব পড়া হয় যার সাথে কুরআন ও হাদীসের কোন

বিষয়	সূত্র
আলেমদের ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে অমূলক উক্তি এবং সাধারণ মানুষকে ফতোয়ার উপর নির্ভর না করে কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ পড়ে তার উপর চলার নির্দেশ ।	http://www.youtube.com/watch?v=aVpmTwyjDsY
আলাহ্ তায়ালা আরশে "বসে" আছেন, (আলাহ্ আরশ পে বইঠে হ্যাঁয়)[২৮১]	http://www.youtube.com/watch?v=p-XCEOF_k7E&feature=results_main&playnext=1&list=PL674430724213B5FC

সম্পর্ক নেই । জাল এবং মিথ্যা হাদীসে যেটি ভরপুর । যেটি "ফাযায়েলে আমাল বা তাবলীগী নেসাব নামে পরিচিত । ডাঃ জাকিরের নিকট আমার অনুরোধ, আপনি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলুন"
মহিলা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, ডাঃ জাকির নায়েক বিষয়টি আরও শক্তিশালী করেছেন । বিস্তারিত জানার জন্য ভিডিওটি দেখা যেতে পারে ।

[২৮১] ডাঃ জাকির নায়েক এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন আল্লাহ আরশে বসে আছেন । ইসলামী আক্বীদা হল, আলাহ্ তায়ালার জন্য বসা কিংবা দাঁড়ানর কল্পনা করাও অসম্ভব । তিনি কোন স্থান বা দিকের সাথে সম্পৃক্ত নন । কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে বসা কিংবা দাঁড়ানর ধারণা পোষণ করে, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে । এখানে ডাঃ জাকির নায়েক হয়ত ভুল বশতঃ "বসা"র কথাটি উল্লেখ করেছেন । তবে কেউ যদি এধরণের আক্বীদা পোষণ করেন, তবে ইসলামী আক্বীদা অনুযায়ী সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ।
হযরত আলী (রাঃ) বলেন- "من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود" যে ব্যক্তি ধারণা করল যে, আল্লাহ তায়ালা সীবাবদ্ধ, তবে আমাদের মা'বুদ ও স্রষ্টা আল্লাহকে মূর্খ সাব্যস্ত করল"
[হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৩]
ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ) বলেন-
"من زعم أن الله في شيء، أو من شيء، أو على شيء فقد أشرك. إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا- أي مخلوقا"
"যে ব্যক্তি ধারণা করল যে, আল্লাহ তায়ালা কোন স্থানে, অথবা কোন কিছু থেকে, অথবা কোন কিছুর উপরে রয়েছেন, তবে সে শিরক করল । কেননা তিনি যদি কোন কিছুর উপর অবস্থান করেন, তবে তিনি উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবেন বা উক্ত বিষয়টি আল্লাহর বাহন হবে, তিনি যদি কোন কিছুর মাঝে অবস্থান করেন, তবে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে যাবেন এবং তিনি যদি কোন কিছুর থেকে হয়ে থাকেন, তবে তিনি সৃষ্ট বা মাখলুক হবেন"
[রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৬]
হযরত আলী (রাঃ) বলেন-
كان- الله- ولا مكان، وهو الان على ما- عليه- كان اه. أي بلا مكان

"আল্লাহ তায়ালা আদিকাল থেকে আছেন, যখন কোন স্থান ছিল না, এখনও তিনি আগের মতই আছেন অর্থাৎ কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীত"
[আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, আবু মনসুর বাগদাদী রহ.[মৃত্যু-৪২৯ হিঃ], পৃষ্ঠা-৩৩৩]
আবু মনসুর বাগদাদী (রহঃ) লিখেছেন-

"إن الله تعالى خلق العرش إظهارًا لقدرته لا مكانا لذاته"

"আল্লাহ তায়ালা আরশকে নিজ কুদরত প্রকাশ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর সত্তার স্থান হিসেবে এটি সৃষ্টি করেননি"
y الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي [ص / 333
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন-

إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته

"কোন স্থান সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছিলেন, তিনি যখন স্থান সৃষ্টি করেন তখনও তিনি আদি-অনন্ত, যেমনটি স্থান সৃষ্টির পূর্বে তিনি ছিলেন। তার সত্তা কিংবা তার সিফাতে কোন ধরণের পরিবর্তন অসম্ভব"
إتحاف السادة المتقين 24 /2

মোট কথা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হল- আলাহ তায়ালা কোন স্থান এবং কোন দিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীতই বিদ্যমান। আর কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে কোন স্থান বা দিকের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে,তবে সুনিশ্চিতভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

Mazhab Proshonge Dr. Jakir Nayek
By : Ijharul Islam
Cover : Mahmudul Hasan Bashir
Publisher : Al Ijhar Library